ইতালীর র‍্যানেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি



ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী। কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আধুনিক প্রজন্মের
কল্যাণীয় বিনায়ক ও কল্যাণীয়া সুদর্শনাকে

ভূমিকা

র‍্যনেশাঁস সম্পর্কে আমার পড়াশুনা শুরু হয় ১৯৫১ সালে—যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাসে। ওখানে তখন মাকিয়াভেল্লি ও র‍্যনেশাঁস বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ গ্যারেট ম্যাটিংলি একটা পাঠক্রম পরিচালনা করতেন। তাঁর কাছে বুর্খহার্টের আধুনিক ব্যাখ্যা শুনলাম। সে প্রসঙ্গে এলেন ফার্গুসন, হ্যান্স ব্যারন, ক্রিস্টেলার। গেলাম মেট্রোপোলিটান ম্যুজিয়াম অব আর্ট ও ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীতে রক্ষিত র‍্যনেশাঁসের চিত্র সংগ্রহ দেখতে। ইংল্যাণ্ডে যখন অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর গবেষণা করি, ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীর সংগ্রহ ও উইনডসর কাসলের লেওনার্দো দা ভিঞ্চির ড্রইং দেখি। ফেরার পথে ভালো করে দেখলাম ইতালীর নামজাদা চিত্রশালাগুলি, বিশেষ করে ফ্লোরেন্স ও ভ্যাটিকানের। কিছু কিছু বই ও প্রিন্টও জোগাড় হল। মূল ইতালীয়ান প্রিন্ট নয়ন মনোহর।

যাকে বলে 'দিলেতাঁত' তাই থেকে যেতাম, যদি না ১৯৫৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধানরূপে আধুনিক ইওরোপের ইতিহাস পড়াত হ'ত। তখন নতুন এক পাঠ্যসূচী গৃহীত হয়েছে। আমাদের সময় পড়াতে হ'ত ১৬৪৮ থেকে, এখন একেবারে ১৪৫৪ পর্যন্ত সময়সীমা পেছান হ'ল। অর্থাৎ র‍্যনেশাঁস বিষয়ে প্রাক্‌স্নাতক ভালো ছাত্রদের পড়াতে হবে। তার দুবছর আগে এম. এ. ক্লাসে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস পড়াবার ভার পেয়েছিলাম। সেখানে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাসই পড়াঁনো হ'ত—তাও কেম্‌ব্রিজ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া। অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে নিজস্ব গবেষণার আলোকে সেটা পড়াই, আর ভাবি সাংস্কৃতিক ইতিহাসও ত' বাদ দেওয়া চলে না। এখানে তখন উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে মাতামাতি চলছে। আমার মাস্টারমশাই ও পূর্বসূরী—সুশোভন সরকার, অমিত সেন ছদ্মনামে, Notes on the Bengal Renaissance লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালে। সাহিত্য পরিষদ্ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির সম্পাদনায় বেরুচ্ছিল 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'। সংবাদপত্র ও অভিলেখের ভিত্তিতে সংকলিত এই গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের তিন খণ্ডে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এক বিশেষ আকর গ্রন্থ হয়ে উঠেছিল। তার আগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে বেরিয়েছিল ডঃ সুশীলকুমার দে'র লণ্ডন গবেষণা (১৯১৯)। সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' (১৩৪৬) ও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপর কলকাতা গবেষণা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে বিনয় ঘোষ এবং অন্যান্য

লেখক উনিশ শতকের নানা মনীষী ও ঘটনার ওপর আলোকপাত করেন। বিনয়বাবুর 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৪ খণ্ড) ব্রজেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী। বিদ্যাসাগর বা ডিরোজিও নয়।

আচার্য যদুনাথ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখলেন (১৯৪৮)—আমাদের র‍্যানেশাঁস ফ্লোরেন্সের চেয়েও অধিকতর গৌরবময়। এ যেন ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—ক্লিও'র ছাড়পত্র। উৎসাহ আরও বাড়ল। ১৯৬১ সালের আগে সুশোভনবাবুর মনে ইতালীর আদর্শ (মডেল) নিয়ে সংশয় জাগলেও, বিনয় ঘোষদের মনে বুর্খহার্ট সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না। এমনকি শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হলেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থের নাম তিনি রাখলেন—Stutics in the Bengal Renaissance (১৯৫৮)।

মনে হ'ল, ইতালীতে ঠিক কি ব্যাপার ঘটেছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা কারুর নেই। বুর্খহার্ট তাঁর Civilization of the Renaissance in Italy লেখেন ১৮৬০ সালে। তারপর সে সম্বন্ধে যে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, বুর্খহার্টের মত বারবার বিতর্কিত হয়েছে এবং নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বা হচ্ছে, সে বিষয়ে কারুর মাথাব্যথা নেই। বুর্খহার্টের বাক্য (তার সঙ্গে সিমন্ডস্) বেদবাক্য। আমার মনে হ'ল এত আবেগের একটা সমাজতাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গে মুহ্যমান, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত, ধর্মীয় কলহে বিদীর্ণ বাঙালী গৌরবময় অতীতচারণার মধ্যে মানসিক ক্ষতিপূরণ চাইছে।

ইতিমধ্যে সুশোভনবাবু ইতালীর আদর্শ ছেড়ে রুশ আদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন এবং সেখানকার পশ্চিমী প্রত্যয় ও স্লাভোফিল মতবাদের সংঘর্ষের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, এখানেও পশ্চিমী প্রত্যয় ও প্রাচ্যাভিমানের মধ্যে অনুরূপ একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী তিনি, পেতে চেয়েছিলেন দ্বন্দ্বের ফলে এক উচ্চতর (অবশ্যই সাম্যবাদী প্রগতির মাপকাঠিতে) স্তরে উত্তরণ। তা হয়নি। তবে স্বাভাবিক সংযমের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "বাংলার নবজাগরণের অতিরঞ্জিত ছবি আঁকা অথবা তাকে তাচ্ছিল্যজ্ঞানে অস্বীকার করা, এই দুই-ই হল ঐতিহাসিক বাস্তব-বিচার থেকে বিচ্যুতি। যুগবিশেষের কীর্তি যেমন অসীম নয়, তার আপেক্ষিক মূল্যটাও তেমনি মূল্য বটে।" এ বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি একত্র করে ১৯৮১ সালে বেরুল On the Bengal Renaissance.

কিন্তু চারদিকের অশান্তি, অক্ষমতা, ব্যর্থতা যত তীব্র হ'ল, রাজ্য হিসেবে আমরা যত পিছিয়ে পড়লাম, আমাদের শতাব্দীব্যাপী সাধনা ও ত্যাগের সত্য মূল্য ত' পেলাম না, এমনকি স্বীকৃতিও,—তত অভিমানী প্রতিক্রিয়া মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমরা বললাম—সব ফাঁকি, সব মেকি, কিছুই হয়নি। তার জন্য দায়ী বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং দুর্বল বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্লৈব্য ও স্বার্থপরতা।

বলা বাহুল্য, এটাও বিকৃত বিচার। কেন্দ্রের ওপর সব দোষ চাপিয়ে আজ আমরা যেমন আপন ত্রুটি, দুর্বলতা, অপরাধ, স্ববিরোধ ঢাকছি, তেমনি উনিশ শতকের বিশ্লেষণের ও বিচারের ক্ষেত্রে কখনও রামমোহন, কখনও বিদ্যাসাগর, কখনও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে দোষ দিচ্ছি। বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য—বিশ্লেষণ ও বিচারের সমতা ফিরিয়ে আনা, তাকে আরো স্বাভাবিক করা, নির্মোহ ও নিরভিমান করা।

দুটি প্রবন্ধ রয়েছে এই গ্রন্থে—তারা পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমটি ইতালীয় র‍্যানেশাঁস নিয়ে সর্বাধুনিক গবেষণার ফলশ্রুতি। বুর্খহার্টের সমালোচনা ছাড়া যে দিকে বিশেষ দৃষ্টি

দেওয়া হয়েছে তা (১) চতুর্দশ-ষোড়শ শতকের অর্থনৈতিক পটভূমিকা, (২) হিউম্যানিজমের বিভিন্ন পর্ব ও বিভিন্ন রূপ, (৩) চিন্তাধারায় ও শিল্পদৃষ্টিতে ক্লাসিসিজম, রিয়ালিজম ও নিও-প্লেটোনিজমের প্রভাব। এখনও এদেশে মনে করা হয়—র‍্যানেশাঁস ও বুর্জোয়া ধনতন্ত্র সমার্থক, অন্ততঃ সমকালীন এবং আমাদের দেশে নানা কারণে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ হ'ল না বলে র‍্যানেশাঁসও হল না। এ ধারণা যে ভুল তা দেখানো দরকার। দ্বিতীয়তঃ হিউম্যানিজমকে অতিসরলীকরণ করে মানবতাবাদ বলে চালানো হচ্ছে। তা ঠিক নয়। পর্বে পর্বে তার অর্থ ও গুরুত্ব বদলেছে। ত্রেচেন্তোর পেত্রার্কীয় হিউম্যানিজম, লোরেঞ্জো মেদেচির হিউম্যানিজ্‌ম, স্ফর্জা এবং পোপদের হিউম্যানিজম এক বস্তু নয়। তৃতীয়তঃ র‍্যানেশাঁসকে যুক্তিবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)'র জনক বলা চলবে না। চিন্তা ও শিল্পের ওপর ধর্ম, বিশেষতঃ নিওপ্লেটোনিজ্‌ম, যে প্রভাব ফেলেছিল তা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিজমের (hangover) রেশ। তেমনি গ্রেকো-রোমান ক্লাসিসিজম্‌ই যে একমাত্র উৎস ছিল তাও নয়, বৈজ্ঞানিক না হলেও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট। লেওনার্দোর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকতাও। তিনি গ্যালিলেও'র পূর্বসূরী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে ইতালীয় বা রুশ আদর্শ—কোনোটাই প্রয়োগ করা হয়নি। পশ্চিমী প্রত্যয় ও স্লাভোফিল ভাবধারার সংঘাত রাজনীতির ক্ষেত্রে কি রূপ নিয়েছিল The Extremist Challenge (1967) গ্রন্থে তা বিশদ দেখিয়েছি। সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর তার চিহ্ন দেখা গেলেও তা অপরিহার্য লক্ষণ (sine qua non) বলে পরিগণিত হতে পারে না। এসব করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, এমনকি বিবেকানন্দকেও, রিভাইভ্যালিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তার চেয়ে নতুন এক আদর্শ (প্যারাডিম) নেওয়া যেতে পারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ধারণা থেকে। আমি জোর দিয়েছি Tradition ও Modernity-র দ্বন্দ্বের ওপর এবং লক্ষ্য করেছি—আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পুরোধাগণ ঐতিহ্য বিসর্জন দেননি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকেই আধুনিকীকরণের কাজে লাগিয়েছেন। এই ভাবনা প্রয়োগ করি Vidyasagar : Traditional Moderniser গ্রন্থে (১৯৭৪), পরে টোকিয়ো ও কিয়োতোর আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে—জাপানী সংস্কৃতির বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন নিশিমুরা ও বঙ্কিমচন্দ্র। উল্লিখিত paradigm বর্তমান গ্রন্থে বিশদরূপে উপস্থাপিত। আমি এ নিয়ে কোনো গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে রাজী নই। এটাকে একটা মুক্ত পরীক্ষা বলে গ্রহণ করলে খুশীই হব।

পরিকল্পনানুযায়ী বিচার করতে গিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। ব্যাপ্তি আমার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য—গভীরতা। আমি দেখিয়েছি—র‍্যাঁনেশাসের হিউম্যানিজম যেমন পর্বে পর্বে রূপ বদলেছে, তেমনি বাংলায় পশ্চিমী প্রত্যয় রূপ বদলেছে ঔপনিবেশিকতাবাদী শাসন-শোষণের পর্বে পর্বে। পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে তাল রেখে আমরা নানা কারণে চলতে পারিনি। তাই একটা cultural lag সবসময় থেকে গেছে। ইংল্যান্ডের ভাবধারাই আমাদের প্রভাবিত করেছে, ফ্রান্স বা জার্মেনির নয়। ইতালীতে গ্রিস ও রোম যে ভূমিকা নিয়েছিল, এখানে সে ভূমিকা নিয়েছে সংস্কৃতভাষাবাহী প্রাচ্যবাদ। তার সবটা এডোয়ার্ড সইদের Orientalism নয়। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ সবাই খুব ভাল সংস্কৃত ও ইংরেজি জানতেন—আপন ঐতিহ্যকে বিচার করার ও আধুনিকীকরণের কাজে লাগানর জন্য কারুর দ্বারস্থ হতে হয়নি তাঁদের। তাঁদের

মহত্ত্ব—প্রাচী ও প্রতীচির শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধের মধ্যে তাঁরা সেতুবন্ধন করতে চেয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করার সময় বিশেষ সাহায্য পেয়েছি শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীর। উপন্যাসের আকারে লিখিত তাঁর 'রেনেশাঁসের রঙ্গমঞ্চে' এ বিষয়ে পথিকৃৎ। পূর্বসূরীদের সঙ্গে মতান্তর হলেও আমি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ১৯৬৭ সালে আমার গুরু ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ যে History of Bengal 1857-1905 সম্পাদনা করেছিলেন, তাতে Literature অধ্যায় আমারই রচনা। সেই প্রবন্ধ অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি। প্রয়াত ফাদার ফালোঁ বিদেশী শব্দগুলির উচ্চারণ স্থির করে দিয়েছিলেন।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর কর্মাধ্যক্ষ শ্রী বাদল বসু ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী শোভন বসু প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন, তাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বহুদিন এই বিষয় যে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছি তারা এবং তাদের অনুজোপম বর্তমান প্রজন্ম উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এক আপাতঅন্ধকারময় যুগের মধ্য দিয়ে গেলেও আবার সূর্যোদয় দেখব, যেমন দেখেছিল উনিশ/বিশ শতক—অষ্টাদশ শতকের শেষে। লোরেঞ্জো মেদেচির ভাষায়—Le temps revient—আবার ফিরে আসছে।

সূচী

ইতালীর র‍্যানেশাঁস

অনেকেই হয়তো জানেন না ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলে 'র‍্যানেশাঁস' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর 'ফ্রান্সের ইতিহাস' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে (১৮৫৫)। লুসিয়েঁ ফেভর্ দেখাচ্ছেন, স্ত্রীবিয়োগ বেদনায় মুহ্যমান মিশেলে বহুদিন পর শান্তি পেয়েছিলেন এবং মধ্যযুগের শেষে, চতুর্দশ শতকের ইতালীতে যে চিন্তার উদ্দীপন ও সৃষ্টির উল্লাস লক্ষিত হয় তার মধ্যে আপন নবজন্মের প্রতিফলন দেখে ব্যবহার করেছিলেন 'র‍্যানেশাঁস' শব্দটা। কিন্তু আরও একটু পেছিয়ে গেলে দেখব অনুরূপ শব্দ—'rinacita''—ভাসারি ব্যবহার করেছেন ইতালীর শিল্পীদের জীবনকাহিনীতে। আসলে হয়তো নৃতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা মেনে আমাদের আরও পেছনে যেতে হবে। আইসিস—অসিরিস মিথ, অরফিউস-ইউরিডাইসের কাহিনী, খৃষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ডগমা, সবই গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক ঋতুচক্র—বসন্ত-শীত-বসন্তের পুনরাবর্তনকে কেন্দ্র করে। রিল্‌কে ও এলিয়ট ত' এধরনের মিথ ব্যবহার করেইছেন, রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গের গানে ও বহু নাটকে মৃত্যু ও পুনর্জন্ম উপজীব্য।

র‍্যানেশাঁসের ইতিহাস দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, ওয়ালেস ফার্গুসন, বলছেন—"যা ছিল মিশেলের একটা শ্লেষ (epigram) তাকে মহান গ্রন্থের রূপ দিলেন বুর্খহার্ট।" জ্যাকব বুর্খহার্টের The Civilization of the Renaissance in Italy প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। মধ্যযুগের ওপর এক বিরাট গ্রন্থরচনার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু প্রথম খণ্ড (প্রাক্‌কথন বলা যেতে পারে) The Age of Constantine, ও শেষ খণ্ড, উপর্যুক্ত The Civilization of the Renaissance in Italy, ছাড়া অন্য কোন খণ্ড তিনি লিখে যেতে পারেননি। প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ক্লাসিকাল যুগের অবসান আর শেষ খণ্ডে মধ্যযুগের অন্ত ও আধুনিক যুগের উদয়। উভয় গ্রন্থের শৈলী ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক বা কবির কথা মনে পড়ায়। বুর্খহার্ট প্রকৃত ঐতিহাসিকের মত সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে কালানুযায়ী সাজিয়ে তার বিশ্লেষণ করার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করেননি। যে তথ্যগুলিকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরী মনে হয়েছে তা নিয়ে এক মোজাইক তৈরি করেছেন। দেখতে সুষমামণ্ডিত ও রঙিন হলেও অনেকখানি তার মনগড়া। নিজেই এক বন্ধুকে লিখেছিলেন তিনি—"My starting point has to be a vision...vision I call not only optical, but also spiritual realization." তাঁর গুণমুগ্ধ ঐতিহাসিক গোল্ডসাইডারের মন্তব্য স্মরণীয়—"Burchardt's method is philology lit by imagination."

নিঃসন্দেহে জ্যাকব বুর্খহার্ট একজন বড়ো মাপের ঐতিহাসিক এবং র‍্যাঙ্কের 'হিস্টরিসিজম'-এর বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ বলে সম্মানযোগ্য। তবু ১৮৬০ সালের পর থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত টাইবার, রাইন, সেইন, টেমস দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে এবং অ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যানেশাঁস এক বিশেষ চর্চার বিষয়। সেখানে পরিমার্জিত এমনকি পরিত্যক্ত হলেও আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা নির্বিচারে এই বুর্খহার্টীয় মডেল আঁকড়ে ধরে আছেন।

র‍্যানেশাঁস শব্দটার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ পাই 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সংকলিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'য়। "অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্তৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূল পরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল।" তাঁর মতে ঠিক সেরকম হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের বাংলায়—চৈতন্য, রঘুনাথ, গদাধর, রঘুনন্দন এবং পূর্ববর্তী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের আবির্ভাবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, "আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে ?" ১৮৮০ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় তিনি নাকি একে মেদেচি ফ্লোরেন্সের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্যবহার করেছেন—'নবজাগরিত' শব্দ। বিপিন পাল ইতালী ও বাংলার র‍্যানেশাঁস তুলনা করেছেন এবং রামমোহন রায়কে তার পুরোধা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ধারা অনুসরণ করে শিবনাথ শাস্ত্রী রচনা করেন 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। বিশের দশকে কমিন্টার্নের প্রবক্তা, মানবেন্দ্রনাথ রায়, India in Transition (১৯২২) গ্রন্থে বলেছিলেন, র‍্যানেশাঁস যেহেতু বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবগত প্রতিরূপ মাত্র সেহেতু ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল এবং পরে কনিষ্ঠ অংশীদার বাঙালীদের এ ধরনের চিন্তাবিপ্লব অভিপ্রেত বা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। শিবনারায়ণ রায়ের 'রেনেশাঁস জিজ্ঞাসা' (জিজ্ঞাসা, মাঘ, ১৩৮৭)য় পড়ি—রায় তাঁর যান্ত্রিক মার্ক্সবাদ থেকে পরে সরে যান। তবু 'ধর্মবিশ্বাসের যে আমূল সমালোচনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম প্রাথমিক সর্ত—নগরবাসী ইংরেজ শিক্ষিত ভারতীয়রা আজও তা এড়িয়ে চলছেন। ফলে (এবং বি.বি. মিশ্র, অনিল শীলদের বিশ্লেষণের প্রভাবে), দেখা দিয়েছে একটা অশ্রদ্ধার ভাব, অনেকেই এই র‍্যানেশাঁস ধারণাটা খারিজ করে দিতে চান। কিন্তু র‍্যানেশাঁস বস্তুত কি এ ধারণাগুলি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। উল্লিখিত 'জিজ্ঞাসা'য় আলোচনাটা তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করেননি।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ সালে অমিত সেন ছদ্মনামে অধ্যাপক সুশোভন সরকার Notes on the Bengal Renaissance পুস্তিকায় কিছু দ্বিধাযুক্ত (ambivalent) শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। আর বিনয় ঘোষ—বুর্খহার্টীয় মডেলের প্রতি নিঃসর্ত আনুগত্য। আচার্য যদুনাথ সরকারের মত বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত The History of Bengal-এর দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে লিখছেন, যে বাংলার ভূমিকা ফ্লোরেন্সের চেয়েও গরিমাময়। অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদকীয় ভূমিকায় এ ধরনের সরলীকৃত তুলনায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও গ্রন্থের নাম Studies in the Bengal Renaissance (১৯৫৮) বদলাননি। সুশোভন সরকার পরবর্তীকালে ইতালীর মডেল ছেড়ে রুশ মডেলের দিকে ঝুঁকেছিলেন এবং Notes থেকে অনেক বেশি কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে 'এনকোয়ারি' ও 'পরিচয়' পত্রিকায় এবং আরো পরে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে On

the Bengal Renaissance এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। পরবর্তী প্রজন্ম আবার ইতালীর Resorgimento-র মডেল (গ্রামস্‌চি ব্যাখ্যাত) ব্যবহার করেছেন।

অথচ ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যজগতে বুর্খহার্টের মডেল, র‍্যানেশাঁসের ধারণা নিয়ে বিপুল তর্ক চলছিল, অসংখ্য পুস্তক প্রবন্ধ বেরোচ্ছিল। ওয়ালেস ফার্গুসন, ফেদেরিকো সাবোদ (Chabod), জোহান হুইজিঙ্গা (Huizinga), হ্যান্স ব্যারন, ডেনিস হে, পি.ও. ক্রিস্টেলার, কেনেথ ক্লার্ক, এডওয়ার্ড প্যানোফস্কি—র‍্যানেশাঁস ইতিহাসে বিপ্লব এনেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁরা দেখিয়েছেন বুর্খহার্ট শুধু একদেশদর্শী নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উঠেছে তার প্রধান উৎস—উনিশ শতকের শেষের ধর্মীয় রোমান্টিসিজম্‌, জার্মেনি ও ফ্রান্সের উগ্র জাতীয়তাবাদ, মধ্যযুগ ও র‍্যানেশাঁসের অর্থনৈতিক, সামাজিক ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন (পুনর্গঠন বললে ভাল), ক্লাসিকাল ঐতিহ্য ও হিউম্যানিজমের সম্পর্কে নতুন চিন্তা এবং বিশ শতকের ভিন্ন নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ফন মার্টিন-পন্থী যান্ত্রিক মার্ক্সবাদের অবক্ষয়।

২

সমালোচকদের মতে, উনিশ শতকের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদারতান্ত্রিক মত ও হেগেলীয় আদর্শবাদের প্রেরণায় বুর্খহার্ট ভাসারির 'রিনাসিটা' (যা শুধু চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের শিল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য)কে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন (অবশ্য ক্লাসিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সমান জোর দিয়েছেন ইতালীর বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিভাকে)। মধ্যযুগের সাম্রাজ্য, চার্চ ও গিল্ডের কঠিন শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তিত্বের মুক্তি ও পূর্ণ প্রকাশ, যশোলিপ্সা, দেশপ্রেম, যুক্তিবাদ, সুগঠিত রাষ্ট্রের পরিকল্পনা (The state as a work of art), ধর্মনিরপেক্ষতা, সংশয়বাদ (general spirit of doubt), এমনকি প্রগতির ধারণাও তিনি খুঁজে পেয়েছেন র‍্যানেশাঁসের মধ্যে। সর্বোপরি র‍্যানেশাঁসকে মধ্যযুগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক স্বয়ম্ভু ঐতিহাসিক যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি। স্মরণ করুন বিখ্যাত সেই উক্তি—"In the Middle Ages both sides of human consciousness...lay dreaming or half awake beneath a common veil. The veil was woven of faith, illusion, and childish prepossession...In Italy this veil first melted into air... the ban laid upon human personality was dissolved...."

তিনি মরুভূমির ঊষর বালুতে হঠাৎ প্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন র‍্যানেশাঁসকে। মিশেলের বিখ্যাত ঘোষণা 'discovery of man and nature'-কে কিঞ্চিৎ বদলে বলেছেন—'the discovery of the world and of man.' এতদিনে সম্ভব হল রাষ্ট্রসহ্‌ পার্থিব সব জিনিসকে তন্ময় ভাবে দেখা, সম্ভব হল মানুষের মন্ময় দিকের প্রতিষ্ঠা। মানুষ হল 'এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিপুরুষ।'

কিন্তু গত একশো তেত্রিশ বছরের (১৮৬০ সাল থেকে ধরলে) বিতর্ক মনে রাখলে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যকে র‍্যানেশাঁসের উৎস ও নিয়ন্তা বলা যাচ্ছে না, র‍্যানেশাঁসকে বিশেষভাবে ইতালীয় প্রতিভার অবদান বলাও কঠিন (যে ইতালী বুর্খহার্টের ভাষায়—"the first born among the sons of modern Europe")। সব চেয়ে আপত্তি উঠেছে তাকে sui generis বা স্বয়ম্ভু যুগ রূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। ইতালীর মানববাদের প্রবাহে খৃষ্টীয় ধারা কি ভাবে সক্রিয় ছিল তা দেখিয়েছেন থোড (Thode), এমিল গেবার্ড

(Gebhart), অ্যালফ্রেড ফন মার্টিন, সি. এইচ. হ্যাসকিন্‌স ও সম্প্রতি ডগলাস বুশ। মধ্যযুগীয় মিস্টিক প্রেরণা ও উত্তর ইওরোপের (কালের দিক থেকে পূর্ববর্তী) হিউম্যানিজমের কথা তুলেছেন অ্যালবার্ট হাইমা। ফরাসী ও বার্গান্ডির শিল্পের বিকাশ যে র‍্যনেশাঁসের কাছে ঋণী নয়—প্রমাণ করেছেন লুই কুরাজো (Curajod). ভিওলেৎ ল্য দ্যুক্ (le Duc) ও হুইজিঙ্গা (Huizinga) মধ্যযুগীয় শিল্প সম্বন্ধে পরবর্তী কালের ধারণা নস্যাৎ করে দেন। চতুর্দশ শতকের ফ্লেমিশ শিল্পীদের পূর্বসূরীর মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তিত্বের ওপর বুর্খহার্ট এত গুরুত্ব আরোপ করছেন, মধ্যযুগের আবেলার্ড ও এলয়েসের মধ্যে তার প্রকাশ দেখেছেন এটিয়েন গিলসন। জীবনের প্রতি এমন গভীর ভালবাসা (l'amour intense de la vie) আবার শোনা যাবে লোরেঞ্জোর গানে : 'How lovely youth is that flies us ever! Let him be glad who will be: there is no certainty in tomorrow.'[২]

সবচেয়ে বড়ো প্রতিবাদ উঠেছে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের পক্ষ থেকে, ফার্গুসন যাকে 'বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছেন। এটিয়েন গিলসন দেখছেন মধ্যুযুগের খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি বইছিল প্রাচীন গ্রিক-লাতিন সংস্কৃতির ধারা। মধ্যযুগের স্কলাসটিক্‌ই ছিলেন হিউম্যানিজমের পূর্বসূরী। পঞ্চদশ শতকের দর্শনে অ্যারিস্টটলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। লিন থর্নডাইক ও জর্জ সার্টন লিখছেন, মধ্যযুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছিল র‍্যনেশাঁস তা প্রায় রুদ্ধ করে—তার 'eloquence, humanism and the calssics' দিয়ে। যুক্তিবাদ চাপা পড়েছিল নান্দনিকতার আতিশয্যে। জোহান নর্ডস্ট্রম (Nordstrom) বুর্খহার্ট কথিত সব বৈশিষ্ট্যকে মধ্যযুগে নিয়ে গেছেন। চার্লস হোমার হ্যাসকিনস্ দ্বাদশ শতাব্দীর র‍্যনেশাঁসের কথা তুলেছেন। কেউ কেউ বা তা সার্লমানের রাজত্বকালে পৌঁছোতে চান। আবার মধ্যযুগের বহু ধারণা, শিল্পপ্রকরণ র‍্যনেশাঁসের সময় সক্রিয় ছিল তার ইঙ্গিত পাই ডাচ ঐতিহাসিক হুইজিঙ্গার Men and Ideas ও The Waning of the Middle Ages গ্রন্থে। ব্যাপারটা আরো ঘোরালো করে তুলেছেন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা—আইশি ওরিগো, সাপরি (Sapori), কাস্তেলানি, রেমন্ড দ্য রুভার (Roover), লোপেজ এবং পোস্টান। ফন মার্টিন যেভাবে (যান্ত্রিক মার্ক্সবাদের প্রভাবে) র‍্যনেশাঁসকে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের superstructure রূপে দেখেছেন, হুবারই তা উড়িয়ে দিতেন।

হিউম্যানিজম্‌কে র‍্যনেশাঁসের একটা বিশেষ লক্ষণ বা অবদান বলে ধরা হয়। কিন্তু তার স্বরূপ কি ? এ সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করি মিরণ গিলমোর[৩], ই. গেরিন,[৪] হ্যান্স ব্যারন,[৫] ক্রিস্টেলার[৬] প্রভৃতির রচনায়। 'হিউম্যানিস্ট'-এর বদলে আমরা 'মানববাদী' শব্দ ব্যবহার করি, যেন চণ্ডীদাসের 'সবার উপর মানুষ সত্য' বা সহজিয়াদের সাধনার সঙ্গে হিউম্যানিজমের কোন তফাৎ নেই। অথচ ক্রিস্টেলার তিনটি ধারা এর মধ্যে দেখেছেন। মধ্যযুগে চিঠিপত্র, দলিল, বক্তৃতা ইত্যাদি লেখার জন্য Rhetoric পড়ার ঐতিহ্য ছিল। লাতিন কাব্য পড়ানো হ'ত ফ্রান্সে। ত্রয়োদশ শতকের শেষে ইতালীতে Rhetoric-এর সঙ্গে যুক্ত হল সাহিত্য পঠনপাঠন। চতুর্দশ শতকের শেষে দ্বিতীয় ধারা—ক্লাসিক গ্রিক সাহিত্য—এর সঙ্গে মিলিত হল। এই মিশ্র পাঠ্যসূচীতে প্রধান স্থান নিল ব্যাকরণ (লাতিন ও গ্রিক), rhetoric, কাব্য, ইতিহাস এবং নীতিশাস্ত্র। এর নাম দেওয়া হলো humanista (আমরা বলি humanities)। হিউম্যানিজম শব্দটা জার্মানদের তৈরি একথা আমরা জানি না।

এদের মধ্যে নানা রকমের লোক ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন পেত্রার্কার মত স্বাধীন লেখক ; বেশ কিছু নগররাষ্ট্রের সচিব/উচ্চপদস্থ আমলা শ্রেণীর—যেমন লেওনার্দো ব্রুনি (Bruni) ও মাকিয়াভেল্লি ; বাকিরা অন্যবৃত্তিজীবী, যার মধ্যে আছেন মেদেচি পরিবারের মত ধনী ব্যাংকার এবং উরবিনোর ডিউকের মত সামন্ত ভূম্যধিকারী। পঞ্চম নিকোলাস-এর সময় থেকে পোপরাও এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শরিক হন।

হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের নানা পর্ব ছিল, নানা ভাবনার স্তরও লক্ষণীয়। হিউম্যানিস্টদের ওপর যেমন মধ্যযুগীয় আরিস্টটেলীয় ও মরমীয়া (Christian Mysticism) ভাবনার ছাপ পড়েছে, তেমনি পড়েছে প্লেটো, প্লটিনাস-চর্চার ছাপ। পিকো দেলা মিরান্দোলার মত বিদগ্ধজনের ওপর আরও কত ভাষা ও বিদ্যার ছাপ পড়েছে কে জানে ? তিনি অবশ্য মানবের মহত্ত্বের মহিমাকীর্তন করেছেন Orations গ্রন্থে : "Neither heavenly nor earthly, neither mortal nor immortal are we... Thou (man) art the moulder and maker of thyself." মানুষের বৈশিষ্ট্য হল সে তার আপন সত্তার নিয়ন্তা। আর্নস্ট ক্যাসিরার পিকোর উল্লিখিত মন্তব্যকে র‍্যনেশাঁসের অন্যতম সাধারণ লক্ষণ মনে করেছেন। কিন্তু প্লেটো আকাদেমির সভাপতি ফিচিনোর ধারণা অনেক বেশি আধ্যাত্মিকতা-ঘেঁষা। এতদ্ব্যতীত natural religion-এর ধারণাও দেখা যায়। মোটামুটি সাধারণ লক্ষণ—মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস বা ডগমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। র‍্যনেশাঁসের পর্বভাগ নিয়ে ব্যারনের আলোচনা পরে তুলব।

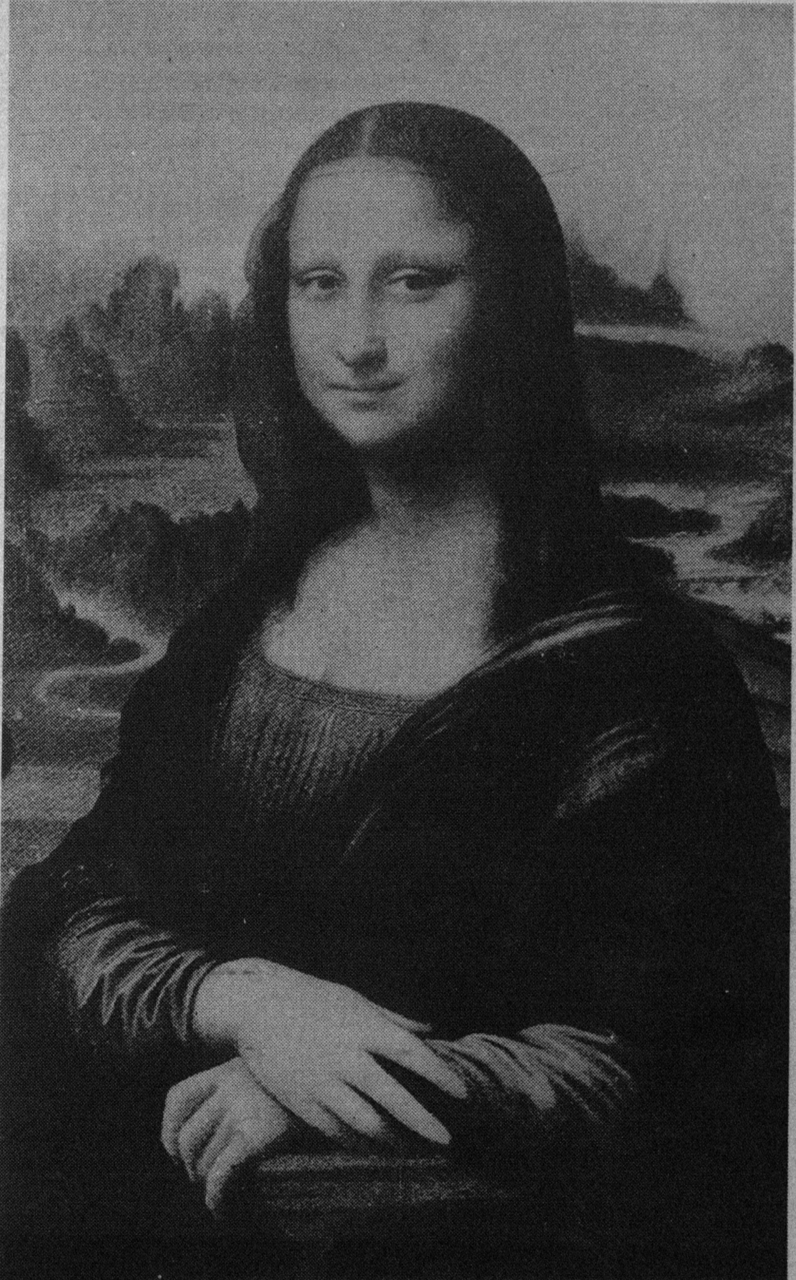
র‍্যনেশাঁস একটা elitist আন্দোলন একথা ভুললে চলবে না। 'প্রতিভাবান ব্যক্তি' (gifted personalities)-র কথা ভাসারি ছাড়া অনেকে তুলেছেন। কিন্তু ক্রিস্টেলার অনুকূল পরিবেশের কথাও তুলেছেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা কি এত বড় সংস্কৃতি বিপ্লবের অনুকূল ছিল ? সে সম্পর্কে নানা সন্দেহ জেগেছে। পরে বিশদ বিশ্লেষণ করে কতটা অনুকূল ছিল দেখান হয়েছে। তবু মধ্যযুগপক্ষীয়রা প্রবহমানতার ওপর যতটা জোর দিয়েছেন, তা দেওয়া যায় না। যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক বার্নার্ড বেরেনসন লিখেছেন, "রাফায়েল কি দ্বাদশ শতকে, এঞ্জেলো কি চতুর্দশ শতকে জন্মাতে পারতেন, যেমন পিকাসো ও জেমস জয়েস ১৮৯০-এর দশকে ?" প্যানোফস্কিও প্রবহমানতার চেয়ে পরিবর্তনকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেননি, যাকে তিনি বলছেন "mutational change", তা ঘটেছিল। প্লামের ভাষায়, "Not even the most prejudiced medievalist...can deny the astonishing vigour and originality of the fifteenth century Italy in painting, sculpture and in architecture...By their exploration of perspective, of landscape, of the nude, and of the human face, they opened up fresh dimensions in art." সার্ত্রের ক্যাথিড্রালে সন্তদের মুখে বাস্তবতা এসেছে বটে কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ও অবয়ব-সংস্থানে বাইজেন্টীয় জড়তা স্পষ্ট। তার সঙ্গে র‍্যনেশাঁসের নিকোলা পিসানো, দোনাদেল্লো, ভেরক্কিয়ো ও মিকালেঞ্জেলোর ভাস্কর্য তুলনা করলে বোঝা যাবে পর্বে পর্বে কি ভাবে তার উন্নতি হচ্ছে। কুলুঙ্গিতে রাখা মূর্তিকে বাইরে এনে তাকে চারদিক থেকে দেখার সুযোগ দেওয়া নগণ্য প্রাযুক্তিক কৌশল নয়। তাইত মিকালেঞ্জেলোর 'ডেভিড' তার ষোল ফুট দীর্ঘ মার্বেলের দৃপ্ত গৌরবে ফিডিয়াসের অ্যাপোলোকেও হার মানালো। সে নিছক আদর্শ নয়, তার ভ্রূযুগে অনিশ্চয়তা, হাতের পেশীতে দৃঢ় প্রত্যয়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা। শুধু তিনি নন, ভেরক্কিয়ো এবং দোনাতেল্লো মধ্যযুগকে অনেকদূর ছাড়িয়ে

গেছেন। মিকেলাঞ্জেলোর প্রথম দিকের কাজ—'পিয়েতা'য় মৃত যীশুর বাইজেন্টীয় দীর্ঘায়িতন ও অনড়তা আর কুমারী মাতার নত কোমল মুখের বিষণ্ণ আত্মসমর্পণ যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে তা ক্ল্যাসিকাল যুগেও অকল্পনীয় ছিল। মিকালেঞ্জেলো ছাড়া কে সাহস করত সিসটাইন চ্যাপালের ছাদে স্বয়ং ঈশ্বরকে ফোটাতে তাঁর মহা মহিমময় মানবসৃষ্টির কাজে? অন্যদিকে আরও ঐহিক বাস্তবতায় নেমে আসুন। বত্তিচেল্লির 'ভিনাসের জন্ম' হয়তো প্রতীক কিন্তু নিছক নগ্ন নারীর সৌন্দর্য যে কামোদ্দীপনা জাগায় কোথায় তা প্র্যাক্সিটেলসের ভিনাসে? এখনো যেন ভিনাসের চুলে, গায়ে লেগে আছে সমুদ্রের লবণের গন্ধ। বত্তিচেল্লির 'প্রাইমাভেরা'-য় নারীর উরু থেকে পায়ের পাতা যেন জলপ্রপাতের ছন্দ পেয়েছে। লেওনার্দোর 'লা জ্যকন্দা' (মোনালিসা)র হাসির রহস্য আজ পর্যন্ত কে বুঝেছে? মুখের সঙ্গে ঠোঁট, ঠোঁটের সঙ্গে বঙ্কিম কটাক্ষ—সবই হাসছে, কেন, কে জানে? মানবজগৎ থেকে নেমে আসুন প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগতে। তাদের নিখুঁত অ্যানাটমি লেওনার্দোর নোটবই ও উইনডসর কাসলে রক্ষিত স্কেচে ধরা পড়েছে। রাফায়েলের 'মাদোনা'র কথা সবাই জানেন কিন্তু বিশুদ্ধ প্রতিকৃতির দিক থেকে 'সন্ত সেসিলিয়া' বা 'পোপ দশম লিও' কম যায় না। রাফায়েলের পূর্বসূরী জ্যর্জনের (Giorgione) 'ঘুমন্ত ভিনাস' আঁকতে পারলে রেনোয়া ধন্য হতেন।

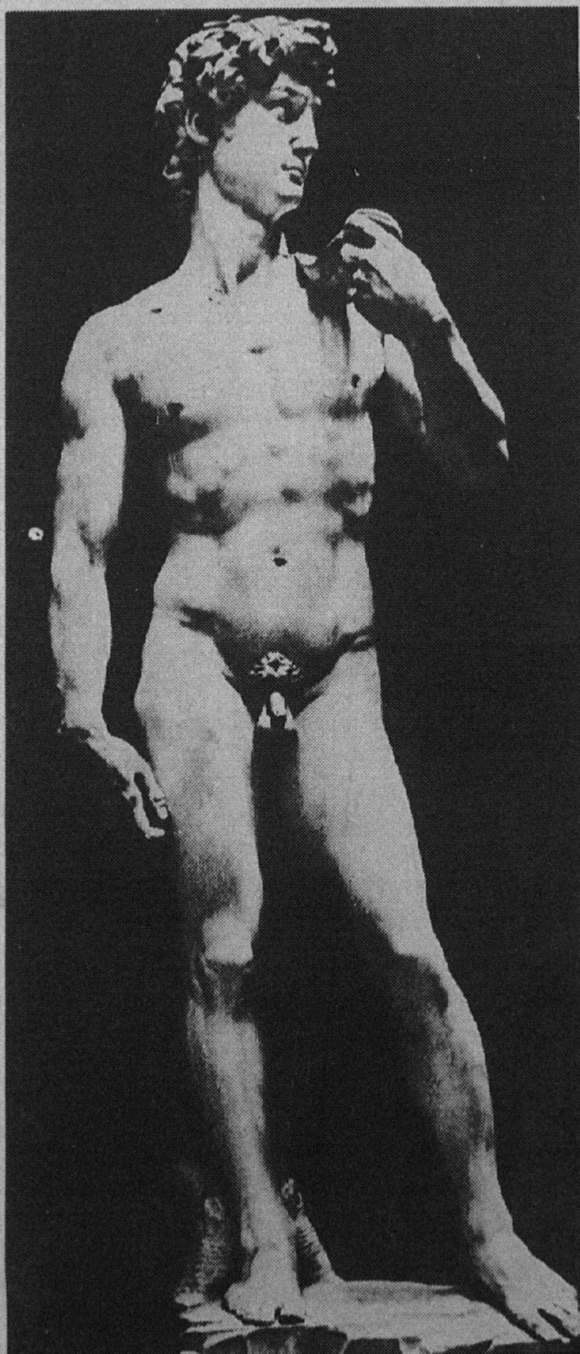
তাই এখানে প্রশ্ন উঠবে, ভাসারি বারবার বলছেন rinascita বা rinascimento-র আদর্শ—imitatio বা অনুকরণ—কিন্তু কিসের অনুকরণ? এবং তা কি অন্ধ অনুকরণ? তাহলে র‍্যনেশাঁসের বিশেষ মাহাত্ম্য কোথায়? ভাসারি বলছেন, অনুকরণ করতে হবে, ক্লাসিক (গ্রিক-লাতিন) maniera-র। এ শব্দের অর্থ রীতি বা আঙ্গিক করলে সবটা বোঝা যাবে না। লেখার রীতি, শিল্পের শৈলী, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক চিন্তার ধাঁচ বদলে ফিরিয়ে আনতে হবে হারানো ক্লাসিকাল রীতি, শৈলী, ধাঁচ। কিন্তু তা আদৌ অন্ধ অনুকরণ হবে না। তার উদ্দেশ্য হবে নতুন সাহিত্য, শিল্প, দর্শন সাধনার মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন। আর মধ্যযুগের কাছে পাঠ নেওয়া চলবে না। ফিরে যেতে হবে প্রাচীন গ্রিস-রোমে। তাঁদের কাছে শিখতে হবে রাজনীতি, যুদ্ধ কৌশল, শিল্পের আঙ্গিক, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার আত্মিক শক্তি। স্মরণ করুন পেত্রার্কার শিহরণ, যেদিন এক গীর্জার পুস্তকাগারে তিনি আবিষ্কার করলেন সিসেরোর এক গুচ্ছ হারানো চিঠি, কাব্যের উপর তাঁর বক্তৃতা—Pro Archia! এর অনেক পরে বেম্বো ইসাবেলাকে লিখছেন—"far better to speak like Cicero than to be Pope." কিন্তু পেত্রার্কার নতুনত্ব সিসেরো আবিষ্কারে বা নকলে সীমাবদ্ধ নয়, নতুনত্ব—প্রেয়সী লরাকে নিয়ে কবিতা (Canzoniere বা Songbook) রচনায়। একটা নমুনা দিচ্ছি—

"He looks in vain for heavenly beauty, he
Who never looked upon her perfect eyes,
The vivid blue orbs burning brilliantly—
He does not know how Love yields and denies,
He only knows who knows how sweetly she
Can talk and laugh, the sweetness of her sighs."
(trans—Joseph Auslander)

রেনাঁ (Renan) পেত্রার্কাকে 'প্রথম আধুনিক মানুষ' আখ্যা দিয়েছেন ক্লাসিক জগৎ ফিরিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু আমি বলব—তাঁর মানবিক অনুভূতির জন্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য



লেওনার্দো দা ভিঞ্চি : মোনালিসা



মিকেলাঞ্জেলো : ডেভিড



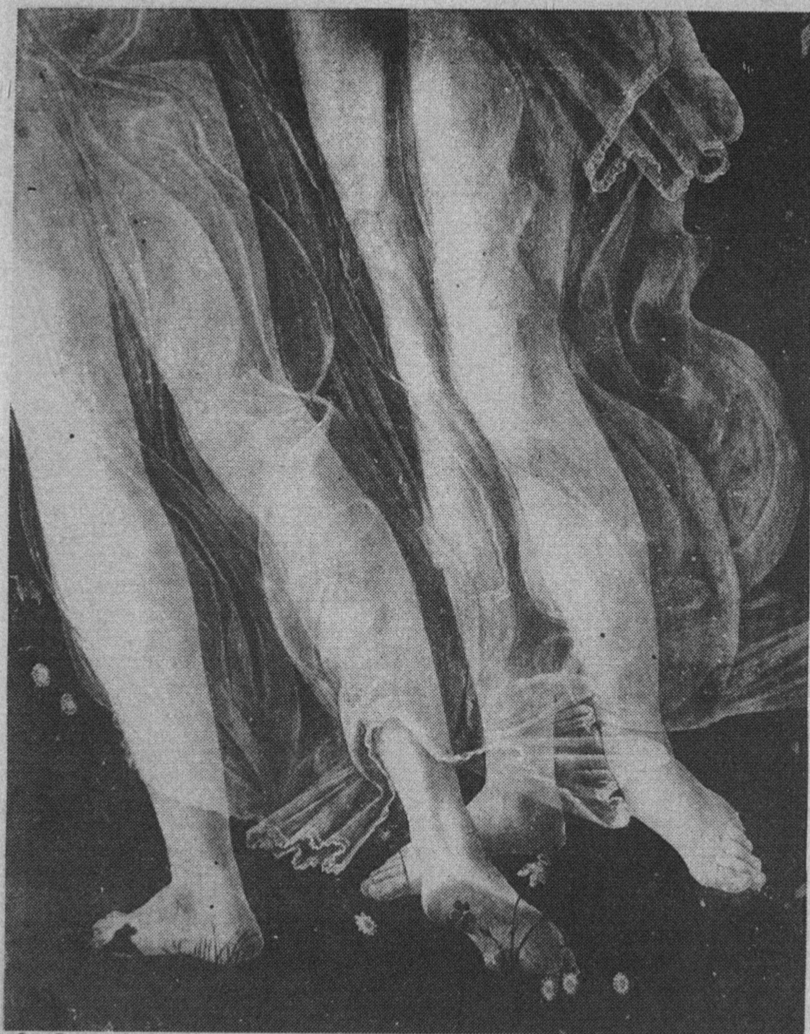
লেওনার্দো দা ভিঞ্চি : ভার্জিন অফ দা রক্‌স্



লেওনার্দো দা ভিঞ্চি : অশ্ব (স্কেচ)



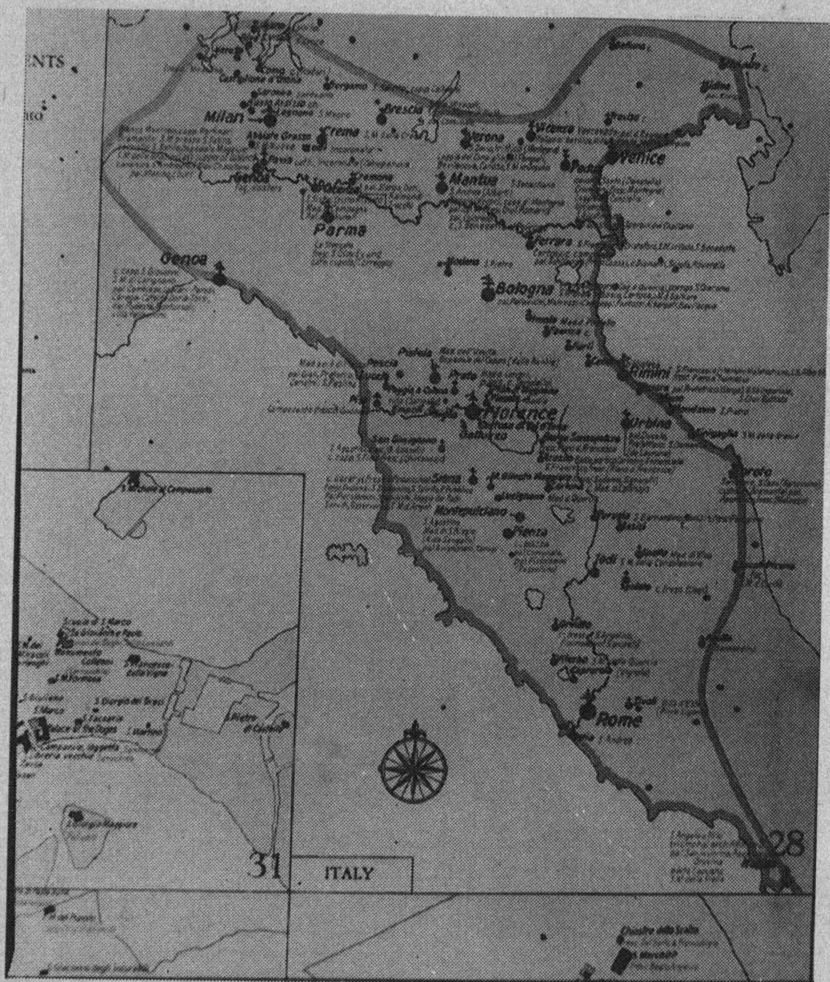
মিকেলাঞ্জেলো : পিয়েটা



বত্তিচেল্লি : লা প্রাইমাভেরা



লেওনার্দো দা ভিঞ্চি : পুরুষের মস্তক এবং অন্যান্য শারীরসংস্থান


Milan
Brescia
Verona
Vicenza
Venice
Mantua
Parma
Ferrara
Genoa
Bologna
Rimini
Pistoia
Prato
Florence
Urbino
Siena
Montepulciano
Pienza
Rome
28
31
ITALY

ইতালী

জগতের প্রতি আকর্ষণের জন্য। বোকাচ্চো (Boccaccio) শুধু লাতিন জানতেন না, গ্রিকও জানতেন, কিন্তু তাঁকে মনে রেখেছি 'ডেকামেরন'-এর জন্য, প্রেয়সী (ফিয়ামেত্তা)র উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতার জন্য। তাঁরই আট পংক্তির স্তবক অনুকরণ করেন আরিওস্তো, যিনি ওভিদের অনুসরণে প্রেমের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনলেন শৃঙ্গার রস।

এই সময় পাদুয়ার এরিনা চ্যাপেলে ও ফ্লোরেন্সের সান্তাক্রোসে জত্তো (Giotto) আঁকছেন নতুন শৈলীর প্রাচীর চিত্র। এরিনায় Nativity, Raising of Lazarus, The Betrayal, Descent from the Cross; সান্তাক্রোসে—সন্ত ফ্রান্সিসের অমর কাহিনী। পরিপ্রেক্ষিত, শারীরসংস্থান, এমনকি ড্রইং তখনও কাঁচা। কিন্তু তাই ধরেই এগিয়ে গেলেন মান্তেনা (Mantegna), মাসাচ্চো (Masaccio), মিকেলাঞ্জেলো। ফ্লোরেন্সের ব্যাপটিস্টারির ব্রোঞ্জ দরজা করতে গিয়ে (১৪৫৬) গিবার্টি (Ghiberti) গ্রিস-রোমের অনুকরণের কথা বলেননি, বলেছেন "to imitate nature to the utmost." কিন্তু একেই মিকেলাঞ্জেলো বলছেন—"fit to be the gates of Paradise" ব্রুনেল্স্কি যখন সানলরেঞ্জোর গীর্জার চূড়া (duomo) বানালেন (১৪৩৬) বা মিকেলোজ্জি বানালেন মেদেচির প্রাসাদ, তখন তাঁরা কেউই অতীত যুগের ভিট্রুভিয়াসের স্থাপত্যবিদ্যার আইনকানুন মানেননি। এ কি রকম ক্লাসিসিজম্?

রাজনীতির কথায় আসি। মাকিয়াভেল্লি লিখছেন ঃ দিনের কাজ শেষ হলে "for the span of four hours I forget the world, remember no vexation, fear poverty no more, tremble no more at death. I pass into their (Greek and Roman) world." এর মধ্যে আমরা মন্দিরে ঢুকে মন্ত্রজপ করার সুর শুনি। কিন্তু কার্যতঃ তাঁর The Prince কি একই সুরে বাঁধা? ফেদেরিকো সাবোদ (Chabod), তাঁর Machiavelli and Reniassance, ফেলিক্স গিলবার্ট, তাঁর Machiavelli and Guiccardini-তে কি লিখেছেন পড়ুন—মাকিয়াভেল্লির প্রকৃত মনোভাব টের পাবেন।

মধ্যযুগের রাজনীতির কর্ণধার ছিলেন ধর্মযাজক (আর্চবিশপ টমাস বেকেটের নাম কে না জানেন?)—র‍্যনেশাঁসের রাজনীতির কর্ণধার হলেন হিউম্যানিস্ট ঐতিহাসিকরা—ব্রুনি, মাকিয়াভেল্লি। কেন এমন হলো? কারণ, উভয় পর্বের মধ্যে আলবিজ্জি, পাজ্জি ও পিত্তি ষড়যন্ত্র ঘটে গেছে ফ্লোরেন্সে। ভিসকন্তি ও স্ফর্জার স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে মিলানে। রোমে বর্জিয়ারা প্রভুত্ব করছেন। লোরেঞ্জো মেদেচির মৃত্যুর পর তাঁর প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্রের স্থলে সোদেরিনির সাধারণতন্ত্র কায়েম হয়েছে। অথচ এঁরই মুখ্য আমলা মাকিয়াভেল্লি বহুদিন সিজার বর্জিয়ার নেতৃত্বে ইতালীর সংহতির স্বপ্ন দেখতেন এবং তাই তাঁকেই The Prince উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন[৭]। এখানে হিউম্যানিজমের দুটি পর্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আষর্কণ করছেন হ্যান্স ব্যারন—প্রথমটা civic humanism, যা সিসেরো ও রোমক সাধারণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলত, আর একটা স্বৈরতন্ত্র সমর্থক humanism, যার মুখে ভার্জিলের সাম্রাজ্য কীর্তন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন, ক্লাসিকসের প্রভাব নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? মধ্যযুগ কি ক্লাসিকসের চর্চা করত না? না, তা নয়। জানত, কিন্তু জানাটা ছিল একটা 'decorative fringe'—বাইরের অলংকরণ, অন্তরের অভীপ্সা নয়। র‍্যনেশাঁসে ক্লাসিকস হল—"a pattern of life". মধ্যযুগেও বাস্তবতা (realism) ছিল কিন্তু তা প্রকৃতির নকল—যান্ত্রিক ও সীমাবদ্ধ। র‍্যনেশাঁসে বাস্তবতা পেল একটা ভাবগত রূপ। লেওনার্দো তাকে 'ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব' আখ্যা দেননি, একটা স্বাতন্ত্র্য (autonomy) দিতে চেয়েছেন, তাকে নিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। অন্যদিকে র‍্যানেশাঁস কি পেগান, চার্চবিরোধী, সংশয়ী বা নিরীশ্বর? এডগার উইন্ড তাঁর Pagan Mysteries in the Renaissance গ্রন্থে দেখাচ্ছেন, "র‍্যানেশাঁস শিল্প এমন অনেক ভিনাসের মূর্তি তৈরি করেছে যাতে মাদোনা বা মদলেনের আদল সুস্পষ্ট।" উইটকোয়ার (Witkower) তাঁর Architectural Principles in the Age of Humanism গ্রন্থে লিখছেন, "খৃষ্টকে আগে ক্রুশবিদ্ধ মানবত্রাতা রূপে দেখা হত, এখন দেখা হল সর্বাঙ্গসুন্দর সঙ্গতির প্রতীক রূপে।" মিকেলাঞ্জেলোর নিও-প্লেটোনিক ভাবধারা সিসটাইন চ্যাপেলে জড় থেকে অধ্যাত্মস্তরে উত্তরণের আকুতি ফুটিয়ে তুলেছে। এমনকি Notebooks-এর গভীর বিজ্ঞানমনস্ক লেওনার্দোর আঁকা Virgin of the Rocks-এর কুহেলিকাবৎ আবরণ (sfumata) যে রহস্যের ব্যঞ্জনা রেখে যায় তা কি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছেনি?

আসলে র‍্যানেশাঁসের বিভিন্ন পর্ব। কোথায় গেল দ্বিতীয় পর্বে হান্স ব্যারন কথিত 'civic humanism', যার জন্ম হয়েছিল মিলানের স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে? তা শেষ হয়ে গেল লোরেঞ্জোর প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্রে, স্ফর্জা ও বর্জিয়াদের প্রকাশ্য আগ্রাসনে, শেষে ইতালীর বুকের ওপর ফ্রান্স ও স্পেনের দ্বৈরথে। র‍্যানেশাঁস ব্যক্তিমানুষের নিজস্বতা ও অনন্যতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল ('the ban laid on personality was dissolved')—একথা বুর্খহার্টের অনুসরণে করেছেন অম্লান দত্ত (জিজ্ঞাসা সংকলন, ১৩৯৯, পৃ ৭৪)। বুর্খহার্ট কিন্তু মনে করতেন, নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে সে যুগের ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, নির্বাসন, সর্বসময় বিপদসঙ্কুল পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছিল— "for political impotence does not hinder the different tendencies and manifestations of private life from thriving in the fullest vigour and variety." নির্বাসিত কসিমো বা লোরেঞ্জোর ক্ষেত্রে সত্য হলেও বর্জিয়া পোপ (বিশেষত সিজার বর্জিয়া) বা লোডোভিকো ইলমোরো (মিলান) সম্বন্ধে একথা খাটবে কি? যে ব্যক্তিত্ব নিজস্বতা ও অনন্যতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিবেশী ও বহু লোকের ক্ষতিসাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না বরং লক্ষ্যকে মুখ্য করে, উপায়কে গৌণ করে, এক ধরনের নীতি চালু করার চেষ্টা করে (যেমন করেছেন মাকিয়াভেল্লি—The Prince-এ), তা কি সমর্থনযোগ্য? পম্পনজ্জি বলেছেন, "The whole human race is like one body." চেল্লিনি ও আরেতিনো তাঁর ঔদার্যে হাসতেন। কিন্তু তাও র‍্যানেশাঁসের একটা দিক। যে লোরেঞ্জো মেদেচি যৌবনের উগ্রতায় কামোদ্দীপক গান ও কবিতা লিখেছেন, তিনিই এমন সব স্তবগাথা লিখেছেন যাতে "the doctrine is upheld that the visible world was created by God in love..." পিকো যে মানবের মহত্ত্ব ঘোষণা করছেন, মিকেলাঞ্জেলোর শিল্পে তারই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অতীন্দ্রিয় অভীপ্সা প্রকট। সব নিয়ে বিচিত্র, জটিল রূপ র‍্যানেশাঁসের। হুইজিঙ্গা তাই বলছেন, "Whoever casts a single schema as a net to recapture this Proteus will catch himself in its meshes."[৮]

৩

র‍্যানেশাঁসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকের জানা, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা অনেক স্থলে নতুন আলোকপাত করেছে। র‍্যানেশাঁস সম্পর্কে কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণা চালু রয়েছে, যেমন বাণিজ্যিক বিপ্লব, বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়, ধনতন্ত্রের সূচনা

ইত্যাদির সঙ্গে তার কার্যকারণ সম্পর্ক। এসব (যান্ত্রিক) মার্ক্সবাদী সিদ্ধান্ত সত্য কিনা পরীক্ষা করা দরকার।

ইওরোপের মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নতুন যুগ শুরু করেন ডপসক (Dopsch), লাতুস (Latouche), আঁরি পিরেন (Henri Pirenne)। পিরেনের মতে ভূমধ্যসাগরে ইসলামের অভিযান ও আধিপত্য বিস্তার নগর-ভিত্তিক ক্লাসিক সভ্যতার অবসান ঘটায়। কিন্তু রবার্ট লোপেজ (Lopez) তাঁর 'Mohammed and Charlemagne—a Revision' এবং কেম্‌ব্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অব ইউরোপ-এর দ্বিতীয় খণ্ডে পিরেন মতবাদের খণ্ডন করেছেন। পিরেন বলেছিলেন, পশ্চিম ইওরোপ থেকে স্বর্ণমুদ্রা, প্রাচ্য রেশমী ও রঙিন বস্ত্র এবং প্যাপিরাসের অন্তর্ধান—অবক্ষয়ের চিহ্ন। লোপেজ দেখালেন, এগুলি কোনদিনই উবে যায়নি। এখন আমরা মোটামুটি বলতে পারি—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে চতুর্থ-পঞ্চম শতকে বাণিজ্যের অবনতি, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের প্রথমে উন্নতি এবং নবম শতক পর্যন্ত পুনরাবনতি ঘটেছিল। দশম শতকের শেষ থেকে বাণিজ্যের গতি উর্ধ্বমুখী হল এবং ইওরোপ মুদ্রানির্ভর অর্থনীতি (money-economy)র স্তরে উন্নীত হল। ক্যারোলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভাজন (৮৪৩), উত্তর ইওরোপে ক্রমবর্ধমান ভাইকিং আক্রমণ এবং গ্রিক, ইহুদি, মুসলিম মধ্যস্থরা পিছিয়ে পড়ায় ইতালীর বণিকদের সুদিন ফিরে আসে। ভেনিস, জেনোয়া, নেপলস, পিসা ছিল তার অগ্রদূত। উত্তর ইওরোপ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পোস্টান এ ধরনের বাণিজ্যিক তথা নাগরিক পুনর্জীবনের কারণরূপে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[১] দক্ষিণ ইওরোপের ক্ষেত্রে লোপেজও জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে prime mover আখ্যা দিয়েছেন। তবে নগরায়ণ শুধু কৃষিপণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি, কৃষকবিক্রেতাদের লাভ ও সামন্তপ্রভুদের বর্ধিত আয়ের জন্য সম্ভব হয়নি—হয়েছিল নতুন এক বণিকশ্রেণীর অভ্যুদয়ে। পোস্টান লিখছেন, "Trade was becoming to an ever increasing degree the affair of the wholetime merchants and artisans trading in a professional way."

সমবার্ট প্রথম খাঁটি বুর্জোয়াদের সন্ধান পান চতুর্দশ শতকের শেষে—ফ্লোরেন্সে। ব্রোদেল তাঁর বিখ্যাত Civilisation and Capitalism 15th-18th Century গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ধনতন্ত্রের সঙ্গে এর নাম যুক্ত করেছেন : "Thirteenth century—and *a fortiori* fourteenth century Florence was a capitalist city, whatever meaning attaches to the word." তবু 'অর্থনৈতিক উন্নতি'র বর্তমান সংজ্ঞা মেনে নিলে বলতে হয়—এসব শতকের উন্নতি ব্যাপক ছিল কিন্তু গভীর ছিল না। "It was not, like modern growth, the result of greater capital input and of an improved quality of labour force." ধনতন্ত্র শব্দটা মধ্যযুগ সম্বন্ধে প্রয়োগ না করাই শ্রেয়। মরিস ডব (Dobb) তার কাল নির্ধারণ করেছেন ষোড়শ শতকের শেষে, সপ্তদশের প্রথমে, অর্থাৎ র‍্যানেশাঁসেরও পর[১*]।

লোপেজের মতে, দ্বাদশ শতক ছিল 'বাণিজ্যিক বিপ্লব'-এর স্বর্ণযুগ এবং তার নেতৃত্ব দিয়েছিল ইতালী। "Italy was to the medieval economic process what England was to the modern." মিলান, ভেনিস, নেপলস ও ফ্লোরেন্সে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে প্রতি সহরের চারদিকে দ্বিতীয় প্রাচীর নির্মাণে এবং সহরতলি ও সন্নিহিত জনপদের ওপর সহরের আধিপত্যে। জনসংখ্যার সঙ্গে বাড়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক চাহিদা, বিস্তৃত হয় বাজার। ক্রুসেডস্ তাকে ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের রূপ দেয়। বাণিজ্যে বেশি লাভ হওয়ায় অধিকাংশ নাগরিক সেই বৃত্তি নেয়—এমনকি আভিজাত্যের মতই সম্মানিত ছিল কাঞ্চনকৌলিন্য।

কোথা থেকে মূলধন এল সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। সমবার্ট বলছেন, সামন্তপ্রভুদের জমানো খাজনা ও লেভি থেকে। কিন্তু জেনোয়া সম্বন্ধে গবেষণা করে রেমন্ড রুভার দেখাচ্ছেন—বাণিজ্যে লাভই মূলধনের উৎস। জেনোয়াতেই জমা খরচের হিসাব আলাদা লেখার ব্যবস্থা (১৩৪০), সামুদ্রিক বীমা (১৩৭০), স্বর্ণমুদ্রার পুনঃপ্রবর্তন। ভেনিসে আবার ১১৬৭তেই ঋণপত্র ছাড়ার খবর মেলে। ফ্লোরেন্সের ফ্লোরিনের মতই ভেনিসের ডাকাট (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল বিশ্বাসযোগ্য। মূলধন ব্যবহার করার জন্য নানাধরনের অংশীদারী প্রথা (partnership) চালু হয়। দেখা যায় অভিজাত, যাজক, কারুশিল্পী, দোকানদার—সবাই অংশীদারী ব্যবসায় নেমেছে। চার্চ ছিল মহাজনী কারবারের বিরোধী, কিন্তু ব্যাংকিং প্রথা শুরু হওয়ায় ধর্মীয় নিষেধ বলবৎ করা গেল না।

প্রাতোর ব্যাংকার—দাতিনি (Datini)-র হিসেব বই পরীক্ষা করে প্রচুর তথ্য জানা গেছে। ত্রয়োদশ শতকের শেষে সিয়েনা থেকে ব্যাংকিং-এর কেন্দ্র সরে যায় ফ্লোরেন্সে। বার্দি, পেরুজ্জি, আলবিজ্জি ও শেষে মেদেচি পরিবারের তা নিয়ে রেষারেষি মাঝে মাঝে রক্তপাত ঘটাত।[১০] কসিমোর আমলে মেদেচি ব্যাংকের চরম শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। স্বয়ং পোপ পঞ্চম নিকোলাস ও দ্বিতীয় পিয়ুস ছিলেন ঋণগ্রহীতা—তথা পৃষ্ঠপোষক। মেদেচিপরিবার এর সঙ্গে যোগ করেছিল বাণিজ্য। সবচেয়ে লাভজনক ছিল ফটকিরি, কিন্তু পশম, মশলা, চিনি, ফল থেকে ফার, ব্রোকেড এবং গহনা ও কম যায় না। ফ্ল্যান্ডার্স হয়ে সুদূর ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল মেদেচি সাম্রাজ্য। কিন্তু চিরদিন কারুর সমান যায় না। মধ্যযুগের শেষে যে সংকট আরম্ভ হল তার ভালো বর্ণনা পাই কেমব্রিজ অর্থনৈতিক ইতিহাস, লোপেজ, মিস্কিমিন, সাপরি ও রুভারের লেখায়।[১১] রুভার লিখছেন, কসিমো ও অন্যান্যদের সূক্ষ্ম ব্যবসাবুদ্ধি ও সুষ্ঠু পরিচালনা যেমন উন্নতির কারণ, তেমনি লোরেঞ্জোর ব্যবসাবুদ্ধির অভাব, স্যাসেটির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, ইংল্যান্ডের চতুর্থ এডওয়ার্ডকে গোলাপের যুদ্ধের জন্য দেওয়া ঋণ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি কারণে লন্ডন, ব্রুজ, মিলান ইত্যাদি মেদেচি ব্যাংকের শাখা বন্ধ করে দিতে হয়। তার অনেক আগে পেরুজ্জিদের ব্যাংক ব্যবসার পতন হয়েছিল।

সংকটের মূল কারণ হল—কিছু অঞ্চলে জনসংখ্যাহ্রাস, ভয়াবহ প্লেগ মহামারী, ক্রুসেডস্-এ জেতা রাজ্যসমূহ হারানোর ফলে বাণিজ্যের অবনতি, তুর্ক সাম্রাজ্য বিস্তার, ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-ফ্ল্যান্ডার্সের যুদ্ধ, অনেক নগররাষ্ট্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, পৌনঃপুনিক কৃষকবিদ্রোহ। এর সঙ্গে পরিবেশবিশেষজ্ঞরা যোগ করেছেন—পশ্চিম ইওরোপে আবহাওয়ার অবনতি। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে নাকি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছিল। 'আনাল' পত্রিকায় লাদুরি[১২] ও ব্রোদেল তাঁর বিপুল Civilisation and Capitalism[১৩] গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কি ভাবে সুদূর চীন থেকে সার্থবাহদের সঙ্গে প্লেগ বীজাণু ইওরোপে প্রবেশ করল।

যে ধরনের প্রাযুক্তিক উৎকর্ষ, উৎপাদনের নতুন উৎস আবিষ্কার ও সামাজিক বোঝাপড়ার ফলে মাথা পিছু ক্রয়ক্ষমতা অটুট থাকত তা সম্ভব হয়নি। রুভার অবশ্য স্বীকার করেন না, সব সহর বা শ্রেণী সমান দুর্দশায় পড়েছিল। ছোট সহরের দুর্দশার মূল্যে বড়ো সহরের বোলবোলাও বজায় ছিল। কিন্তু লোপেজের মতে র‍্যানেশাঁস (১৩৩০ থেকে ১৫৩০) মোটামুটি hard times বা অর্থনৈতিক মন্দার যুগ। মহামারী ফ্লোরেন্সের

জনসংখ্যাকে মাত্র ৫০,০০০-এ নামিয়ে এনেছিল। ত্রয়োদশ শতকের বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করলে এর ভয়াবহতা বোঝা যাবে। বোকাচ্চোর 'ডেকামেরন' সে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি বহন করছে। কাম্যুর বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে "Personne ne sera jamais libre tant quil yaura des fleaux."

মাইকেল পোস্টান উত্তর ইওরোপের মন্দার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন এবং মূল কারণ স্বরূপ জনসংখ্যাহ্রাসকেই উল্লেখ করেছেন। ১৩২০ থেকে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত secular slump চলে, যদিও মাঝে মাঝে স্বল্পস্থায়ী উন্নতি দেখা যেত, যেমন পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে আবার যখন জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করল এবং আমেরিকা থেকে আমদানী রূপো ইওরোপ প্লাবিত করে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি (যাকে price revolutionও বলা হয়েছে) ঘটাল, তখন হাই র‍্যানেশাঁস শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের অর্থনৈতিক উন্নতির জোরেই র‍্যানেশাঁসের অসামান্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি না বাজারের ক্রিয়া কোনটা কারণ তা নিয়ে আজও বিতর্ক চলেছে। ১৯৭০-এর শেষে মার্ক্সবাদীরা জনসংখ্যাভিত্তিক determinism-এর প্রতিবাদে আগেকার শ্রেণীবিন্যাসকে অধিক জোর দিয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ রাজনৈতিক superstructure-এর চেয়েও উৎপাদন প্রথাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এ বিষয়ে অ্যাসটন ও ফিলিপিন সম্পাদিত 'The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe (Camb. 1985) পাঠ্য। তবে সন্দেহ নেই যে র‍্যানেশাঁস শিল্পের প্রথম পর্বে যে আশা, উদ্দীপনা, প্রাণোল্লাস দেখি পরে তা দেখি না। সৃষ্টির সবক্ষেত্রে একটা সংশয়, হতাশা ও আত্মসমর্পণের সুর লেগেছে। মান্দ্য কি তার মূল কারণ ?

৪

অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সমসাময়িক। চতুর্দশ শতকের সামাজিক সচলতা ক্রমে অদৃশ্য হল। মান্দ্যের জন্য সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামীণ শ্রমিক, সহুরে অদক্ষ শ্রমিক ও স্থানীয় craft guild. ফ্লোরেন্সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হল মোট ৪০০ পরিবারে।[১৪] অভিজাতরা আগেই হটে যায় কিংবা বাণিজ্যে ঢুকে পড়ে। এখন ধনী বণিক, ব্যাংকার, নগর শাসকবৃন্দ, সচিব শ্রেণীর আমলা (অধিকাংশই হিউম্যানিস্ট) এবং মেদেচি পরিবারের পৃষ্ঠপোষিত কবি, শিল্পী, পণ্ডিতরা যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করলেন তা অলিগার্কি ছাড়া আর কি ?

তবু রাজনৈতিক দিক থেকে র‍্যানেশাঁস দুটো আদর্শবাদের সংঘাতের ফল—উত্তর ইতালীর অভিজাত বা নবঅভ্যুদিত স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে মধ্য ইতালীর বাণিজ্য ও শিল্পনির্ভর কম্যুনের সংঘাত। মিলানের ভিসকন্তিরা গ্রাস করল লম্বার্ডি। ভেনিস তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রাচীর গড়তে মূল ভূখণ্ডে প্রভাব বাড়াল। মেদেচিরা পরল গণতান্ত্রিক মুখোশ এদের বিরুদ্ধে ফ্লোরেন্সের স্বাধীনতা বাঁচাতে। ফ্লোরেন্সকে বলা হল 'ইতালীর স্বাধীনতার জননী।' ব্রুনি ঘোষণা করলেন, "We worship freedom more than anything else." বারবার সিসেরোকে নাগরিক মানববাদ (civic humanism)-এর প্রতীক রূপে স্মরণ করা হল। রুবিনস্টাইনের 'Florence and the Despots in Fourteenth Century', ও হ্যান্স ব্যারনের বহু রচনায়, সাধারণতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্রের বিরোধের পটভূমিকায়

পঞ্চদশ শতকের হিউম্যানিজমের রূপ বিশ্লেষিত। কিন্তু মেদেচি-ধাঁচের নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র টিকল না—অভ্যন্তরীণ ঈর্ষা এবং বিদ্রোহের ফলে। বার্দি, আলাবিজ্জি, পাজ্জি, রিয়ারিও প্রভৃতি পরিবার মেদেচিদের বাড়বাড়ন্ত সহ্য করতে না পেরে ষড়যন্ত্র করল, কসিমো ও লোরেঞ্জোকে নির্বাসনে পাঠাল, গিলিয়ানোকে হত্যা করল। পোপরা অনেক সময় (যেমন চতুর্থ সিক্সটাস) তাতে মদৎ দিয়েছেন। ফ্লোরেন্সের দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ (popolo minuto) বিদ্রোহ করত মাঝেমাঝেই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্রান্ত ও জনগণের বিদ্রোহের চাপে মেদেচিরা বিপর্যস্ত হয়। এরপর লাগল নগর রাষ্ট্রের সঙ্গে নগর রাষ্ট্রের ক্ষমতার লড়াই। ফ্লোরেন্স, মিলান, নেপলস ত্রিশক্তি চুক্তি দ্বারা কসিমো যে শক্তিসাম্য এনেছিলেন তা স্থায়ী হয়নি। পরে দেখব ফ্লোরেন্স ও মিলান ফ্রান্সের দিকে এবং ভেনিস ও নেপলস সম্রাটের দিকে চলে গিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। র‍্যনেশাঁসের মুমূর্ষু দেহের ওপর চলছিল ফ্রান্স ও স্পেনের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী দ্বৈরথ।[১৫]

এই হিংসা, চক্রান্ত, গুপ্তহত্যা, গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে হিউম্যানিস্ট দার্শনিকরা মানুষের সামান্য ধর্মের চেয়েও তার বিশেষত্ব, পার্থক্য (ধন, মান, ভাগ্য, শক্তি)-এর ওপর জোর দিলেন। অলিগার্কি ও স্বৈরতন্ত্রের প্রচ্ছায়ে বাস করে সাধারণ লোকের কথা ভাবতে পারেননি তাঁরা।[১৬] জড়বাদের, ভোগস্পৃহার, নীতিহীন রাজনীতির জয় গান গাইলেন তাঁরা। ব্রুনির ইতিহাস লিভির অনুকরণে রোমক সাধারণতন্ত্রের গুণগান করলেও ফ্লোরেন্সের এলিট-শাসন সমর্থন করেছে। মাকিয়াভেল্লি বহুদিন সিজার বর্জিয়ার ভয়াবহ কীর্তিকলাপে মুগ্ধ ছিলেন। গ্যারেট ম্যাটিংলি (Mattingly) মাকিয়াভেল্লির 'The Prince' আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "his (Machiavelli's) views were usually clouded by wish and prejudice, he was easily deceived, and he was not, in the things that really mattered—those affecting the daily course of politics—a very acute, discriminating or even accurate observer." গুইচারদিনি (Guiccardini)-র মত ঐতিহাসিক মেদেচিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিয়ে শুরু করেন কিন্তু মেদেচি বিতাড়নের পর সাধারণতন্ত্রের কাণ্ডকারখানা দেখে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক হলেন। (ভলতেয়র যেমন দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের enlightened despotism সমর্থন করবেন।) গুইচারদিনির আশাবাদ অনেকখানি উবে গিয়েছিল। মানুষ যেন ভাগ্যের নিয়ন্তা নয়, ক্রীড়নক মাত্র। তাঁর 'History of Italy' যেন এক ট্র্যাজেডি। রাজনীতি, শিল্পকৃতি, মূল্যবোধ সর্বত্রই অবক্ষয়ের ছায়া। প্রথম পর্বের র‍্যনেশাঁস ভগবৎ-নিয়ন্ত্রিত *Fortuna*-র বিরুদ্ধে মানুষের *Virtu* (যুক্তি, ইচ্ছাশক্তি, প্রয়াস)কে প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেছিল। ষোড়শ শতকের শেষে সেই Fortuna-ই জিতল। পগিয়োর বৃদ্ধ বয়সের রচনায় পৃথিবীকে 'অশ্রুর নদী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। লেওনার্দো লিখেছেন—of the cruelty of man. এই ধরনের ট্র্যাজিক বোধ সহ্য করতে না পেরে টমাস মোর, কোলে, এরাজমুজ (Erasmus) মধ্যযুগের মরমিয়াবাদ ও র‍্যনেশাঁসের হিউম্যানিজম মিলিয়ে এক নতুন জীবনদর্শন রচনা করতে চেয়েছিলেন। মজার কথা—ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট চার্চ—উভয়েই হিউম্যানিস্টদের কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু হিউম্যানিস্টরা এদের কাজে লাগাতে পারেনি (ঠাণ্ডা লড়াই এর জাঁতাকলে পড়া এই শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করুন)।

তবু কসিমো, লোরেঞ্জো, পোপ পঞ্চম নিকোলাসের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে হিউম্যানিজম্ পুরোপুরি ব্যর্থ হতো। ফিয়েলফোর হোমর অনুবাদ (লাতিনে), লোরেঞ্জো

ভাল্লার থুকিডিডিস অনুবাদ, মানেত্তির মূল হিব্রু থেকে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং গ্রিক থেকে নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ-এ সহায়তা করে নিকোলাস অক্ষয়কীর্তি রেখেছেন। উরবিনোর ডিউকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কি কাস্তিলিয়োন লিখতে পারতেন 'The Courtier'? লোরেঞ্জো মেদেচির দাক্ষিণ্য ছাড়া ফ্লোরেন্সের প্লেটো আকাদেমি—অর্থাৎ ফিচিনো, পলিটিয়ানো ও পিকোকে কি ভাবা যায়? ভেনিসের অ্যালডাইন প্রেসই প্রথম ছাপল অ্যারিস্টটলের সমস্ত রচনাবলী, পরে সব গ্রিক ক্লাসিক। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—গ্রিক নাটক। ক্রিস্টোফার লান্দিনো একাই হোরেস, ভার্জিল এবং প্লিনি সম্পাদনা করেছিলেন। এ বিষয়ে অনেক তথ্য মিলবে লুসিয়েঁ ফেভর ও আঁরি মাত্যাঁর 'The Appearance of the Book' গ্রন্থে।

কিন্তু ক্লাসিক নিয়ে উন্মাদনার মধ্যেও মাতৃভাষা উপেক্ষিত হয়নি। দান্তে ও পেত্রার্কার অনুসরণে তাসকান ভাষায় লোরেঞ্জো ও পলিটিয়ানো কিছু অনবদ্য প্রেমগীতি রচনা করেন। লোরেঞ্জোর ভাই গিলিয়ানোর প্রেয়সী সিমোনেত্তার উদ্দেশ্যে পলিটিয়ানো-রচিত La bella Simonetta এক অসাধারণ লিরিক যা সিমন্ডস (Symonds)-এর অনুবাদে আজও আমাদের স্পর্শ করে।[১৭] কিন্তু মহাকাব্য তখনও মধ্যযুগের প্রভাব কাটাতে পারেনি। আরিওস্তোর 'Orlando furioso'তে মাঝে মাঝে লিরিকের দোলা লাগলেও তা মুখ্যত le donne, l' cavalier, l' arme, gli amori অর্থাৎ নারী, নাইট, যুদ্ধ ও প্রণয় নিয়ে। পেত্রার্কার 'ক্যানজনিয়ের' আজও পড়ে লোকে মুগ্ধ হয় কিন্তু কে পড়ে তাঁর মহাকাব্য—'Africa'? মিকেলাঞ্জেলোর সনেটগুচ্ছ ইতালীর কাব্যের সম্পদ। বোকাচ্চোর নভেল্লা—'Decameron' ছেড়ে কেউ উদালের কমেডি পড়ে না। র‍্যনেশাঁসের শ্রেষ্ঠ কাব্য-নাটকের জন্য আমাদের ইংল্যান্ডের দিকে তাকাতে হবে।

৫

দর্শন প্রসঙ্গে এ যুগে তিনটি ধারা লক্ষ্য করেছেন ক্রিস্টেলার।[১৮] মধ্যযুগে যে অ্যারিস্টটেলীয় (স্কলাস্টিক) ও প্লেটোনিক চিন্তাধারা প্রবল ছিল তা র‍্যনেশাঁসের যুগেও প্রবহমান। দ্বিতীয় ধারাকেই আমরা হিউম্যানিজম্ বলি। হিউম্যানিজমকেও কালানুক্রমে তিন পর্বে ভাগ করা যায়: (১) পেত্রার্কীয়, যার মধ্যে রিভাইভ্যালিজমের সুর শোনা যায়, অর্থাৎ রিয়েনজির মত প্রাচীন রোমান রিপাবলিকে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকট; (২) পঞ্চদশ শতকের প্রথমের 'সিভিক হিউম্যানিজম', যা নিয়ে হ্যান্স ব্যারনের গবেষণা বহুল স্বীকৃত; (৩) ঐ শতকের শেষের ও ষোড়শ শতকের প্রথমের মাকিয়াভেল্লি—গুইচারদিনির হিউম্যানিজম, যা অনেক বেশি বাস্তববাদী। (অবশ্য ম্যাটিংলি স্বীকার করতে রাজি নন)। তৃতীয় ধারা হল 'নিও-প্লেটোনিজ্‌ম', যার সূতিকাগৃহ—ফ্লোরেন্সের প্লেটোনিক আকাদেমি, যার পুরোহিত—ফিচিনো, যার সবচেয়ে বড়ো উত্তরসাধক—মিকেলাঞ্জেলো।

মধ্যযুগের স্কলাস্টিসিজম্ (scholasticism) খৃষ্টান ধর্মমতের সঙ্গে অ্যারিস্টটলের লজিক এবং পদার্থ, রসায়ন ও জীবতত্ত্ব মিশিয়ে গঠিত হয়েছিল। তার ওপর পড়েছিল আরবী ভাষ্য (বিশেষত অ্যাভেরোজ)-এর প্রভাব। সব সমন্বয় করে টমাস অ্যকুইনাস এ দর্শন সৃষ্টি করেন,—যা বিধৃত হয়ে আছে তাঁর বিপুল 'Summa Theologiae' গ্রন্থে। মধ্যযুগে প্লেটো অজানা ছিলেন না, পিথাগোরাসও নয়। তাঁদের গণিত-নির্ভর চিন্তা অ্যারিস্টটেলীয় পদার্থবিদ্যা অস্বীকার করে প্রকৃতির রহস্য বুঝতে চেয়েছিল। প্লেটোর ও প্লটিনাসের মূল

গ্রিক রচনা পড়ে ফিচিনো, পিকো, লান্দিনোর দল নিও-প্লেটোনিজমকে বিকল্প বিশ্ববীক্ষার মাধ্যম করে তুললেন।

সব দর্শনের মত র‍্যনেশাঁস দর্শনের মূল ছিল মানব প্রকৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ, তার মূল্যবোধ বিশ্লেষণ, ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ। প্রথম থেকেই তর্ক উঠল—যুক্তি কতটা মানা হবে, কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে বিশ্বাসকে। পাদুয়ার পম্পোনজ্জি যুক্তি বা বিশ্বাস কোনটার ওপর আস্থা না রাখতে পেরে স্টোইক আত্মসর্পণ সমর্থন করলেন। মানুষকে মনে করতে হবে ধর্মই ধর্মের শেষ, ভালো হওয়াটাই ভালো হওয়ার পুরস্কার। অসাম্য বিশ্ব ও সমাজব্যবস্থায় এমন অনুস্যূত যে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকায় শ্রেয়। অর্থাৎ status quo মেনে নাও। নিকোলাস ক্যুজেনাসের সঙ্গে প্লেটোনিক চিন্তার পুনরভ্যুদয় ঘটল এবং তা পূর্ণতা লাভ করল ফিচিনোর মধ্যে। একদিক দিয়ে এ চিন্তাধারা মরমীয়াবাদ (যা যুক্তির ওপরে অবাঙমনসগোচরের খোঁজ করে) এর দিকে নিয়ে যায়, অন্যদিকে বাস্তবকে প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয় করে, কোন নির্বস্তুক, *a prori* ধারণা আমল দেয় না। আর্নস্ট ক্যাসিরারের ভাষায়, "Cusanus played an important role both in the reawakening of objectivity and in the deepening of subjectivity."[১১] সসীম সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধান (deduction নয়) লব্ধ জ্ঞানের পরিধি বাড়াবে, অসীম সম্বন্ধে ভাবনা আমাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগাবে। ঈশ্বর হলেন পরম বোধ (idea)। তিনি বিশ্বের অংশ নন। তিনি হলেন আদর্শ কায়া (ফর্ম), বিশ্ব তাঁর ছায়া (স্যাডো)। তাঁকে পাবার উপায় অনেকটা যাজ্ঞবল্ক্যের মত নেতিবাদী—docta ignorantia. ক্যুজেনাস অ্যারিস্টটলের সীমাবদ্ধ, এককেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা এবং বস্তুর মধ্যে উচ্চতর ও নিম্নতরের বিভেদ—মেনে নিতে রাজি নন। ঈশ্বর, তাঁর মতে, এই বিশ্বের কেন্দ্র ও পরিধি, প্রতি অপূর্ণ বস্তুর মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনাস্বরূপ। গণিত হল এই রহস্যের প্রতীকী ভাষা। তা ছাড়া পৃথিবী নিশ্চলও নয়। ক্যুজেনাসের অনেক ইঙ্গিত লেওনার্দো, কেপলার ও গ্যালিলেওর মধ্যে বিকশিত। তাঁর ধারণা ছিল—স্রষ্টা ও সংসারকে বাদ দিয়ে মুক্তি আসবে না, সংসারকে তুলে ধরতে অবে অসীম ও অনন্তের স্তরে। প্রত্যেক ধর্ম ঈশ্বরের যতটা কাছে, ততটাই দূরে, কোন ধর্মই অনন্য বা শেষ সত্য নয়। এর পরিণাম—পরমত সহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা নয়।

ফ্লোরেন্সের ফিচিনো অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তার মেলবন্ধন করতে গিয়ে অনেক অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের শিকার হয়েছেন। তাছাড়া তিনি ক্যুজেনাসের চেয়ে ঢের বেশি অসাংসারিক, মরমীয়া। যুক্তিকে তিনি ছাড়তে চান না আবার আত্মাকে উর্দ্ধে ওঠার উপায় মনে করেন, ভালোবাসার আবেগের যথেষ্ট মূল্য দেন। শিল্পী যেমন তার মডেল ও মিডিয়ার ওপরে উঠেই স্রষ্টা, তেমনি মানুষ। তবে তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ, ঈশ্বরের স্বাধীনতার মত সীমাহীন নয়। "We seek the highest summits of mount Olympus. We inhabit the lowest valley." তাঁর সঙ্গী, পিকো দেলা মিরান্দোলা, আবার প্লেটো-অ্যারিস্টটলের সমন্বয় করতে চেয়েই ক্ষান্ত হননি, তার সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মমত, ইহুদির কাবালা, আরব দর্শন সবই মেলাতে চেয়েছেন—অর্থাৎ হতে চেয়েছেন নতুন যুগের অ্যাকুইনাস। পিকো সব রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি শুধু পরমত সহিষ্ণুতার নিদর্শন নয়, সর্বজনীন সত্যের নিদর্শন। দুঃখের বিষয়, সেকালে জনপ্রিয় জ্যোতিষবিদ্যাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে তিনি সাহায্য করতে পারেননি। তাঁর Oration on the Dignity of Man-এর মত মানবমাহাত্ম্যকীর্তন আজও বিরল। (অথচ আত্যন্তিক কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যার মোহে তিনি সাভোনারোলার

খপ্পরে পড়েছিলেন।) আজও কানে বাজে পিকোর উদ্দাত্ত মানববন্দনা—

"We have made thee neither of heaven nor of earth, neither mortal nor immortal, so that with freedom of choice and with honour, as though the maker and moulder of thyself, thou mayest fashion thyself in whatever shape thou shalt prefer. Thou shalt have the power to degenerate into the lower forms of life, which are brutish. Thou shalt have the power, out of thy soul's judgement, to be reborn into the higher forms, which are divine." এর চেয়েও বেশি দম্ভ করেছিলেন আলবের্তি—"Men can do all things if they will."

কিন্তু পূর্ণ মানব পরিকল্পনার পক্ষে সব চেয়ে বড়ো বাধা ছিল মানবমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে হিউম্যানিস্টদের অজ্ঞতা, সমাজের গঠন ও গতি মানবকে কি ভাবে গড়ে সে বিষয়ে অনীহা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ঔৎসুক্যহীনতা। দেহের উপর আত্মাকে স্থান দিয়ে কিছু হিউম্যানিস্ট সন্ন্যাসকে গুরুত্ব দেন। এর মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি কাজ করতেও পারে। হান্স ব্যারন যে civic humanism-এর কথা বলছেন, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ। গেরিন বলছেন, ফ্লোরেন্সের সাধারণতন্ত্রের রক্ষায় ও সেবায় সালুতাতি, ব্রুনি, মাকিয়াভেল্লির দান অপরিসীম। কিন্তু ফিচিনো ও পিকোর দল প্রচলিত সমাজব্যবস্থা মেনে নেন। ধনী ও ধনের উপাসক ছিলেন তাঁরা, বণিক অলিগার্কির মুখপাত্র। আমার মতে, মাকিয়াভেল্লিও একেবারে নিরপরাধ ছিলেন না। তাঁর মেদেচি শাসনের বিরোধিতার সঙ্গে সিজার বর্জিয়ায় অবিবেকী, নিষ্ঠুর রাজনীতি-সমর্থন মেলাব কি করে? হিউম্যানিস্টদের চোখে পূর্ণ মানব ও ভাগ্যবান মানুষ সমার্থক।

এই প্রসঙ্গে হিউম্যানিস্টদের বিশ্ববীক্ষার প্রতিবাদী, আগামী এবং আধুনিক যুগের অগ্রদূত—লেওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম উঠবে। হিউম্যানিস্টরা চেয়েছিলেন—'recovery of the past', লেওনার্দো চেয়েছিলেন সত্যের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার। গ্রিক/রোমক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অনুকরণকে সৌন্দর্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপায় বলে তিনি মনে করতেন না। কারণ, "he who has access to the fountain does not go to the water pot." সামনে, পেছনে, চারদিকে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার ; তার মধ্যে রয়েছে কত রকমের, প্রকৃতির (আকৃতির ত' বটেই) জীব। তাহলে অতীন্দ্রিয় নিয়ে মাথা ঘামানই বা কেন? অ্যারিস্টটলের শেকলে বাঁধা মন নিয়েও তিনি পৃথিবীকে দেখেননি। আশ্চর্য ছিল তাঁর চোখ, ব্রোনোউস্কি তাকে রঞ্জনরশ্মির সঙ্গে তুলনা করেছেন।[২০] সে চোখ ক্যামেরার মত দ্রুত, তীব্র, অবিকল, তা উড্ডীন পাখির পাখার পেশীগতিও ধরতে পারে। পাখির আত্মা আছে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, তার গতির dynamics নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। ইচ্ছা ছিল এমন যন্ত্র বানাবার যার সাহায্যে মানুষ উড়তেও পারবে। প্রাচীন যুগের ডিডেলাস যেন আবার ফিরে এসেছিল। তাঁর বিখ্যাত Notebooks-এ পাঁচ হাজারের মত যন্ত্র, পশু ও মানুষের অ্যানাটমি এবং ফুলের রেখাচিত্র পাওয়া গেছে। যেমন আগ্রহ নিয়ে জন দ্য ব্যাপটিস্ট সহ মাতা মেরী ও যীশুর আদরা তিনি এঁকেছেন, তেমনি কাপড়ের ভাঁজ, হাতের মুদ্রা, ঘোড়ার নানা ভঙ্গির আদরা। সন্ত বার্থোলোমিউ আছেন, আবার জুডাস। সত্যই ত' বৈজ্ঞানিকের চোখে দুজনেই মানুষের profile. ব্রোনোউস্কির মন্তব্য শুনুন—"His passion for the exact turned him toward mathematics; his passion for the actual urged him to experiment."

আরোতিনো ছাড়া এ যুগের কারুর সৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের নির্লজ্জ প্রশস্তি শুনি না। আরেতিনো যেন নীতির বাইরে, সমাজের বাইরে, শুধু নিজের শিল্পের কাছে দায়ী। লেওনার্দো মিলানের ডিউকের কাছে নিজেকে চিত্রকর না বলে এঞ্জিনিয়ার রূপে জাহির করেছিলেন। মিলানে ক্যানাল তৈরির কৌশল, উন্নত কামান, বাষ্পীয় এঞ্জিন—অনেক কিছুই তাঁর কৃতী। কিন্তু তিনি যখন মাতা মেরী, যীশু ও অ্যানের ছবি আঁকেন, কেন দেখতে পাই তার চারদিকে কুহেলিকার মত এক আবরণ—sfumata? 'লা জ্যাকন্দা' বা মোনালিসার হাসি কি শুধু দৈহিক, না তার পেছনে লুকিয়ে আছে আত্মার কোন অজানা রহস্যের ইশারা? মিকেলাঞ্জেলো ত পুরো নিও-প্লেটোনিক আদর্শ মেনে নেন। কিন্তু লেওনার্দোর এই প্লেটোনিক উক্তিও স্মর্তব্য—"let no man who is not a mathematician read the elements of my work." 'শেষ ভোজ'-এর পরিকল্পনায় কাজ করেছে তাঁর আশ্চর্য জ্যামিতিক জ্ঞান।

দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখলে র‍্যনেশাঁসের অন্তর্লীন বৈপরীত্য ফুটিয়ে তোলা যাবে। প্রথমটা লোরেঞ্জোর রচনা—ধাবমান কালের প্রেক্ষাপটে যৌবনের অনিত্য রসোল্লাস—

How passing fair is youth,
Forever fleeting away;
Who happy would be, let him be;
Of to-morrow who can say?

দ্বিতীয়টা মিকেলাঞ্জেলোর শেষবয়সের রচনা—বিষণ্ণ, গম্ভীর, ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ—

Dear my Lord, I call and invoke
You alone against my fruitless
blind torment: You alone can renew for
me, without and writhin, my desires
and judgement and my little tardy worth.

পলিজিয়ানোর বাকাস-উপাসনা শেষ হয়েছিল ঈশ্বরের উপাসনায়।

৬

র‍্যনেশাঁসের শ্রেষ্ঠ অবদান তার শিল্প—স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, এমনকি বেনেভেনুতো চেল্লিনির সোনা রূপোর কাজও। সাধারণত মনে করা হয় জত্তো ও মিকেলাঞ্জেলোর মধ্যবর্তীকালে (১৩৫০-১৫৫০) ইতালীয় শিল্পের পুনর্জন্ম হয়েছিল। সমসাময়িকদের চোখে এটা প্রত্যাবর্তন—ক্লাসিক আদর্শে প্রত্যাবর্তন, প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন। বুর্খহার্ট তাঁর revival of antiquity ও discovery of the world শব্দ নিচয় দ্বারা এই দুরকম প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু আরও কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য—(১) শিল্পীর বহুমুখী দক্ষতা (virtuosity), (২) ধনী পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে কারুশিল্পীর মর্যাদাহীন সামাজিক অবস্থান থেকে চারুশিল্পীর সুবিধা ও সম্মানভোগী অবস্থানে উত্তরণ। একটা মিথ অন্তত ভাঙা দরকার। বুর্খহার্ট র‍্যনেশাঁস শিল্পীকে 'secular' বা ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা দিয়েছেন। এটা সত্য নয়। এত মাদোনা, পিয়েতা, ক্রুশারোহণ, সন্ত প্রতিমূর্তি তার বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে। দ্বিতীয় মিথ—তা ক্লাসিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুকরণ।

ক্লাসিক চিত্রের কথা কেউ তোলেন না, কারণ তার নিদর্শন র‍্যানেশাঁস দেখেনি। কিন্তু আসলে এ যুগের মুখ্য স্থপতি, ব্রুনেলস্কি, ভিট্রুভিয়াসের নিয়মকানুন অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি। নিকোলাস পেভ্‌সনার তার পিছনে তাসকানির রোমানেস্ক (Proto-Reanissance) ঐতিহ্য লক্ষ্য করেছেন।[২২] ভাস্কররা ত' আসল গ্রিক মূর্তি দেখতেই পাননি, দেখেছিলেন তার রোমান নকল। ১৫০৬ সালে মিকেলাঞ্জেলো প্রথম 'লাওকুন' দেখেন। বরং গথিক ভাস্কর্যের বাস্তবতা তাঁদের কিছু প্রেরণা দিয়েছিল। সার্ত্র কিংবা রঁ্যাশের ক্যাথিড্রালে যে সব সন্তমূর্তি দেখা যায় তাতে শারীরসংস্থান জ্ঞানের অভাব যথেষ্ট কিন্তু মুখের ভাব খুবই বাস্তব, তার মধ্যে বাইজেন্টিয় জড়ত্ব নেই। র‍্যানেশাঁস তাহলে কি করল? স্তম্ভের কুলুঙ্গি (niche) বা দরজার ফ্রেমের কারাগার থেকে মূর্তিকে স্বাধীন করে দিল। দোনাতেল্লোর 'ডেভিড' খোলা আকাশের তলায় স্বমহিমায় বিরাজমান। কেবল সামনে থেকে একমাত্রায় তাকে দেখা যায় না, যে কোন দিক থেকে দেখলে তার লিরিকসুলভ অঙ্গসৌষ্ঠব চোখে পড়বে।[২৩] সমসাময়িক ভাসারি তাঁর 'সেন্ট জর্জ'কে প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হননি, 'ডেভিড' সম্পর্কে লিখছেন : "This figure is so natural that it is impossible for craftsmen to believe that it was not moulded on the living form." ভেরক্কিয়োর 'ডেভিড'—বালক, মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড'—দৃপ্ত যুবক। শেষোক্তের ধারণা নিও-প্লেটোনিক ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। তিনি নিজে লিখছেন, "The best artist has not one idea that a piece of marble, still unworked, does not contain within itself; and that potential form is realized only by the hand that obeys the judgement."[২৪] মার্বেলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মূর্তির আদরা, যেমন ঈশ্বরের idea-র মধ্যে সব form-এর আদল। তবে এখানেই শেষ নয়। স্বীকার করা দরকার লেওনার্দো ছাড়া মানুষের শারীরসংস্থানের ওপর এত জোর আর কেউ দেননি। ফর্মের সঙ্গে তাঁর টাইটানিক সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ফল—পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের কবরের জন্য তৈরি মূর্তিগুলি।

চিত্রশিল্পে র‍্যানেশাঁস ক্ল্যাসিক যুগকে বহু পেছনে ফেলেছে। এখানে perspective-এর আবিষ্কার খুলে দিয়েছে নতুন দিগন্ত। ব্রুনেলস্কি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মানেত্তি perspective-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন—"it is part of that science, which is in effect to put down well and with reason the diminutions and enlargements which appear to the eyes of men from things far away or close by hand: buildings, plains, and mountains and countrysides...."[২৫] লেওনার্দো আবার এনেছেন aerial perspective-এর ধারণা ('ভার্জিন অব দ্য রকস্')।

ফর্ম ও বাস্তবতা জত্তোর ছবিতে আগেই এসে গিয়েছিল। পাদুয়ার এরিনা চ্যাপেল কিংবা ফ্লোরেন্সের সান্তা ক্রোসে বার্দি, পেরুজ্জিদের চ্যাপেলে সন্ত জন প্রভৃতির যেসব ছবি তিনি আঁকলেন তাতে শারীরসংস্থান বিদ্যা বা প্রেক্ষিতজ্ঞানের পরিচয় নেই, কিন্তু তাদের ছন্দোময় কম্পোজিশন, শান্ত মহিমা, গভীর সংযম, মাঝে মাঝে আশ্চর্য বাস্তবতা—বাইজেন্টিয় জড়ত্বকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছিল। বেরেনসন জত্তোর চিত্রে পেয়েছেন স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাছে এমন আবেদন যা বস্তুর চেয়েও বাস্তব।[২৬] মাসাচ্চো এর সঙ্গে যোগ করলেন পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান। মাসাচ্চোর পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান ও প্রতিকৃতি অংকনের বাস্তবতা বিস্ময়কর। ব্রানকাচ্চি চ্যাপেলে সন্ত পিটারের ফ্রেস্কো এ দিক দিয়ে পথপ্রদর্শক। প্রত্যেকটি 'অ্যাপসল' (apostle) মুখচোখের আদলে, বেশভূষায়, দাঁড়ানোর

ভঙ্গিতে বিশিষ্ট। দূরে দেখা যায় প্রাসাদ। আরো দূরে গিরিমালা। আলোছায়ার সুপরিকল্পিত বিন্যাসে প্রত্যেক ছবি একটা বেধ পেয়েছে। এ সব ছবি দেখতে এসেছেন সে যুগের সব শ্রেষ্ঠ শিল্পী। লেওনার্দো মন্তব্য করেছেন, "Masaccio showed by perfect works that those who are led by any guide except nature, the supreme mistress, are consumed in sterile toil." এমন বেধ আনতে পেরেছিলেন পলাইওলো তাঁর 'Martyrdom of St.Sebastian-এ তীরন্দাজদের পেশীসংস্থানে যা মিকেলাঞ্জেলোর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

ফ্রা এঞ্জেলিকোর 'Anunciation' বা 'Coronation of Madonna' নারীর ললিত লাবণ্যের চেয়েও অধরা মাধুরী খুঁজেছে। ভক্তির কোমলতা, ভাবের বিশুদ্ধতা যেন মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের শেষ অস্তরাগ। ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পির শৈলী কিন্তু ভিন্ন। যে সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে তিনি পালিয়েছিলেন তিনিই তাঁর মেরীর মডেল। অতএব অধরা মাধুরীর স্থানে এসেছে নয়নলোভন দেহদ্যুতি। বত্তিচেল্লি তাকে চরমে নিয়ে গেলেন। আজ বলা শক্ত কোন ছবির জন্য তাঁকে মনে রাখব—লোরেঞ্জোর বাবার জন্য আঁকা 'মাদোনা দ্য ম্যাগনিফিকাট' ও 'অ্যাডোরেশন', না 'ভিনাসের জন্ম' (১৪৮০) ও 'প্রাইমাভেরা' (বসন্ত)?

'ভিনাসের জন্ম'-এ ভিনাসের উড়ন্ত সোনালি চুলে এখনও লেগে আছে সমুদ্রের নোনা স্বাদ, লীলায়িত আঙুল যেন ইচ্ছে করেই স্তন ঢাকছে না, কটি থেকে জঙ্ঘার সৌন্দর্য কাম উদ্দীপন করেও করে না। এমন সুকুমার, ঈষৎ দীর্ঘায়িত মুখ, নিষ্পাপ দৃষ্টি, সুডৌল গ্রীবা সেই সৃষ্টিশীল যুগেও অতুলনীয়। আর 'প্রাইমাভেরা'র grace-দের বহুভঙ্গ নৃত্যপর মূর্তি, সুদীর্ঘ নিম্নাঙ্গ, মসলিনের চেয়ে স্বচ্ছ পোষাকের লাবণ্যতরঙ্গ—কে ভুলতে পারে? রেখাগুলি স্পষ্ট, মোটিফগুলি সতেজ, সজীব। আত্মা যেন সৌন্দর্যের পায়ে স্তবনত। রবীন্দ্রনাথের 'অচ্ছোদ সরসী তীরে রমণী যেদিন' কি বত্তিচেল্লি দেখে লেখা?

ষোড়শ শতকের প্রথমে চিত্রশিল্প নতুন মোড়া নিল। বারংবার আমরা শুনব তিনটি নাম—দা ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল। লেওনার্দোর 'ভার্জিন অব দ্য রক্‌স' এবং 'মেরী, যীশু ও সন্ত অ্যানে'র অপূর্ব ড্রইং, পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদির কথা আগেই বলেছি। যন্ত্র, শারীরসংস্থান ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদাহরণ মিলবে Notebooks-এ। জ্যামিতিক অঙ্কনের পরাকাষ্ঠা কিন্তু 'শেষ ভোজ'। গিরলানদাইও'র 'শেষ ভোজ', উলফ্‌লিনের ভাষায়, "an assemblage without a center." লেওনার্দোর ছবির নাটকীয় সংহতি আশ্চর্য। তিনজন করে শিষ্যের চারটি দল পিরামিডের আকার নিয়েছে, যার শীর্ষবিন্দুতে যীশু স্বয়ং। চিত্রকরের সমস্যা কম ছিল না। সব পাত্রই পুরুষ, খাবার টেবিল ছাড়া কোন আসবাব নেই, নেই পরিপ্রেক্ষিত (ক্ষীণভাবে যীশুর পেছনের জানালা দিয়ে কিছু দেখা যায়) বা গতির সম্ভাবনা। শুধু একটা অত্যন্ত উদ্বেগভরা, আত্মজিজ্ঞাসাভরা মুহূর্ত আর বারোজন শিষ্যের প্রত্যেকের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া। যীশুর মুখ তিনি শেষ করতে পারেননি—কোথায় পাবেন জেথ্‌সিমানি উদ্যানে ঈশ্বরপুত্রের নিদারুণ ব্যাকুলতা, বীর্যবান ইচ্ছা, প্রশান্ত আত্মসমর্পণ? এতো মায়ের কোলে ক্রীড়াচঞ্চল শিশু নয়, ঈশ্বরের কোলে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত, অথচ মানুষের জন্য করুণায় বিষণ্ণ—ঈশ্বরপুত্র। 'মোনালিসা'র কথা সবাই জানেন, কিন্তু সিমোনেত্তার আদলে (?) তিনি যে 'মাদালেন্না'র মুখ এঁকেছেন তা আরও অপূর্ব।

সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদে ও পূজাবেদীতে মিকেলাঞ্জেলোর নিও-প্লেটোনিক দৃষ্টিভঙ্গি

রূপায়িত। কেন এত নগ্নমূর্তি এঁকেছেন তিনি (বিশেষত পুরুষের)? সেকি দেখাবার জন্য যে বাস্তবতা বাইরের আবরণে নেই, সত্য অনাবৃত? দেহের সৌন্দর্য অনিত্য, আত্মার সৌন্দর্য অখণ্ড। কবি স্পেন্সারের ভাষায়—"Soule is form, and doth the bodie make." কিন্তু আত্মা দেহজ কামনা-বাসনার কারাগারে বন্দী। তার স্বরূপ—সৌন্দর্য—মুক্তিলাভের চেষ্টায় অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর। মিকেলাঞ্জেলোর বহুমূর্তি, বিশেষত পোপ জুলিয়াসের কবরের দাসরা, কেমন যেন tortured মনে হয়। সিসটাইন চ্যাপেলে প্রবেশ করলে ঠিক মাথার ওপরে দেখা যাবে পানোন্মত্ত নোয়াকে। সেখান থেকে শেষ বিচারের দৃশ্য পর্যন্ত শিল্পী (আলবের্তির মত বা পিকোর মত) মানবমাহাত্ম্য কীর্তন করেননি। তিনি ফুটিয়েছেন তার আত্মিক দ্বন্দ্ব, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং সীমাবদ্ধতার যন্ত্রণা। 'শেষ বিচার'-এর যীশু নিউ টেস্টামেন্টের প্রেমময়, করুণাঘন, মানবত্রাতা নন। রুদ্র তিনি, ভয়ঙ্কর তিনি, ক্ষমা নেই তাঁর কঠিন বিচারে। তাঁর পেশী বড় বেশি প্রকট, দেহের গঠন বড় বেশি ভারি। র‍্যানেশাঁস এখানে বারোকের দিকে ঝুঁকেছে। তুলনায় ঈশ্বর যখন আলোক সৃষ্টি করছেন কিংবা আঙুল ছুঁইয়ে অচেতন আদমের প্রাণ সঞ্চার করছেন, কি জীবন্ত হয়ে তা ফুটে উঠেছে। আসলে মিকেলাঞ্জেলোর ওপর ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রভাব যেন বেশি। না হলে ছাদে এত প্রোফেট, এত সিবিল (sybil) আঁকা হল কেন? যীশুর মধ্যে সেই terribilita দেখি, যা মিকেলাঞ্জেলোর মধ্যে ছিল, ছিল তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক পোপ জুলিয়াসের মধ্যেও। মোজেসের মূর্তিতে দেখি এই terribilita. কাত্রেচেন্তো (Quattrecento) বা পঞ্চদশ শতকের কমনীয়তা (যার প্রতীক বত্তিচেল্লি, রাফায়েল) থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন যেন এক গভীর পাপবোধে। যুদ্ধ বিদীর্ণ ইতালী, ক্ষতবিক্ষত ফ্লোরেন্স, রক্তস্নাত র‍্যানেশাঁস। মিকেলাঞ্জেলোর কবিতায়ও রাত্রির ক্লান্তি নেমে এসেছে—

Dear is my sleep, but more to be mere stone
So long as ruin and dishonour reign.
To see naught, to feel naught, is my great gain.
Then wake me not; speak in an undertone.

মিকেলাঞ্জেলো যখন পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের কবরের জন্য মূর্তি খোদাই ও সিসটাইন চ্যাপেলের জন্য ছবি আঁকার কাজ করছেন, রাফায়েল হাত দিলেন পোপের স্ট্যাঞ্জা দেল্লা সেগ্‌নাতুরার দেয়ালে ফ্রেস্কো আঁকায়। পিত্তি গ্যালারীতে রয়েছে তাঁর ১৫০৬ সালে আঁকা আপন প্রতিকৃতি—মুখ মেয়েলি ছাঁদের, চোখ কবির—নরম, স্বপ্নাতুর। পেরুজিনোর শিষ্য (রাফায়েল) গুরুর কাছে কুমারী মেরির মুখ আঁকার যে রহস্য শিখেছিলেন তা কোনোদিন ভোলেননি। সিয়েনায় তিন গ্রেসের ক্লাসিকাল মূর্তি দেখে তিনি নগ্ন নারী সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সারা জীবন তাঁর মধ্যে পাশাপাশি সহবাস করত খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস আর পেগান সৌন্দর্যে আনন্দ। তাই বলে heroic বিষয় নিয়ে আঁকেননি তা নয়। যেমন লুভর্ এর 'সন্ত মাইকেল' ও 'সন্ত জর্জ'। কিন্তু ফ্লোরেন্সে থাকার সময় (১৫০৪-৬) পিত্তি প্রাসাদের ও উফিজ্জি গ্যালারীর জন্য যে মাদোনা আঁকেন, তাতে বোঝা যায় তাঁর প্রবণতা কোনদিকে। এটা চরমে পৌঁছল 'কলোনা মাদোনা'য় (যা মেট্রোপলিটান ম্যুজিয়ামের গর্ব)। এই সময় ডাক পড়ল রোমে—পোপের স্ট্যাঞ্জার দেওয়ালে ফ্রেস্কো আঁকার জন্য। কি আছে এতে? আছে ধর্ম ও দর্শন, ক্লাসিক ও খৃষ্টধর্ম, চার্চ ও রাষ্ট্র, সাহিত্য ও আইন মেলাবার প্রয়াস। ধর্মের প্রতীক—ট্রিনিটি ও সন্তরা, দর্শনের প্রতীক—চার্চ ডক্‌টর ও

ফাদাররা। সবার ওপরে ঈশ্বর, যার এক হাতে গোলক, অন্য হাতে আশীর্বাদ ; নীচে কোমর পর্যন্ত নগ্ন যীশু, ডাইনে শ্রদ্ধানম্র মেরী, বাঁয়ে জন দ্য ব্যাপটিস্ট, নীচে হোলি গোস্টের প্রতীক-ঘুঘু। যীশুকে ঘিরে মেঘের ওপর অ্যাডাম থেকে সন্ত লরেন্স। কোথাও সন্ত জেরোম (লাতিন বাইবেলসহ), কোথাও সন্ত অগুস্তিন (City of God পড়ছেন)। আছেন একুইনাস, ডানস্ স্কোটাসের মত স্কলাস্টিক, আবার দান্তে, এমনকি স্থপতি ব্রামান্তে। এ যেন মিকেলাঞ্জেলোর সিসটাইন চ্যাপেলকে এক এপিক চ্যালেঞ্জ ! ধর্মতত্ত্ব বনাম দর্শনের সংঘাতে দর্শন রূপ পেল 'দ্য স্কুল অব অ্যাথেন্স' ও 'ডিসপ্যুটা'তে। প্লেটো, সোক্রাতেস, কে নেই ? মিউজের জন্যও স্থান রয়েছে অন্য দেওয়ালে। সেখানে শোভা পাচ্ছেন হোমার থেকে আরিওস্তো।

১৫০৮-১৩ আবার তিনি ফিরে গেছেন মাদোনায়। এবারকার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—'মাদোনা দেল্লা পেস্চে' (প্রাদো)। 'গ্যালাসিয়ার বিজয়'-এ পেগান নারী আঁকার পরই এল বিখ্যাত 'সিসটাইন মাদোনা' (১৫১৫) ও 'সন্ত সেসিলিয়া'। ফর্মই ছিল তাঁর উপাস্য, কিন্তু তার মধ্যে নেই মিকেলাঞ্জেলোর তীব্র আবেগ, গভীর মরমী বিশ্বাস, নানা শিল্পে দক্ষতা। আত্মিক যন্ত্রণা নেই, নেই ট্রাজেডির ছাপ। অথচ শেষ বয়সেও মেদেচি কবরের জন্য 'ঊষা ও প্রদোষ', 'দিবস ও রাত্রি' নামে দুটি যুগ্মক এবং তাদের ঠিক ওপরে চিন্তাশীল (লোরেঞ্জো) ও কর্মবীর (গিউলিয়ানো)—মানুষের দুই টাইপ—গড়তে গিয়ে মিকেলাঞ্জেলো দেখিয়েছেন র‍্যনেশাঁস কেবল ক্লাসিক সুষমা ও সৌন্দর্যকেই আদর্শ করেনি। তাতে যেন অস্তিত্ববাদী angst-এর পূর্বাভাস।

ফ্লোরেন্সের পর মিলান, মিলানের পর রোম, রোমের পর ভেনিস—এই ছিল র‍্যনেশাঁস প্রতিভার উদয়াস্তের পথ। ভেনিসের সূর্যাস্ত কি রঙিন ! কিন্তু তিৎসিয়ানোর 'লা ফ্লোরা'কে বত্তিচেল্লির 'প্রাইমাভেরা'র সঙ্গে তুলনা করুন, কিংবা জ্যর্জনের 'নিদ্রিতা ভিনাস'-এর সঙ্গে। বেশভূষায় প্রাচ্য ব্রোকেড, রেশমের, ইন্দ্রধনুচ্ছটায় তিৎশিয়ানো জ্বলজ্বল করছেন কিন্তু তিনি ধরতে পারেননি বত্তিচেল্লির অধরা মাধুরী, এমনকি জ্যর্জনের পার্থিব ইন্দ্রিয়জ আবেদন। তিনতোরেত্তোর 'স্নানরতা সুসানা' ত' রীতিমত চর্বির স্তূপ। ভেরনিজের Vision of St. Ellena-তে Vision-এর অতীন্দ্রিয়তা অনুপস্থিত। অবশ্যই কিছু অনবদ্য প্রতিকৃতি এঁকেছেন ভেনিশীয় শিল্পীরা—যেমন তিৎসিয়ানো—'অশ্বারোহী পঞ্চম চার্লস', তিনতোরেত্তো—'সোরাঞ্জো'। কিন্তু এখানেও রাফায়েলের প্রার্থনারত দ্বিতীয় জুলিয়াসের প্রতিকৃতি ঢের বড় শিল্পকর্ম। সাহিত্যের দিক থেকে দেখলে পেত্রার্কায় যা ছিল মহান প্রতিশ্রুতি, আরেতিনোতে তা দেউলে, ক্লীবরতি।

ক্লাসিকস্ দিয়েছিল শারীরসংস্থানের সুসমঞ্জস বিন্যাসের ধারণা, র‍্যনেশাঁস তা পূর্ণ করেছিল প্রকৃতিকে গভীর নিরীক্ষণের সাহায্যে। স্থাপত্যের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের আয়তনগত সম্পর্ক ঠিক করত গাণিতিক অনুপাত। ভাস্কর্যের সাধারণ নিয়ম ছিল—বিভিন্ন অঙ্গ বিস্তৃত করলে তা যেন এক বৃত্তের পরিধি স্পর্শ করে। বৃত্ত ছিল জ্যামিতির সব চেয়ে বিশুদ্ধ রূপ। তাই ভাস্করদের প্রিয়। কিন্তু লেওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলো (রাফায়েল ?) এখানেই থেমে থাকেননি, দেহের পর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তার সত্যিকারে সংস্থানরহস্য বুঝে নিয়েছিলেন। গাছপালা, পশুপাখি, কিছুই তাঁদের

ক্যামেরা-তীক্ষ্ণ চোখ এড়ায়নি। পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা space সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই বদলে দেয়। একথা ঠিক। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী হয়েও idea-কে ছোট করেননি তাঁরা।[২৭] তদুপরি আজকালকার কলাসমালোচকরা তাঁদের অব্যবহিত ঐতিহ্যকে গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা বলে মনে করছেন। যেমন টাসকানির মধ্যযুগ ও তার অব্যবহিত পরের শৈলীর ছাপ থেকে গেছে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের ওপর।[২৮]

এরপরও থেকে যায় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ। মেদেচিদের, স্ফর্জাদের, পোপদের পৃষ্ঠপোষকতার অবদান যথেষ্ট। ইতালীর নগর রাষ্ট্র ছিল সৃষ্টির প্রাণভ্রমর। তার পতন, পৃষ্ঠপোষকদের আর্থিক ক্ষতি হাই র‍্যনেশাঁসকে যথেষ্ট দুর্বল করে। সাধারণতন্ত্র লুপ্ত হলেও কোন কোন স্বৈরতন্ত্রী শিল্পীদের আশ্রয় দিয়েছে। যতদিন প্রিন্সদের দরবার বেশি ফর্মাল হয়ে যায়নি, ফ্লোরেন্সের লোরেঞ্জো, মান্টুয়ার লোদোভিকো গনজাগা এবং ইসবেলা দ্য এস্ট, ফেরারা ও উরবিনোর ডিউক নগররাষ্ট্রের স্বাধীনচিন্তার সঙ্গে নয়াশাসকদের বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব (অবশ্যই হিউম্যানিস্ট) সুন্দরভাবে মিশিয়েছিলেন। কিন্তু সাভোনারোলার ধর্মীয় গণ-আন্দোলন, সিজার বর্জিয়া থেকে লুথার পর্যন্ত নানা দিক থেকে ক্যাথলিক চার্চের ওপর আক্রমণ, মাকিয়াভেল্লির অভিনব রাজনৈতিক মূল্যবোধ—র‍্যনেশাঁসের যুক্তি ও আবেগগত আবহাওয়া বদলে দিল। ১৫২৭ সালে ব্রামান্তে ও রাফায়েল গত হলেন। ঐ সালেই সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বাহিনী রোম লুণ্ঠন করল। লেওনার্দো প্রথম ফ্রান্সিসের সঙ্গে চলে গেলেন ফ্রান্সে। মিলান হল স্পেনের অধীন মিত্র। ফ্লোরেন্সের সাধারণতন্ত্র শেষবারের মত জ্বলে উঠে নিবে গেল। এই পরিবর্তিত পরিবেশে শিল্পীরা আর রইল না স্বাধীন নাগরিক বা শ্রদ্ধাস্পদ সভাসদ। তারা হল প্রজা—প্রিন্স ও ধনী ব্যক্তিদের খেয়ালের ওপর একান্ত নির্ভর। মিকেলাঞ্জেলো দুর্দান্ত জুলিয়াসদের মুখোমুখি করার সাহস রাখতেন, নিজের কোট থেকে নড়তেন না। মেদেচিরা তঁর চিরকালের পৃষ্ঠপোষক, তবু তিনি দশম লিওর তোষামুদি করতেন না। এখন আর সে অবস্থা রইল না। এখানে যদি না পোষায় অন্যত্র চলে যাও, ফ্লোরেন্স থেকে মিলান, সেখান থেকে মান্টুয়া বা রোম—সে পথ আর খোলা নেই।

ক্ল্যাসিকাল শৈলীর প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল 'ম্যানারিজম', আর 'বারোক'। মিকেলাঞ্জেলোর 'শেষ বিচার'-এর নগ্নচিত্রকে পরানো হল পোষাক। তাত্ত্বিক কারণে তাঁকে বদলাতে হল সেন্ট পিটারের নক্শা। যাঁরা 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নামে স্তালিন আমলের নানা শিল্পবিকৃতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের এই আবহাওয়া বুঝতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু শেষ হয়েও শেষ হল না র‍্যনেশাঁস। মানুষ যতদিন তার আপন মাহাত্ম্যে আস্থা রাখবে, আপন স্বর্গীয় অভীপ্সায় অবিচল থাকবে, ততদিন তাকে প্রেরণা জোগাবে ইতালীর ত্রেচেন্তো থেকে স্যাঁকচেন্তো—চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী। অন্তত কিছু দিনের জন্য আদিম পাপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, পুরগেটরি ও ইনফার্নোর কথা ভুলে, মৃত্যু দ্বারা অভিভূত না হয়ে, ইতালী পরিপূর্ণ জীবনের জয়গান গেয়েছিল। দৈহিক সৌন্দর্যের অন্তরালের আত্মিক সৌন্দর্যের স্তবগান করেছিল, সত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্গে আনন্দকে মেলাতে পেরেছিল। রোম্যাঁ রঁলা তাঁর The Life of Michelangelo-র মুখবন্ধে তাই লিখেছিলেন,

'See men and life as they are,—and as they are, love them and act. That is my role. And it is also to discover and make known to others all the sources of strength, all the hearths of light, which exist in the world. The heroes and the saints. I say: 'Take, and drink'.[২৯]

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির আদর্শ সন্ধানে
(ঐতিহ্য ও আধুনিকতা)

ইতিহাসের অনাদ্যন্ত প্রবাহকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করার প্রথাটা পশ্চিম থেকে এসেছে। র‍্যানেশাঁসের আগে এমন ভাগ ইওরোপেও জানা ছিল না। কিন্তু সমসাময়িক যুগের মাহাত্ম্য তুলে ধরার জন্য এবং ক্লাসিক সভ্যতার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের প্রয়াসে র‍্যানেশাঁস এক মধ্যবর্তী, এবং অন্ধকার, যুগ সৃষ্টি করল—medium oevum. অনেকেই আবার র‍্যানেশাঁসকে আধুনিক যুগের উষালগ্ন মনে করল। র‍্যানেশাঁসের সংস্কৃতিতে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সেক্যুলারিজম্ প্রভৃতি নানা গুণ আরোপ করে বুর্খহার্ট তাদের মদৎ যোগালেন (যদিও তিনি র‍্যানেশাঁসকে স্বয়ম্ভূ (sui generis) মনে করতেন)।

আগের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়েছি এসব আরোপিত চারিত্রিক উপাদানে কেউই বিশ্বাস করেন না। বিখ্যাত ওলন্দাজ ঐতিহাসিক হুইজিঙ্গার ভাষায়, "The Renaissance cannot be considered as a pure contrast to medieval culture, not even as a frontier territory between medieval and modern times. Among the basic lines dividing the older and the more modern intellectual culture of the people of the West there are some that run between the Middle Ages and the Renaissance, others between Renaissance and the sixteenth century, still others straight through the heart of the Renaissance, and more than one as easily as through the thirteenth century or as late as through the eighteenth ..." প্রাচীন, মধ্য, র‍্যানেশাঁস, আধুনিক—এমন সরলভাবে ইতিহাসের প্রবাহকে ভাগ করা চলে না।

আজকাল প্রবহমানতাকে পরিবর্তনের মতই জোর দেওয়া হচ্ছে। ঐতিহ্যের মধ্যেই আছে প্রগতির সম্ভাবনা, আধুনিকতার মধ্যে ঐতিহ্যের চিহ্ন। উভয়ের স্রোত পাশাপাশি বয়, কখনও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, কখনও বা একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে যায়। আধুনিকতার সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞাও নেই, যে আমরা একটা বছর বা দশক দেখিয়ে বলতে পারি—এবারে আধুনিক যুগ শুরু হল। বুর্খহার্ট বলবেন—র‍্যানেশাঁস, টনি ও হেবার বলবেন—রেফর্মেশন, বাটারফিল্ড বলবেন—সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। যাঁরা অর্থনৈতিক infrastructure-কে গুরুত্ব দেন তাঁরা বলবেন—ধনতন্ত্রের সঙ্গে, যাঁরা রাজনীতির ওপর জোর দেন—তাঁরা বলবেন 'নয়া রাজতন্ত্রে'র সঙ্গে (ষোড়শ-সপ্তদশ দশকে)। যদি প্রগতির ধারণাকে বড়ো করে ধরা হয়, তবে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে 'আলোকিত যুগ', যদি সামাজিক বিপ্লব গুরুত্ব পায়—তবে ফরাসী বিপ্লব।

হেবার—সর্বক্ষেত্রে rationality বা যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দেবেন। অর্থাৎ tradition বা ঐতিহ্য পেছনে পড়বে। কিন্তু rationality-র উৎস কি? প্রোটেস্টান্ট এথিক বলতে কি বুঝি? টনি বললেন, ক্যালভিনিজমপ্রসূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্ব। তার কোনটার ওপর জোর দিচ্ছেন হেবার, কোনটার ওপর টনি, স্যামুয়েলসন, সুম্পিটাররা। বাণিজ্যিক বিপ্লবের ওপর জোর দিলে ছবিটা হবে একরকম, শিল্পবিপ্লবের ওপর হলে আরেক রকম। 'নয়া রাজতন্ত্র'ও শেষ কথা নয়। তার সংকট চলেছিল সপ্তদশ শতক ধরে। সত্যকার স্বরাট রাষ্ট্র নেপোলিয়নের ফ্রান্স বা বিসমার্কের জার্মেনি বা পামারস্টোনের ইংল্যান্ডের আগে ছিল না। মূল্যবোধ না প্রযুক্তি, শ্রেণীসম্পর্ক না রস্টভের অর্থনৈতিক অগ্রগতি—কোনটাকে আধুনিকতার লক্ষণ বলব? এডওয়ার্ড শিলস্ বলবেন—সৃষ্টিশীলতা। তাহলে কি বর্তমান আমেরিকার চেয়ে প্রাচীন গ্রিস ও ভারতবর্ষ বেশি আধুনিক নয়?

তাছাড়া ঐতিহ্য কিছু অনড় বস্তু নয়। বাইরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ এলে তার মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ জাগে। যদি ঐতিহ্য নতুন অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করতে পারে, তবে সংকট ঘনীভূত হয় না। কিন্তু যদি বৃহত্তর/মহত্তর কোন সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ আসে ঐতিহ্যের পক্ষে আত্মীকরণ কঠিন হবে, অসম্ভবও হতে পারে। গ্রহণক্ষম এলিট এবং প্রসারিত হবার ক্ষমতা থাকলে ঐতিহ্যকেও আধুনিকীকরণের কাজে লাগান যায়। "In the case of any great culture facing challenge, a crisis, a search for an alternative paradigm and a frantic effort to adapt tradition is noticeable." টোকিও কংগ্রেস (১৯৮৩)-এ এই ছিল আমার প্রতিপাদ্য।

বাইরের থেকে আঘাত এলে সমস্যাটা কঠিনতর হয়। যেমন ব্রিটিশ আমলে ভারতের ক্ষেত্রে। এখানে inherited matrix ও imported impulse-এর সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। জাপান সম্বন্ধে অধ্যাপক স্যানসম যা বলেছিলেন, তা অতি সত্য: "The hand that opened the door was as important as the one that produced the knock from outside." টয়নবি বলতেন—Yin এবং Yang উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পশ্চিমী Yang-এর দিকে তাকিয়ে দেখলে হবে না, ভারতীয় (বা জাপানী) Yin কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বিবর্তনে একটা মুখ্য প্রবণতা ছিল ঐতিহ্যের সাহায্যে আধুনিকীকরণ। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমী আধুনিকতার পূর্ণ রূপ বিকাশ লাভ করতে পারে না, এ কথা, অচেতনে হলেও, রামমোহন থেকে সব বড়ো মাপের মনীষী জানতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকেননি। সীমিত শক্তিতে, সীমিত ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান (সম্ভাবনাপূর্ণ অবশ্যই) গুলিকে আধুনিকীকরণের কাজে তাঁরা লাগিয়েছিলেন। ইতালীর ধাঁচের র‍্যনেশাঁস নয়, এটাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

ভারতের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক (অনেকেই যাদের ঐতিহাসিক বনে যান)রা পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক পর্বভাগটা এ দেশে চালু করলেন, এবং অবশ্যই আধুনিক যুগের স্রষ্টা বলে নিজেদের ঘোষণা করলেন। প্রথমদিকের ওরিয়েন্টালিস্টরা, বৈদিক (জোন্স) থেকে পৌরাণিক (উইলসন), যুগটাকে প্রাচীন আখ্যা দিলেন। ম্যাক্সমুলর যখন বৈদিক ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্মদাতা আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমী হেলেনিক-লাতিন আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আত্মীয়তা খুঁজে পেলেন, তখন থেকে প্রাচীন যুগকে 'আর্য', পরে 'হিন্দু', ইত্যাদি অভিধা দেওয়া হতে লাগল। বহু

গোলমাল সৃষ্টি হল এর ফলে। 'আর্য' শব্দ ভাষাবাচক না জাতিবাচক ? আর্য এবং প্রাগার্য ও অনার্য আদিম ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কতটা মিশ্রণ হয়েছিল ? জন-সাংকর্যের ফলে সংস্কৃতি-সাংকর্য কতটা ? এমন কি 'হিন্দু' শব্দটার উৎপত্তি ঠিক কোন সময় থেকে এবং হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিশেষ করে ধর্ম বলতে ঠিক কি বোঝায় ? 'ধর্মের কত রকম অর্থ হতে পারে, নিনিয়ান স্মার্টস তা আলোচনা করেছেন। পশ্চিমে religion বলতে যা বোঝায়, হিন্দুধর্ম বলতে ঠিক তা বোঝায় না বলে রাধাকৃষ্ণণ তাকে "a way of life" বলে অভিহিত করেছেন। যাই হোক, উনিশ শতকের কোন সময় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, আর্য ইতিহাস, হিন্দু ইতিহাস—সব সমার্থক হয়ে গেল।

এসব গোলমাল তথাকথিত মধ্যযুগের বেলায় ওঠেনি। খুব সহজেই ভারতীয় মধ্যযুগকে মুসলিম শাসনের সমার্থক প্রতিপন্ন করা গিয়েছিল। দিল্লীর বাইরের একটা বিরাট অংশ যে অধিকাংশ সময় স্বাধীন ছিল বা মুসলিম অধিকৃত হলেও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিল, মধ্যযুগেও যে মুসলিম বিজয়ী এবং অমুসলিম বিজিতদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সংঘর্ষ-সমন্বয় হয়েছিল—এমন ধারণার ওপর এলিয়ট ও ডাওসন-রা জোর দেননি। তখন আরবী, ফার্সী রাজস্ব বিভাগে কর্মে লিপ্ত অল্প কিছু হিন্দু জানত (কবি ভারতচন্দ্র অবশ্য সংস্কৃত ও ফার্সীতে সমান দক্ষ ছিলেন)। প্রথম প্রথম সাহেবরা বাণিজ্য চালাতে বা দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দোভাষীর সাহায্য নিত। ক্রমে তাদের কাছে নিজেরাও শিখে নিত কাজ চলার মত ফার্সী। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি বন্দোবস্ত কার্যকর করতে আরও ভাল ফার্সী জানার প্রয়োজন হল। মুর্শিদাবাদ ও বাংলা সুবার বাইরের মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে পত্রালাপ করার জন্যও তার প্রয়োজন বাড়ল। হেস্টিংস বিচারব্যবস্থা হাতে নেবার জন্য হিন্দু (Gentoo) ও মুসলিম আইন জানার প্রয়োজনীয়তা বুঝলেন। কর্ণওয়ালিসের সদর দেওয়ানি/ফৌজদারী আদালতের জন্য দরকার হল ফার্সী জানা ভকিল। সাহেব আমলারা মৌলভী ও পণ্ডিতদের সাহায্যে আপন চেষ্টায় ফার্সী ও সংস্কৃত শিখলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দাক্ষিণ্যে সে শিক্ষা আরও সম্প্রসারিত হল। কিন্তু প্রথম থেকে ইসলামিক ইতিহাস পড়া ও লেখার ব্যাপারটা তাঁদেরই একচেটিয়া হয়ে রইল। তাঁরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মধ্যযুগের এমন এক ইতিহাস সংকলন করলেন যাতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাড়ে, বিভেদ থেকে বিদ্বেষ।

আরও গভীরে পশ্চিমের ইসলাম-বিদ্বেষী মনস্তত্ত্ব নিশ্চয়ই কাজ করেছিল। ষষ্ঠ শতক থেকে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার, স্পেনে উম্মাইয়াদ কর্তৃত্ব স্থাপন, শার্লমানের আমলে ফ্রান্সের সীমান্তে খৃষ্টান-মুসলিম সংঘর্ষ, ক্রুসেড, ভিয়েনার সিংহদ্বারে তুর্কী অভিযান প্রতিহত করার স্মৃতি—স্তরে স্তরে পশ্চিমী অবচেতনে সঞ্চিত হয়েছিল। ভারতে এসেও তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে বাংলা, মহীশূর, অযোধ্যা, দিল্লীর মুসলিম নবাব-সম্রাটদের সঙ্গে, ওয়াহাবি বিদ্রোহী ও বাগী মুসলিম সিপাহীর সঙ্গে। তাদের চোখে প্রথম এবং প্রধান বৈরী—মুসলমান। বৈরিতা সাধনের জন্য ইতিহাস বিকৃত কে না করে ? একদিকে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচীন (হিন্দু)যুগকে স্বর্ণযুগের মহিমা দান করল, অন্যদিকে ইংরেজ শাসকরা মধ্য (মুসলিম) যুগকে অন্ধকার, অত্যাচার, ধর্মান্ধতার যুগ বলে প্রচার করল। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়—সবাই এলিয়ট-ডাওসন সংকলিত মিনহাজ, ফেরিস্তা ইত্যাদি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁরা মুসলিম শাসকদের এতটা হীন চক্ষে দেখতেন না ('অঙ্গুরী বিনিময়' বা 'দুর্গেশনন্দিনী' স্মরণ করুন), যদিও

মিনহাজের ইতিহাসও বিশ্বাস করতেন না। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিমদের মতই হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়, জমিদাররাও ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণকে উভয় সম্প্রদায়ই শোষণ নির্যাতন করতেন, একথা বঙ্কিমের রহিম শেখ ও রামা কৈবর্ত জানত। অবশ্য জানাটা চেতনার স্তরে ওঠেনি।

এবার আধুনিক যুগ। অবশ্যই ইংরেজরা সে যুগের প্রতিষ্ঠাতা বলে নিজেদের ঘোষণা করল। ষোড়শ শতকের এলিজাবেথীয়, বিশেষত সেক্সপীয়রের সাহিত্য, সপ্তদশ শতকের রাজনৈতিক বিপ্লব এবং তার উদ্গাতা-মিল্টন, অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লব, অবাধ বাণিজ্যনীতি ও য়ুটিলিটারিয়ানিজ্‌ম, উনিশ শতকের রোমান্টিক কাব্য ও উদারনৈতিক গণতন্ত্র—আর কোন জাতের অবিনশ্বর কীর্তি? নৌবহর ত' অনেক পশ্চিমী জাতের ছিল, কিন্তু তার শৃঙ্খলে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের বেড়াজাল বাঁধল কারা? সমস্ত সীমান্তে কারা অতন্দ্র প্রহরী? সমস্ত শাসনকেন্দ্রে কারা সুদক্ষ ও ন্যায়বান শাসক? উনিশ শতকের শেষে কিপলিং, কার্জন, সলস্‌বেরি, রোজবেরি—সবাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সভ্যতাপ্রসারী মিশনে বিশ্বাসী—'শ্বেত মানবের ভার' বহন করে গর্বিত। পশ্চিমী সভ্যতার পরিণাম—'We', প্রাচ্য সভ্যতার পরিণাম—'They'. কিন্তু 'আমরা' জ্ঞানবিজ্ঞানপ্রযুক্তি মানবতার পথে এগিয়েছি আর 'ওরা' এক জায়গায় থেমে গেছে বা পিছু হটেছে। আমাদের শিক্ষার বস্তু (objective)—ওরা। আমরা শিক্ষক (subject)—ওদের। এমনভাবে শেখাব যাতে ওরা চিরদিন কৃতজ্ঞ ও বশম্বদ হয়ে থাকে। এডওয়ার্ড সইদের মতে, "Orientalism is a western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient." কার্জনের ভাষা একটু ইতর ছিল—"a necessary furniture of the Empire."

কিন্তু সইদের যুক্তি পুরোপুরি মানা যায় না। ওরিয়েন্টালিজমের একটা সদর্থক দিকও ছিল—তা হল বাংলার সঙ্গে ভারতের, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, যোগসূত্র পুনঃস্থাপন। নীরদ সি. চৌধুরী 'আত্মঘাতী বাঙালী'র প্রথম খণ্ডে মন্তব্য করেছেন, "ইংরেজী যুগের আগে বাঙালী তৎভব মাত্র ছিল"—অর্থাৎ তৎসম নয়, সর্বভারতীয় নয়, সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তর মুখ দিয়ে বলছেন, বাঙালীর ঐক্য, বিদ্যা গৌরব সবই যবন আক্রমণের সঙ্গে তিরোহিত হয়েছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে যদিও পাল যুগ "বাঙালীর দেশ ও স্বাজাত্যবোধের মূলে", পাল এবং সেনবংশ পর্যন্ত বাংলার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক যোগ ছিল, পালদের সময় ত' কান্যকুব্জ পর্যন্ত ভৌগোলিক আধিপত্য। লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে পড়ি, লক্ষণ সেন বারানসী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের প্রতিমার মধ্যে বৈষ্ণব মূর্তির সংখ্যাই সমধিক। নেই নেই করেও সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য যায়নি। ধোয়ী সংস্কৃতে লিখেছিলেন 'পবনদূত', শ্রীধরদাস—'সদুক্তি কর্ণামৃত', জয়দেব—'গীতগোবিন্দ'। তথাকথিত অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম যুগও নিষ্ফল যায়নি। পঞ্চদশ শতকের শেষে মুসলিম অভিযানের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর বাঙালী ধীরে ধীরে ভারতীয় সত্তার মূল স্রোতে ফিরে যাবার চেষ্টা করে। শ্রীচৈতন্য যখন আবির্ভূত হলেন (১৪৮৬), তখন নবদ্বীপের সংস্কৃত চর্চা তুঙ্গে। বেদান্ত নিয়ে ভাষ্য টীকার সংখ্যা অনেক কমে গেছে, তার কেন্দ্র তখন কাশী। কিন্তু মিথিলা থেকে আসছে ন্যায় ও স্মৃতির নয়া ভাষ্য। পক্ষধর মিশ্রের 'পক্ষশাতন' করেছিলেন রঘুনাথ শিরোমণি। ন্যায়ের সঙ্গে কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট আসতেও পারেন। সবচেয়ে বড়ো কথা দেশজ ভাষার

বিস্ময়কর অগ্রগতি। চণ্ডীদাস, বাংলাঘেঁষা মৈথিলিতে বিদ্যাপতি—দান্তে, পেত্রার্কার ভূমিকা নিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বরপুরীর প্রভাবের ফলে গীতা ও ভাগবত ফিরে পেয়েছিল তার নষ্ট মাহাত্ম্য। চৈতন্যদেব নিত্য শুনতেন—"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি ('জগন্নাথবল্লভ'), কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।" আর পুরীরা ত' তাঁর গুরুবংশ। বড়ু চণ্ডীদাসের (?) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কিন্তু উল্লিখিত হয়নি, যদিও সুখময় মুখোপাধ্যায় এর কাল ১৪০০-১৫০০ খৃঃ স্থির করেছেন এবং ডঃ শহীদুল্লাহ্ আরও পিছিয়ে ১৩৭০-১৪৩৩ খৃঃ। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শেষ হয় ১৪৮০-তে। কবিপুত্রের কাছে তাঁর প্রশংসা করলেও আর কোন উৎসাহ দেখাননি মহাপ্রভু।

মনে হয়, যৌবনে হিন্দু (ভারতীয় অর্থে) সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন চৈতন্য এবং হুসেন শাহের আমলে বাংলা থেকে তা পরিচালনা করা যাবে না বলেই তিনি উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতভ্রমণ, বৃন্দাবনে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, রথযাত্রা উপলক্ষে বাংলার ভক্তদের শ্রীধাম গমন। কিন্তু একে পরাক্রান্ত মুঘল আমলে তা আরও অসম্ভব হত, অন্যদিকে মধুর রসের আরও গভীরে প্রবেশ করে এসব তুচ্ছ জ্ঞান করলেন তিনি। গম্ভীরার অন্তরালে অন্তর্ধান বাঙালীর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। তবু তিনি রেখে গেলেন উত্তরভারত, হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যোগস্বরূপ বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীকে। দেশজ সাহিত্য আরও উন্নত হল তাঁরই প্রেরণায়। তিনি না এলে গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ হতেন না। রাধার বিরহ নয়, খুল্লনার বারমাস্যাই সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে থাকত।

গোস্বামীরা মন দিলেন শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায়। রূপ অবশ্য ধোয়ীর অনুসরণে 'হংসদূত' এবং জয়দেবের অনুসরণে 'গীতাবলী' লেখেন। তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' ত' বৈষ্ণব অলংকার শাস্ত্রের শিরোভূষণ। কিন্তু জীব গোস্বামীর 'ষটসন্দর্ভ', কৃষ্ণদাসের রাধাপারম্যবাদ, লোচন ও বাসুঘোষের গৌরনাগরবাদ প্রভৃতি মতবাদ মধ্যযুগীয় নব্যন্যায়িক কূটকচালিতে ইন্ধন জোগাল—ডানদের metaphysical poetry হল না। জীবিত থাকলে চৈতন্যদেব গৌরনাগরবাদ প্রত্যাখ্যান করতেন। নবদ্বীপের স্থানীয় বীরভজনা তাঁর মত ভারতপথিক ও ভক্তশ্রেষ্ঠ অসহ্য মনে করতেন। গ্রাম্য মনে করতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বৈষ্ণবদের মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত তিনি স্বচক্ষে দেখে যান। বৃন্দাবনদাসের কাছে চৈতন্যদেব মহাপ্রভু, আরেকদল অদ্বৈতাচার্যকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করছে, তৃতীয় দল নিত্যানন্দকে চৈতন্যের সমাসনে বসিয়েছে, কেউ কেউ গদাধর পূজাও শুরু করেছে। একমাত্র গোস্বামীরাই চৈতন্যের সর্বভারতীয় ভাবমূর্তিকে দলবাজির উর্ধে তুলে রেখেছিলেন।

বস্তুত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব উত্তরভারতের অদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করেনি, বরং তার একটা সূক্ষ্ম সাময়িক অস্তিত্ব স্বীকার করেছিল। চৈতন্যের ভক্তি-রাগানুগা। চিরঅতৃপ্ত তাঁর মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের মধ্যেই বিরহাশঙ্কা, নতুন করে পাবেন বলেই তিনি ক্ষণে ক্ষণে হারাতেন, দুঃখের মাধুরীতে দিশা হারাতেন। যখন পান, তখন অদ্বৈত ভূমিতে বিচরণ, যখন হারান—তখন দ্বৈত ভূমিতে বিরহের ক্রন্দন। এত দ্রুত উভয় ভূমির মধ্যে তিনি আন্দোলিত যে ভেদাভেদ তাঁর কাছে অচিন্ত্য। একেবারে দ্বৈত হলে উত্তরভারত তাঁকে নিতনা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দ্বৈতভাবনা ত' বাড়লই, উপরন্তু তাঁর সন্ন্যাস দৃষ্টিও লুপ্ত হল। চৈতন্য শঙ্করবিরোধী হলেও তাঁরই মত আপোষহীন কঠোর ছিলেন। এত উচ্চ আধারের গ্রহণযোগ্য ধর্মকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে গেলে তার মধ্যে মানুষের নানা

দুর্বলতা—নারী, অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি—প্রবেশ করবেই। তিনি যে উচ্চস্তরে মানুষকে তুলতে চেয়েছিলেন তা অদ্বৈত, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, নরহরি—কেউই বুঝতে পারেননি। সকলকে প্রেম বিলোতে হবে—তাই আধারের যোগ্যতা বিচার করার ধৈর্য ছিল না। বহু উঠতি বণিক, নবশাখকে নিত্যানন্দ বৈষ্ণব করলেন। তাঁর পুত্র, বীরচন্দ্র, সম্প্রদায়ের দ্বার আরও মুক্ত করে দেন। এঁরা বৈষ্ণবাচারের বহিরঙ্গ নিয়েছিলেন, চৈতন্য-স্বরূপ-রামানন্দের নিগূঢ় রসালাপের রহস্য বুঝতে পারেননি, গোস্বামীদের দর্শন ত' নয়ই। এডওয়ার্ড সি. ডিমক জুনিয়ার তাঁর The Sound of Silent Guns and Other Essays-এ এই পরিবর্তনের প্রশংসা করেছেন। রাধা ও ভক্তের সমীকরণের পর এল গণতন্ত্রীকরণ। রাধার স্থান নিল সখীরা, সখীদের স্থান মঞ্জরীরা। সব বৈষ্ণবভক্তই এ ভাবে পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হতে পারতেন। আমি এই সিদ্ধান্ত মানতে পারলাম না। বৈষ্ণবদের সংখ্যা বাড়ল, কিন্তু আধ্যাত্মিক মান বাড়ল না, বরং, সহজিয়া মতের প্রভাবে, কমল। কিছু উচ্চবিত্ত বৈষ্ণব—বাকিরা আউল, বাউল। সাহিত্য সাধনায় তার ছাপ স্পষ্ট। ষোড়শ শতকের পদাবলীর সঙ্গে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের পদাবলী তুলনা করলে বোঝা যাবে কেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাকে 'পদস্খলনের যুগ' আখ্যা দিয়েছেন। সেজন্যই নবদ্বীপের রাজসভায় চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস কেউ শুনতে চাইছে না, শুনতে চাইছে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র রসোদ্গার।

শাক্তধর্ম প্রায় একই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন বাংলায় পালপর্বের দেবীমূর্তিতে শাক্তধর্মের প্রাক্‌তান্ত্রিক রূপ। সবই প্রায় শিবের সঙ্গে যুক্ত। চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মানা মূর্তির সংখ্যাই বেশি। উপবিষ্টা মূর্তির হাতের সংখ্যা বেশি। কারও নাম সর্বমঙ্গলা, কারও পার্বতী, কারও মহালক্ষ্মী। রুদ্রতন্ত্রের দেবীমূর্তির মধ্যে মহিষমর্দিনী দুর্গাই প্রধান—সাধারণত অষ্ট বা দশভূজা। কোন কোন মূর্তির ওপর মহাযানী ও বজ্রযানী প্রভাব রয়েছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে চামুণ্ডা বা চামুণ্ডীই ছিল বাঙালীর প্রিয়।

অষ্টম ও নবম শতকে মহাযানে নতুনতর তান্ত্রিক ধ্যানকল্পনার স্পর্শ লেগেছিল এবং তার ফলে দশম শতক থেকে বৌদ্ধধর্মে গুহ্য সাধনপদ্ধতি, পূজাচার ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল। একে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের ওপর আদিম কোন সমাজের ধর্মচিন্তার অভিঘাত বলা যেতে পারে। বাংলার সন্নিহিত পাহাড়ী অঞ্চল থেকে নিম্নতর জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করছিল এবং শেষোক্ত দুই ধর্ম তাদের সাধ্যমত আপন ধ্যানধারণা দিয়ে তাদের শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছিল। জনসাধারণ কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বেদবেদান্ত বা বৌদ্ধ শূন্যবাদ, মাধ্যমিক ইত্যাদি দর্শন বুঝত না। তাদের কাছে যাদু শক্তি, মন্ত্র, মণ্ডল, বীজ অনেক বেশি বোধগম্য। এই টানাপোড়েনকে সংস্কৃতায়ন ও লোকায়নের দ্বন্দ্ব আখ্যা দেওয়া যায়। ফলে মহাযানে বিবর্তন শুরু হল এবং মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদিতে তা বিভক্ত হল। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলা বৌদ্ধধর্মের এই ইতিহাসে সহজযানের প্রাধান্য। এর নেতৃত্ব দেন সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্যরা। বৌদ্ধ গান ও দোঁহায় তাঁদের উপলব্ধি ও গুহ্য সাধনপ্রণালী বিধৃত হয়ে আছে। সন্ধ্যাভাষায় লিখিত হল বলে তার কাল নির্ণয় ও অর্থ নির্ণয় নিয়ে নানা গোলমাল।[১] কায়সাধন ও দেহাশ্রয়ী হঠযোগ নির্ভর সহজযান এবং ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মোক্ষ ও গুহ্য সাধন পদ্ধতি মিলে যায়। চতুর্দশ শতকের মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শক্তিধর্মের কুক্ষিগত হয়।

সেনপর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। দুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি বাড়ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, "ঘনায়মান অন্ধকারে ইঁহারাই যে একমাত্র আশা ও ভরসা এ

বিশ্বাস যেন ক্রমশ বাঙালী চিত্তকে অধিকার করিতেছিল।" মুসলমান বিজয়ের কিছু কাল পরেই 'কালিকাপুরাণ' রচিত হয়। এই কালী চণ্ডীতে মিশে যান এবং "সমস্ত মধ্যযুগে চণ্ডীর একাধিপত্য"। নীহাররঞ্জন মনসার কথা বিশেষ উল্লেখ করেননি। কিন্তু চৈতন্য জন্মকালে নবদ্বীপের নানা ধর্মাচরণের যে বিবরণ পাই, তাতে মনসার পূজা ঘটা করে হচ্ছে। মনসা ও চণ্ডী প্রথমে লৌকিক দেবী ছিলেন। পরে চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডীতে মিশে গেলেন সেই প্রণালীতে যার দ্বারা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণে ওঠে—অর্থাৎ সংস্কৃতায়ন। মনসা নিয়ে অতি সম্প্রতি যে আলোচনা এডওয়ার্ড সি. ডিমক করেছেন,[১ক] তাতে তাঁকে মহাভারতের জরৎকারু ও কদ্রুর সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়াও বৌদ্ধ জাঙ্গুলির সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। অধ্যাপক ডিমক মনসা ও চণ্ডী, শিব ও চাঁদের myth-এর যে সমীকরণ করেছেন তা মানা কঠিন। লৌকিক মনসার হাতে অতি প্রাচীন শিবের পরাজয় হয়েছে।

বিপ্রদাসের 'মনসা-বিজয়ে'র কাল পঞ্চদশ শতকের শেষ (১৪৯৫-৯৬)। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাল, সুকুমার সেনের মতে, মধ্য পঞ্চদশ শতক। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', ষোড়শ শতকে লেখা হয়। এ তিন মঙ্গলকাব্যে বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের বহু তথ্য মিলবে, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর। ডিমকের মতে, এদের চরিত্র—"are not bodiless suggestions of reality but the lusty and good humoured people of field and village. Even the gods partake of thir essential humanity." কিন্তু মুকুন্দরামের আত্মকথা পড়লে যেটা বড়ো হয়ে ওঠে, তা হল মানসিংহের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বর্ধমান অঞ্চল থেকে মেদিনীপুরে বহু লোকের পলায়ন। বর্তমান উদ্বাস্তুদের দুঃখদুর্দশা বেশ ভাল নির্দেশিকা। নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত হচ্ছে। ডিহিদার মামুদ সরিপ শুধু সাম্প্রদায়িক কারণে 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের অরি' হচ্ছে না। সে 'খিলভূমি লেখে লাল' অর্থাৎ রাজস্ব বাড়াতে পতিত জমিকেও উর্বর দেখাচ্ছে। 'বিনা উপকারে খায় ধুতি'—অর্থাৎ কিছু না করে ঘুষ খাচ্ছে আমলারা। 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে'র অর্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। 'তালুকদার নেউগী চৌধুরীরা' ভাল থাকলেও বণিকদের অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। বাংলার বহির্বাণিজ্য পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মোটামুটি ভাল। কিন্তু ষোড়শ শতক থেকে তাদের পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের যুগপৎ আক্রমণে পিছু হটতে হয়। মোটামুটি তা উপকূল বাণিজ্যে (করোমণ্ডলের পথে শ্রীলঙ্কা) সীমাবদ্ধ। মুদ্রার অভাবে চলছে বদর বাণিজ্য (barter). আর্থিক সংকটই ধনপতি-চাঁদ সদাগরদের দৈবী আশ্রয় ভিক্ষার অন্যতম কারণ। আগে যারা শিবের উপাসনা করত, এখন মনসা বা মঙ্গলচণ্ডীর উপাসনা ধরল। কালিদাসের যোগমগ্ন শিব ক্রমশ হলহস্ত কৃষক, কামুক, ভাঙড়, বেকার, বৃদ্ধ স্বামীর প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন।

মনসা, চণ্ডী সবাইকে ছাপিয়ে উঠলেন কালী। প্রাচীন সাহিত্যের 'ব্রহ্মময়ী', 'পরমাপ্রকৃতি', 'পরম কারণ', ধারণ করলেন অন্যরূপ। মিরচা এলিয়াডে লিখেছেন, "The Inidian Great Goddesses (Kali and the rest), like all other Great Goddesses, possess at once the attributes of gentleness and dread. They are at once divinities of fertility and destruction, of birth and also of death (and often also of war)."[২] ভয়ঙ্করী কালী (her cult is the bldodiest any where in Asia)-কে কোমলা ও করুণাময়ী আখ্যা দেওয়া হল (বিবেকানন্দের অনুপম ভাষায়—মৃত্যুরূপা মাতা)। এর প্রধান কারণ—বাংলার অষ্টাদশ শতক ছিল ভয়ের শতক (time of trouble). বর্গীর হাঙ্গামায় যার আরম্ভ তার শেষ মন্বন্তরে ; নবাবী শাসনের

মধ্যাহ্নে যার আরম্ভ, ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভে তার শেষ। এত অর্থনৈতিক/রাজনৈতিক ভাঙাগড়া কমই হয়েছিল।

ভয়ের চেয়ে বড়ো—উদ্বেগ। যত অরাজকতা বাড়ল, তত ভয়। মীরকাশিমের বিভিন্ন পত্রে ও ইংরেজ কর্মচারী/বণিকদের চিঠিতে পড়ি বাংলার অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যও সাহেবদের হাতে চলে যাচ্ছে। ১৭৬৫'র পর দ্বৈত শাসন (diarchy), এবং তার ফল—মন্বন্তর। এমন অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষকে অভয়ার আশ্রয় নিতে প্রণোদিত করবে, আশ্চর্য কি! রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।" ক্লাইভ, ভ্যান্সিটার্ট, হেস্টিংস ইত্যাদির অনুগ্রহপুষ্ট বাঙালী বেনিয়ান/দেওয়ানরা উন্নতিতে শক্তির কৃপা অনুভব করে দুর্গা ও কালীপূজা করবেন তাতে আশ্চর্য কি![৩] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন এবং তিনিও লিখবেন 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর'-এ কালীর স্তুতি। কিন্তু তাঁর শিব একেবারে ভাঁড় সেজেছেন। দেবতাই শুধু নয়, নামজাদা তপস্বী (ব্যাস)রও অবস্থা বেহাল। ঝানু সংসারীর (কারণ সংসার-প্রপীড়িত) ভারতচন্দ্রের দেবতার ওপর বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই কৃষ্ণনগর সভার নিম্নরুচিকে তৃপ্ত করতে তিনি প্রায় পর্নোগ্রাফি লিখেছেন। বহুদিনের নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক ভাঙাগড়ার ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয়। আবার এই মূল্যবোধের অভাব বা রুচিবিকার বৈদগ্ধ্য, ছন্দচাতুর্য, অলঙ্কার বাহুল্য দিয়ে ঢাকা যায় না। রামপ্রসাদ সেনকে রক্ষা করেছে তাঁর অকৃত্রিম ভক্তি। তবু তাঁর গানেও সংসার জ্বালা ফুটে উঠেছে। 'অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি', 'এ সংসারে এনে মাগো করলি আমায় লোহা পেটা' প্রভৃতি পদাংশ সহজবোধ্য।

নবকৃষ্ণ দেব, গোকুল ঘোষাল, কান্ত নন্দীরা বিপুল ঘটা করে দুর্গা পূজা শুরু করলেন—কারণ দুর্গাই ঐশ্বর্যের দেবী। পুরাতন জমিদাররা (নাটোর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি) দুর্গা বা অন্নপূর্ণা পূজা চালিয়ে গেলেন। নতুন জমিদাররা তার সঙ্গে যোগ করলেন (বেনিয়ানদের স্টাইলে) ঘটা করে মাতৃশ্রাদ্ধ, পণ্ডিত বিদায়। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল বাঈ নাচ, পৃষ্ঠপোষক সাহেব তোষণ। নিম্নবর্গের ও বিত্তের লোকরা বিদ্যাসুন্দর ভাঙিয়ে যাত্রাপালা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, খেউড়, সঙ ইত্যাদিতে তৃপ্ত হত। উনিশ শতকের গোড়ায় ধর্ম আর উপলব্ধির স্তরে রইল না—জাঁকজমকের প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়াল। সব রুচির বাঁধ ভেঙে গেল। নিধুবাবু ব্যতিক্রম।

এমন সময় স্থাপিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি,[৪] দু দশকের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ,[৫] আরও দু দশকের মধ্যে—হিন্দু কলেজ।[৬] ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিযান পুরোদমে শুরু হয়ে গেল মেকলের ১৮৩৫ সালের মিনিটের পর। বলা বাহুল্য, একটা বৈপরীত্য (dichotomy) সৃষ্টি হল। এশিয়াটিক সোসাইটি লুপ্তপ্রায় প্রাচ্য বিদ্যাকে আবিষ্কার করল, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্ম দিল এবং হিন্দু কলেজ পশ্চিমের সাহিত্য (বিজ্ঞান বিশেষ নয়), ইতিহাস, দর্শনকে নতুন বাঙালী প্রজন্মের মুগ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরল। এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার (evangelicalism), ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার, আর্যশাস্ত্র পুনরুদ্ধার ও বঙ্গভাষা চর্চা সমসাময়িক—একথা ভুললে চলবে না। হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ ও উইলকিন্সের গীতার অনুবাদের পর এল উইলিয়াম জোন্সের শকুন্তলা ও কিছু বৈদিক সূক্তের অনুবাদ এবং কোলব্রুকের আর্যগণিত নিয়ে গবেষণা। কেরী বাইবেল অনুবাদের সঙ্গে হাত দিলেন

বাংলা কথ্যভাষার নিদর্শনস্বরূপ 'কথোপকথন' রচনায়। রামরাম বসু ও তারিণীচরণ মিত্রের হাতে আর এক রকম গদ্য বেরোল। মধ্যযুগের কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতি শ্রীরামপুর প্রেস বের করতে লাগল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ও রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' প্রায় সমসাময়িক, যেমন সমসাময়িক শ্রীরামপুর ও রামমোহন সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র। নানা দিক থেকে বাঙালী চিত্ত আবেগে আলোড়িত হয়ে উঠল। কোথায় গেল ন্যায় ও স্মৃতির টীকা, হাফেজ ও ফিরদৌসীর বয়েৎ, লয়লা-মজনু বা গোলেবকাউলির কিস্‌সা, মঙ্গল ও পদাবলী কাব্যের ধ্বংসাবশেষ। তার স্থান নিতে চাইল একদিক থেকে অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, সংশয়বাদ, উপযোগিতাবাদ ও বিপ্লববাদ, অন্যদিক থেকে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ নিয়ে ঔৎসুক্য, চলিত হিন্দু ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন, পরিচিত সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পিউরিটান সংকোচ। মনে প্রাণে ভারতচন্দ্রের শিষ্য হয়েও ঈশ্বর গুপ্ত 'বিদ্যাসুন্দর' পর্যন্ত যেতে পারলেন না।

বাঙালীর জীবনদর্শন এই চিন্তা সংঘর্ষের ঝটিকায় বিপর্যস্ত হল, বিভ্রান্ত হল, সময় সময় পথভ্রষ্ট হল। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ, একেশ্বরবাদ ও ডিইজম্‌, হিউমের সংশয়বাদ, গড্‌ইনের নিরীশ্বরবাদ—এর কোনটা নেব? অথবা পরিচিত দেবদেবী, পূজাপার্বণ, আচার-সংস্কার (জাতিভেদ, সতী, কৌলিন্য প্রথা) বজায় রাখব? নাকি বহুদিনের বিস্মৃত ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিক চিন্তা ফিরিয়ে আনব ও তদনুষঙ্গে প্রয়োজনীয় সংস্কার (অপৌত্তলিক উপাসনা, সতীদাহ নিবারণ ইত্যাদি) সাধন করব? উনিশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে

> The best lack all conviction, while the worst
> Are full of passionate intensity.

২

আধেয়ের রূপ আমরা খানিকটা বুঝলাম। কিন্তু আধারের দিকে আবার মন দিতে হবে। জর্জ স্যানসমের উক্তি স্মরণ করুন; "ভেতর থেকে যে হাত দরজা খুলে দিচ্ছে, বাইরে থেকে আঘাতকারী হাতের চেয়ে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।" টয়নবি যাকে 'response' বলেছেন, তা করছে কারা? কিরকম ছবি আমরা শেষতম গবেষণায় পাচ্ছি অষ্টাদশ শতকীয় ভারতের/বাংলার?

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে স্বীকার করা হচ্ছে, সমকালীন ইওরোপ বা তকুগাওয়া জাপানের, এমনকি চীনের, তুলনায় মুঘল ভারতের কৃষি-প্রযুক্তি পশ্চাৎপদ ছিল। যখন চীনের ভূমি রাজস্ব উৎপাদনের ৫ থেকে ৬%, মুঘল ভারতে তখন তা ৫০%-এরও বেশি। বণিক, মহাজন, জমিদারের দাস—কৃষক শ্রেণী—এমন হতদরিদ্র যে অভ্যন্তরীণ বাজার নিশার স্বপ্নের মত। অন্তর্বাণিজ্য ব্যাহত হত প্রাগৈতিহাসিক পরিবহন ও অন্তর্দেশীয় শুল্কের জুলুমে। বিদেশী বণিকের চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, রেশম ও রেশমী বস্ত্র, নীল ও মশলার মত কয়েকটি পণ্যে।[৬ক] পরে কোম্পানীর আমলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইওরোপের বাজারের জন্য সোরা ও চীনের বাজারের জন্য আফিম। ব্যবসায়িক সংগঠনে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে বাইরের চাহিদা মেটানো গিয়েছিল। মূলধন ছিল না, ছিল না উন্নত প্রযুক্তি। প্রথমদিকের ইওরোপে যেমন কিছু অভিজাত ও যাজক উৎপাদনব্যবস্থার সামিল হন, তেমনটি মুঘলভারতে সম্ভব ছিল না। আবার শিল্পীশ্রেণীর মধ্যেও কেউ মূলধন সংগ্রহ করে, উৎসাহ দেখিয়ে, শিল্প

গড়ার চেষ্টা করেনি। তাদের বংশানুক্রমিক দক্ষতা এবং সামাজিক গতিবিধির ওপর বিধিনিষেধ শিল্পায়নে যন্ত্রপ্রয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[৭] বেইলি হেবারের (Weber) প্রতিধ্বনি করে লিখছেন, ভারতীয় অর্থনীতিতে চাহিদা হঠাৎ বাড়লেও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হত না। কারণ ভারতীয় শিল্পপতিদের কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করত জাতপাত ও ধর্ম।[৮] এ অবস্থায় ওয়ালারস্টাইনের পশ্চিমী core যে ভারতের periphery-কে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতির নাগপাশে জড়িয়ে ফেলবে, তাতে আশ্চর্য কি।

মার্শাল বা মরিস. ডি. মরিসরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অভিঘাতকে বাড়িয়ে দেখতে চান না। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী ও ব্রিটিশ রাজ ভারতের অনুন্নত অর্থনীতিকে আরও দুর্বল, এমনকি বিকৃত করে, রমেশ দত্ত থেকে অমিয় বাগচী প্রভৃতির সে মত পুরো অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলার ব্যাপারটা আরও করুণ। কোম্পানীর পাদপীঠ—বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব শুধু বিলাতে ডিভিডেন্ড দিতেই ব্যয়িত হত না। তার অধিকাংশই ব্যয়িত হত শাসনকার্য নির্বাহে, আরক্ষাখাতে এবং investment বা ভারতীয় পণ্য কেনা বাবদ। তার ওপর ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছর ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের খরচ। যা বাইরে থেকে দেখা যেত না তা হল ভারতীয় রফতানী বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত দ্বারা ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক লেনদেনের সমস্যা মেটানো। জমিদারদের ক্ষমতা বাড়াতে হয়, বারংবার দেনা করতে হয় এবং শোধ দিতে হয় বাংলাকেই। কোম্পানীর আমলের সংরক্ষণ নীতি ও ১৮১৩'র পরবর্তী অবাধ বাণিজ্যনীতি (যা কখনই অবাধ ছিল না) দেশজ শিল্পের ক্ষতিসাধন করেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ড্যালহৌসির আমলে রেলপথ বিস্তার বাবদ ও অন্যান্য কারণে বিলেত থেকে মূলধন আমদানি শুরু হল কিন্তু তার পরিমাণ স্বল্প এবং সুফল নষ্ট করে দিল সিপাহী বিদ্রোহ বাবদ ঋণ। মূলধনের লভ্যাংশ ও ঋণের সুদ জোগাতে জনসাধারণের ওপর বসানো হল লবণ কর, আয়কর, লাইসেন্স কর। বাড়ল রায়তওয়ারী এলাকার রাজস্ব। ইন্ডিয়া অফিসের পাওনা (হোমচার্জ) পাউন্ডে দিতে হত। টাকা ও পাউন্ডের বিনিময় হারে হেরফের হলে রাজস্ববরাদ্দ বাড়াতে হত। আন্তর্জাতিক বাজারে রূপোর দাম পড়ে যেতে থাকল ১৮৭৩ সাল থেকে। অতএব রাজস্ব কমানো ত' গেলই না, অবাধ বাণিজ্যনীতিও সফল করা গেল না।

যা ব্রিটিশ মূলধন এসেছিল, তাতে রেল, পথ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি শিল্পায়নের নিম্নতম পরিকাঠামো তৈরি হল, কিন্তু ব্রিটিশ ধাঁচের শিল্পবিপ্লব ঘটল না। তা পাট, কয়লা ও চা'র মত শিল্পে বিনিয়োগ করা হল। তার মালিকানা ও পরিচালনা থাকল ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে, আর লভ্যাংশ যেতে লাগল ব্রিটেনে। জাহাজী পরিবহন, বীমা, ব্যাংকিংও থাকল ইংরেজ/স্কচদের অধীন। আঠারো শতকের শেষে রামদুলাল দে'র মত বণিক, দালাল, জাহাজের মালিক কিছু ছিল। উনিশ শতকের তৃতীয়/চতুর্থ দশকেও দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলিতী এজেন্সি হাউসদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নানা শিল্প, ব্যবসায়, ব্যাংকিং শুরু করেছিলেন। কার, টেগোর অ্যান্ড কোম্পানীর ইতিহাস লিখেছেন ব্লেয়ার ক্লিং। কিন্তু অতি বিস্তারের পরিণাম—অমনোযোগ, সাহেবদের ওপর অতি বিশ্বাসের পরিণাম—ঠকা। ১৮২৫, ১৮২৯-৩৩-এর নীলের ফাটকায় সাহেবদের মতই ঠকেছিল বাঙালী। ১৮৪৭-এ ঘটল ভরাডুবি। মোটের ওপর ১৮৪৭-৪৮-এর বিপর্যয়ের পর বাঙালী ধনী শিল্পের পথ ছেড়ে জমিদারি ও সহরের জমিবাড়ি কেনাবেচায় টাকা খাটাতে থাকে। নানা আইনের ফলে জমিদারীর লাভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। হোল্ট মেকেঞ্জির

প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৮৩০ সালে জমিদারের লাভ সব চেয়ে বেশি হত মৈমনসিংহে, তারপর পর্যায়ক্রমে যশোর, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায়। রোড সেস (cess) অ্যাক্ট চালু হবার সময় এক হিসাবে দেখা যায় ১৭৯৩-র তিনকোটি টাকা খাজনা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ কোটি টাকায়। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহরের জমির দাম, বাড়িভাড়া বাড়ে। তাতেই টাকা খাটে। শিল্পবিপ্লব, নবজাগরণ প্রভৃতি আধুনিকতার লক্ষণ দেখা গেল না, শুধু কয়েকটি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত এলাকা (enclave) ছাড়া। তার মধ্যে প্রধানতম হল কলকাতা, যা প্রথম থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী।

বলা বাহুল্য, কলকাতার সঙ্গে ফ্লোরেন্সের তুলনা করা বাতুলতা। কলকাতা শিল্পের সহর নয়—বাণিজ্যের সহর, বন্দরসহর (port city). তার কাজ উৎপাদন নয়, সওদাগরি। বহির্বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা, পরিবহন—সবই সাহেবদের হাতে। প্রশাসনের নানা বিভাগে তারাই মুখ্য আধিকারিক ও মাঝারি আমলা। সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতে বিচারক এবং প্রধান ব্যবহারজীবী। বাঙালীরা দেওয়ানি থেকে নেমে হয়েছে গোমস্তা, খাজাঞ্চি, ছোট কেরানী, ছোট উকিল। বেন্টিঙ্ক-এর সময় থেকে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালীকে ডেপুটি কলেক্টর ও মুনসেফের পদ দেওয়া হয়। অনেক পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের। বিলেত গিয়ে আই সি এস পরীক্ষা দিতে লেগে যায় ১৮৬৪ সাল। লীটনের আমলে যোগ হয় কিছু স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। ১৮৮৭ সালে মোট ভারতীয় আই. সি. এস.-এর সংখ্যা দাঁড়ায় বারোতে, স্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ানের সংখ্যা ৪৮-এ। একটা হিসেবে ১৮৬৭ সালে ৭৫ টাকা বা তদূর্ধ মাস মাইনের চাকুরির সংখ্যা ছিল—১৩, ৪৩১, যার অর্ধেকের বেশি ইংরেজ ও ইঙ্গভারতীয়দের হাতে। ১৮৮৭-তে চাকুরির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২১,৪৬৬। বড় চাকুরিতে ইংরেজদের ভাগ তখন—২৯%, ইঙ্গভারতীয়ের—১৯%। বাঙালীরা উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে শুরু করেছিল, বেশির ভাগ—শিক্ষক ও সাংবাদিক।[১]

অতএব এই তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীকে বুর্জোয়া এবং বাংলার নবজাগরণকে বুর্জোয়াশ্রেণীর কৃতিত্ব বলা চলে না। বরং তা প্রথমদিকে কিছু বেনিয়ান, দেওয়ান-জমিদার এবং পরের দিকে মধ্যবিত্ত ডেপুটি কলেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি আমলা এবং উকিল ডাক্তার শিক্ষক সাংবাদিকদের কৃতিত্ব। আগেও আমি বলেছি, "These people, half urban and half rural (for many were dependent on income from land around their village homes), were not a fit vessel to receive the Protean gift of the Renaissance. It is idle to seek for a Lorenzo Medici among the banians or a Fedrigo of Urbino among the Zamindars." যাঁদের আমরা উনিশ শতকীয় র‍্যানেশাঁসের হোতা ও উদ্গাতা বলে ঘোষণা করি, তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় ছিলেন রংপুরের কলেক্টরের দেওয়ান, কলকাতার জমি ও বাড়ির মালিক, জমিদার। মধুসূদন দত্ত ইংল্যান্ড যাবার আগে (১৮৬২) ছিলেন কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের হেড ক্লার্ক ও দোভাষী, পরে হাইকোর্টের প্রিভিকাউন্সিল সংক্রান্ত দলিলপত্রের পরীক্ষক (১৮৭০)। অনেক ডিরোজিও-শিষ্য ডেপুটি কলেক্টর হন। রাজনারায়ণ বসু সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্কুল পরিদর্শক। বিদ্যাসাগর ছিলেন সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। রঙ্গলাল, বঙ্কিম, নবীন সবাই—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দীনবন্ধু মিত্র কর্মজীবনের শেষে বাংলার ডাক বিভাগের প্রধানাধিকারিকের সহকারী। হেমচন্দ্র মাত্র একবছরের জন্য মুন্সেফ হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্তর কথা আলাদা—তাঁরা খোদ বিলাতী আই. সি. এস.। চাকুরির বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের

মধ্যে রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জমিদার ও বাড়ির মালিক, বিবেকানন্দ—নামকরা উকিলের ছেলে যদিও পিতৃবিয়োগে সর্বস্বান্ত। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি—রামকমল সেনের পৌত্র কেশব সেন উত্তরাধিকার সূত্রে ভূসম্পত্তির মালিক হন। এঁরা ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রবৃত্তি অনুসারে সংসারকর্ম ও সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু মেদেচি বা পেপেসি বা ভেনিসীয় বণিক-অভিজাতদের মত চরিত্র বা পৃষ্ঠপোষক হবার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। তাই এঁরা দলাদলি করতে পারেন, সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সতীদাহ থেকে স্ত্রীসহবাস আইন নিয়ে আন্দোলন করতে পারেন, জাতিভেদের বিরোধিতা থেকে ঈশ্বর বিরোধিতা পর্যন্ত যেতে পারেন, নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী সাহিত্যকর্মে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেন না। বস্তুত পাইকপাড়ার সিংহরা মধুসূদনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কতটুকু ? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, হুতোম—প্রত্যেকে ছিলেন স্বাবলম্বী, কারও দানের ওপর নির্ভর নন।

অর্থের ব্যাপার ছাড়াও রুচির ব্যাপারটাও গুরুত্বপূর্ণ। কসিমো বা লোরেঞ্জো মেদেচি কেবল ধনী ব্যাঙ্কার ছিলেন না, তাঁরা ব্রুনেলস্কি, বত্তিচেল্লি, দোনাতেল্লো, মিকেলাঞ্জেলোর প্রতিভা বুঝতে পারতেন। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস যতই যুদ্ধবাজ হন, সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদ দেখে স্তব্ধ হয়ে যাবার মত শিল্পদৃষ্টি তাঁর ছিল। পোপ দশম লিও যতই সুখী পোপ হন, রাফায়েলের কদর তিনি জানতেন। ক্ল্যাসিকসে এঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, নিজেদের পুঁথি ও শিল্পকলার ভাণ্ডার ছিল সমৃদ্ধ। সাধারণতন্ত্রী সোদেরিনি গড়িয়েছিলেন 'ডেভিড', ভেনিসের অভিজাতরা—তিৎশিয়ানোরদের দিয়ে প্রতিকৃতি। কিন্তু কলকাতার প্রথমযুগের বেনিয়ান ও পরের যুগের বাবুদের জোফানি বা ড্যানিয়েলের তেলরঙা ছবি বোঝবার শক্তিও ছিল না। তাদের দমদম ব্যারাকপুরের কুঞ্জেকুঞ্জে শোভা পেত ইতালী থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণীর ভিনাস বা পরী। মার্বেল হলেই হল, নগ্ন হলে আরো ভালো। তাদের ঘরের দেওয়ালে কি ধরনের ছবি টাঙানো থাকত শ্রীপান্থ তার খবর দিয়েছেন।[১১] জনসাধারণ কালীঘাটের পটেই তুষ্ট থাকত।

তাঁদের অবশ্যই অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান। কিন্তু ইতালীর র‍্যনেশাঁসের মত তা পেত্রার্কা-প্রবর্তিত 'হিউম্যানিটাস' বললে ভুল হবে, ক্রিসোলোরাস বা ফিচিনো-প্রবর্তিত গ্রিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার বললে ভুল হবে। তাঁরা সীমাবদ্ধ ছিলেন হ্যানোভারীয় ও ভিক্টোরীয় ইংরেজী সংস্কৃতিতে। একমাত্র মাইকেল, কবি হবার জন্য, গ্রিক, লাতিন, প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা ও ইতালীয়, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিখেছিলেন। যখন সবাই সেক্‌সপীয়র, মিল্টন, বায়রণ, মুরের কবিতা পড়ে মুগ্ধ, তখন এ সব পড়ার পরও মাইকেল হোমর, ভার্জিল, দান্তে, পেত্রার্ককে গুরু করেছেন, মিল্টনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সাধে কি আর তিনি বলতেন "আমি লিখি—as a Greek would have done." আর একজন শিখেছিলেন গ্রিক, লাতিনের ওপর হিব্রু। তিনি রামমোহন রায়, এবং তা ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব বোঝবার জন্য, তাদের থেকে এক বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের প্রেরণা পাওয়ার জন্য।

কিন্তু এহ বাহ্য। আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—গ্রিক লাতিনের বদলে সংস্কৃতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাও হয়েছিল অতীতে ফিরে যাবার রিভাইভ্যালিস্ট তাগিদে নয়, জীবনের নতুন দর্শন, নতুন চর্যা (ভাসারি যাকে maniera বলেছেন) আবিষ্কারের জন্য। রামমোহন যত্ন করে সংস্কৃত শিখেছিলেন তার প্রমাণ 'বেদান্ত গ্রন্থ'

(১৮১৫) ও বিভিন্ন অদ্বৈতবাদী উপনিষদের বঙ্গানুবাদ। স্মৃতি ও ন্যায়ে পারদর্শী না হলে সাকার ও নিরাকার নিয়ে বিতর্কে, মিশনারী ও গোস্বামীদের সঙ্গে বিচারে, সতীদাহ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদে (বিতর্কে) জেতা যেত না। কুলার্ণব ও মহানির্বাণতন্ত্র তাঁর একেশ্বরবাদের অন্যতম উৎস। মধুসূদনের মতো কট্টর সাহেব ব্যাস, বাল্মীকি মূলে পড়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ একেবারে বেদে চলে গেছেন। বিদ্যাসাগর ভবভূতি ও কালিদাস অবলম্বনে সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ গদ্য সাহিত্য—'সীতার বনবাস' ও 'শকুন্তলা'। তিনি তবু বহু বছর ধরে সংস্কৃত কলেজে পাঠ নিয়েছিলেন। বঙ্কিম কলেজ জীবনে সংস্কৃত পড়েননি, পরে পণ্ডিত রেখে শিখেছিলেন, আর 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'প্রচারে' দেবতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে, গীতার অসমাপ্ত অনুবাদে রেখে গেছেন অসামান্য তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের নিদর্শন। সংস্কৃতই তাঁর ভাষাকে করেছে এত ওজস্বী ও বিদগ্ধ। রবীন্দ্রনাথ তের বছর বয়সে 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করছেন আর কালিদাস পড়ছেন। উপনিষদের প্রেরণা ত' উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বস্তুত উপনিষদ, কালিদাস ও বৈষ্ণবসাহিত্য বাদ দিয়ে নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূকে বোঝাই যাবে না। বিবেকানন্দের পত্রাবলী থেকে প্রমাণ করা যায় কত যত্ন করে পাণিনি ও পতঞ্জলি পড়ে তিনি শাস্ত্র মন্থনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তারও আগে পড়ছেন 'পঞ্চদশী' ও অন্যান্য বেদান্ত ভাষ্য। হুইজিঙ্গা তাঁর 'এরাজমুজ' গ্রন্থে লিখছেন, "Erasmus made current the classic spirit." রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত এ মন্তব্য খাটে, শুধু গ্রিক-লাতিনের জায়গায় সংস্কৃত বসিয়ে নিলে। সংস্কৃতই এনেছিল classic spirit.

প্রশ্ন উঠেছে, এই সংস্কৃত কি পশ্চিমী Orientalism এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম—এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দান? ডেভিড কফ তা বললেও মানতে পারছি না। বুকানন-হ্যামিল্টন ও অ্যাডামের প্রতিবেদনে পড়ি বাংলায় সংস্কৃতচর্চা অবক্ষয়ের পথে। ওয়ার্ডের হিসাবেও দেখি টোলের সংখ্যা কি দ্রুত কমে যাচ্ছে। তবু বলি, হ্যালহেড, উইলকিন্স, জোন্স ও কোলব্রুকরা কাদের কাছে সংস্কৃত শেখেন? উইলকিন্স সংস্কৃত শিখেছেন মালদায়। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন জোন্সকে শিখিয়েছেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কেরীকে, ডানকান সংস্কৃত পাঠ নিয়েছেন খোদ বারানসীতে। রামমোহন তেমনি শিখেছেন হরিহরানন্দ অবধূত ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হবার পর বহু পণ্ডিত তার আশ্রয় পায়। রানী ভবানীর মত পৃষ্ঠপোষক অবশ্য ছিলেন না, কিন্তু রাধাকান্ত দেব কিছুটা স্থান পূরণ করেছিলেন তাঁর। তবে হ্যালহেডের উদ্যম, ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম-প্রচারেচ্ছা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা/হিন্দুস্তানী বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বাংলা গদ্য সাহিত্য এত দ্রুত বাল্যত্যাগ করত না। হ্যালহেড বুঝতে পারেন, মুসলমান আমলে ফার্সী বাধ্যতামূলক হওয়ায় বাংলা ভাষার মধ্যে বহু আরবী-ফার্সী ঢুকেছে এবং তার তৎভব শুদ্ধতা/সাবলীলতা নষ্ট করেছে। তাঁর খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১৭৭৮) বাংলা গদ্যের পুনর্জন্মের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর আসে আপজনের 'ইংরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' (১৭৯৩), জন মিলারের ' দ্য টুটর (সিক্ষ্যাগুরু)' (১৭৯৭), হেনরি ফর্স্টারের ইংরেজী বাংলা অভিধান (১৭৯৯)। রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্ররা যখন গদ্য সাহিত্যে সংস্কৃতকে অনুসরণ করছিলেন, কেরী তখন কথ্যভাষায় বাংলা লিখে ('কথোপকথন') নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেন।[১২] তবু, এই ওরিয়েন্টালিস্ট উদ্যোগকে প্রশংসা করেও, বলতে হয় রামমোহনের গদ্য অনেক বেশি পরিণত এবং বিদ্যাসাগরের গদ্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ, এবং

তার জন্য ওরিয়েন্টালিস্টরা কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন না। অবশ্যই রামমোহনের সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটি-ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের যোগাযোগ ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে তিনি বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন সত্যকার হিন্দুধর্ম নিয়ে। বিদ্যাসাগর ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়াতেন, তাদের জন্য 'অন্নদামঙ্গল' সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু কে বলবে তাঁরা পশ্চিমের 'cultural hegemony' প্রচেষ্টার শিকার? যেহেতু এ যুগের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং জোন্স-কোলব্রুকদের চেয়ে ঢের ভালভাবেই, সেহেতু কি বৈদিক (জোন্সদের মত), কি পৌরাণিক (উইলসনের মত), পুনরুজ্জীবনের আলেয়ার পেছনে ছোটেননি। সতীদাহ সম্পর্কে ও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে বিতর্কে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর আমাদের দেখিয়ে গেছেন কি ভাবে শাস্ত্রসাগর মন্থন করে সত্যকার ঐতিহ্যটি খুঁজে বার করতে হয় এবং তার সাহায্যে সুপ্রাচীন কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ সংস্কৃতিকে আধুনিকীকরণের কাজে লাগান যায়। [১৩]

অতএব আমাদেরটা পুরো পশ্চিমের imitatio বা অনুকরণ নয়। পশ্চিম ও পূর্বের বীজের শঙ্কর ভারতের মাটিতে পড়ে যে ফসল ফলিয়েছে—তাই। এখানেই তার শক্তি ও দুর্বলতা। কতকগুলি গদ্য ফর্মে তা অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে, যেমন ধর্মীয় বিতর্ক, উপন্যাস, ছোটগল্প, লিরিক কবিতা—কিন্তু নাটক নয়। মাইকেলের এপিক কবিতা রচনার মহতী চেষ্টা পারিপার্শ্বিকের দৈন্যে দুর্বল। ঠাকুর পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে ইওরোপীয় সংগীত কোন দাগ ফেলতে পারেনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ভারতীয় চিত্রশিল্পের যখন জন্ম হল তখন র‍্যানেশাঁস, বারোক, রিয়্যালিস্ট, প্রি-র‍্যাফেলাইট—সমস্ত শিল্পশৈলী শেষ হয়ে গেছে, ইমপ্রেসনিজম্ তার প্রেরণা হারাচ্ছে। এ সব কিছুর বাইরে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা যে আর্টের পত্তন করলেন তার প্রেরণা এলোরা-অজন্তা-বাঘ গুহার চিত্রকলা, মুঘল ও রাজপুত কলম। তার নিজস্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ না করেও বলা যায় পশ্চিমের সঙ্গে পার্থক্য বেড়েছে, কিন্তু এশিয়ার, বিশেষত, জাপানী, শৈলীর সঙ্গে যোগ দৃঢ়তর হয়েছে। সে শিল্পে ভাবের প্রাধান্য, ওরিয়েন্টালিস্টরা যা চেয়েছিলেন হ্যাভেলের শিষ্যরা তাই করেছেন এবং বিখ্যাত শিল্প সমালোচক আনন্দকুমার স্বামী তা অনুমোদন করছেন, এমন অভিযোগ মানি না। [১৪] ইতিহাস বলতে তেমন কিছু হয়নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে antiquarian ছাড়া কিছু বলা যায় না। সে তুলনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় মৈত্র অনেক সফল। তার চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক 'ইনস্টিংক্ট' ও 'ইমাজিনেশন' অনেক বেশি প্রখর ছিল। যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই শতাব্দীর দ্বিতীয়/তৃতীয় দশকের। রাজনীতি বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল ও বিনয়কুমার সরকার ছাড়া কোনো ভালো রচনা পাই না, অথচ মাকিয়াভেল্লি থেকেই পশ্চিমে এ ধরনের রচনা বৈজ্ঞানিক মোড় নিয়েছে। বেনেভেনুতো চেল্লিনির মত আত্মচরিতই বা কোথায়? বিজ্ঞানমনস্কতা রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রে লক্ষ্য করি কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির আগে সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

এর জন্য পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি অনেকখানি দায়ী। সত্যকার নাগরিক সাধারণতন্ত্র বা বর্জিয়া পেপেসি ছাড়া কি মাকিয়াভেল্লি সম্ভব? গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮) ছাড়া লক? ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের 'আলোকিত যুগ' ছাড়া রুশো? ফরাসী বিপ্লব ছাড়া পেইন, কঁদর্সে বা গডউইন? শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা আগেই বলেছি মেদেচি ছাড়া মেদেচি চ্যাপেল হয় না, পোপ ছাড়া সেন্ট পিটারস্। যখন আমাদের গজপতিরা বা চন্দেল্লরা বা রাষ্ট্রকূট—চালুক্যরা রাজত্ব করতেন, তখনই হয়েছিল কোনারক, খাজুরাহো,

এলোরা-অজন্তা। কলকাতায় ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব্রুজ (Bruges) টাউন হলের অনুকরণে হাইকোর্ট, সেনেট হলের করিন্থিয়ান ফাসাড (facade) এবং তাজমহলের নকলে ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়াল। কোথায় সম্রাট পঞ্চম চার্লস বা অষ্টম হেনরী বা প্রথম চার্লস—যে তিৎসিয়ানো বা হলবাইন বা ভ্যান ডাইকরা তাঁদের প্রতিকৃতি আঁকবেন? কোম্পানীর আমলে তবু কিছু ভালো প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা হয়েছিল। জোফানি কিছু ভালো প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। কিন্তু রাজের আমল—অন্ধকার। কনস্টেবল ও টার্নার ছাড়া কেউই সম্ভাবনা দেখাননি খাস ইংল্যান্ডে।

তবে ইতালীয় র‍্যনেশাঁসের বেলা আমরা যেমন দেখেছিলাম secularism-এর পাশাপাশি ধর্মেরই বিচিত্র মানবিক/মরমিয়া প্রকাশ, এখানেও তাই দেখছি। না হলে, খৃষ্টান মধুসূদন রাধার বিরহ নিয়ে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লিখতেন না, বঙ্কিম রোমান্টিক প্রণায়াবেগের চূড়ান্ত করে শৈবলিনীকে, দেবীচৌধুরানীকে, শ্রীকে নিষ্কাম sublimation-এর উপদেশ দিতেন না, 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'চিত্রা' পর্যন্ত নরনারীর প্রেমের সমস্ত 'মুড' প্রকাশ করেও রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের জন্য মানুষের ও মানুষের জন্য ঈশ্বরের অভিসার নিয়ে 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতিমাল্য' রচনা করতেন না। মদন যেন হর কোপানলে দগ্ধ। বহু পরে, 'পূরবী', 'মহুয়া', 'সানাই'-এর যুগে অতনু বীরের তনুতে তনু লাভ করেছিলেন।

একদা আমি লিখেছিলাম, "Where the Italian Renaissance preserved its triumphs in art, nineteenth century Bengal preserved its triumph in its spiritual saga from Rammohan to Rabindranath." ইতালীর র‍্যনেশাঁসে আধ্যাত্মিক দিক ছিল ভালোভাবেই—এবং মিকেলাঞ্জেলোর মহত্তম শিল্পসৃষ্টিকে প্রভাবিতও করেছিল। ভারতে জয়ী হয়েছে ঔপনিষদিক ভাবনা। এর মধ্যে এক প্রান্তে অদ্বৈত জ্ঞান, অন্য প্রান্তে দ্বৈতভক্তি। কিন্তু রামমোহন ও বিবেকানন্দের অদ্বৈত শঙ্করের মায়াবাদ মেনে সংসার ত্যাগ করেনি, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভক্তি মাধুর্যরসের বন্যায় ভেসে যায়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সংসারকে ঐহিক ভাবে সুখী করতে চেয়েছেন রামমোহন ও বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানাশ্রিত ভক্তি নিযুক্ত হয়েছে ব্যক্তি হতে বিশ্ব পর্যন্ত প্রসারিত প্রীতির উজ্জীবনে। পশ্চিমের বস্তুতন্ত্র, ভোগবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও উগ্র স্বাদেশিকতা থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু স্থাপন করেছিলেন বিবেকানন্দ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সেই সেতু বারবার পারাপার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অল্প কয়েকজন তাঁদের বুঝতে পেরেছিলেন—যেমন রোম্যাঁ রঁলা। সন্ন্যাস ও মানবপ্রেম যে পরস্পরবিরোধী নয়, কর্ম ও আনন্দ যে মিলতে পারে, একজাতির পূর্ণতম বিকাশেই যে বিবর্তন শেষ হয়ে যায় না, তার জন্য সব অনুন্নত (এমনকি আদিম) জাতির পূর্ণতম বিকাশও জরুরী—এ সব ইঙ্গিত ডায়োনিশিয় পশ্চিম তার 'ক্ষুদ্র আমি'র অহংকারে ও মারণাস্ত্রের প্রচণ্ডতার ঔদ্ধত্যে বুঝতে পারেনি।

তবে ইতালীয় র‍্যনেশাঁসের একটা বড় লক্ষণ—ইতিহাস সচেতনতা—রামমোহন থেকে লক্ষ্য করি। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের মত দেশে বহু ধর্মের সহাবস্থান ঘটেছে নানা কারণে। একটা দেশজ (autochthonus) পাললিক স্তরের ওপর বহিরাগত মানুষের বন্যা আরো অনেক ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনশৈলীর স্তর ফেলে গেছে। যাকে ইংরেজীতে বলি—palimsest—ভারতের মাটি তাই। যখন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জন্ম হয়নি, তখন তিনি এ সব ধর্ম ও সংস্কৃতির ভালো/মন্দ দিক তলিয়ে দেখেছিলেন। তিনি

বুঝেছিলেন—তিনটে বড় ধর্ম—হিন্দু, ইসলাম ও খৃস্টান—এর মধ্যে কিছু সর্বজনীন ও সর্বকালীন দিক আছে, কিছু নিতান্ত স্থানীয় ও সাময়িক। সেগুলি বাদ দিলেও ধর্মের মূল অধ্যাত্মশিক্ষা বিঘ্নিত হয় না, বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক সর্বমানবিক অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয়। রামমোহন স্থির করলেন—বিমূর্ত একেশ্বরবাদ সেই সামান্য ধর্ম। কি হিন্দু, কি ইসলাম, কি ইসাহি—সর্বত্র তা স্বীকৃত। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের ওপর শত শতাব্দীর টীকা ভাষ্যের জঞ্জাল জমে সত্য জানা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই এত মতবিরোধ। প্রত্যেক ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ মূলে পাঠ করে, আপন যুক্তি ও সহজবুদ্ধি প্রয়োগ করে, রামমোহন ধর্মের কেন্দ্রীয় সত্যে পৌঁছতে চাইলেন। তার জন্য শিখলেন হিব্রু, গ্রিক, আরবী। বাংলায় লিখলেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫); অনুবাদ করলেন উপনিষদ (কেন, ঈশ, কঠ, মাণ্ডুক্য ও মুণ্ডক)। অর্থাৎ নিলেন লুথার, এরাজমুজের ভূমিকা। একদিকে গোঁড়া ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ও ব্যাপটিস্টদের, অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু/বৈষ্ণবদের তর্কযুদ্ধে হারালেন। যুক্তিবাদী মুতাজালি ব্যাখ্যা ছাড়া ইসলামের অন্য ব্যাখ্যা তিনি নেননি।

যে ধর্মে তিনি উপনীত হলেন তাকে নিজেই নাম দেন 'বেদান্ত প্রতিপাদিত সত্য ধর্ম—সাধারণ্যে ব্রাহ্মধর্ম নামে যা পরিচিত।[১৪] ভিত্তিটা রইল বেদান্ত। কিন্তু শঙ্করের মত কট্টর অদ্বৈতবাদী তিনি নন। শারীরকভাষ্যে শঙ্কর সন্ন্যাসের ওপর জোর দিয়েছিলেন। রামমোহনের মনে হল, তা যুগের প্রয়োজনে অবান্তর ও মানবপ্রকৃতির বিরোধী। দ্বিতীয়ত, মায়াবাদ তিনি মেনে নেননি। এই সংসার (phenomena) যাদুকরের ইন্দ্রজাল নয়, তা ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ, অলীক নয়—অনির্বচনীয়। সংসার এবং গার্হস্থ্যধর্মকে স্বীকার করতে হবে। রামমোহন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু কুলার্ণব বা মহানির্বাণতন্ত্র থেকে পেয়েছিলেন তা নয়—এর আভাস বহু উপনিষদে মিলবে। তৃতীয়ত, ব্রহ্মাকে নির্গুণ বলাও ঠিক নয়। স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য, অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি বলে যিনি খ্যাত, তিনি বৃহদারণ্যকের ৩.৮.৮, ৯, ১১-তে অক্ষরকে নির্গুণ রূপে বর্ণনা করলেও ৪. ৪. ২২-এ তাঁকে সকলের প্রভু, জীবগণের রাজা ও রক্ষক, বিশ্বসমূহের 'বিবরণ' ইত্যাদি অভিধা দিচ্ছেন। ঈশোপনিষৎ আরম্ভই হচ্ছে—'ঈশাবাস্যমিদংসর্বং' শ্লোকে। সংসারকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছেন—'কুর্বেন্নেবেহ কর্মাণি জীজিবেষেৎ শতং সমা' শ্লোকে। চতুর্থত, কিন্তু সেই ঈশকে মূর্তি গড়ে বা পৌত্তলিক প্রথায় পূজা করা চলবে না। কেন উপনিষদ বারবার বলছেন—'নেদং যদিদং উপাসতে'। রামমোহন দু ধরনের উপাসনার ব্যবস্থা করলেন—(১) আত্মোপসনা। কঠের ভাষায়—ওঙ্কারকে ধনু, আত্মাকে শর, ব্রহ্মকে লক্ষ্য মনে করে ধ্যান করবে। (২) ইসলাম ও ইসাহি মতে—সমবেত (congregational) উপাসনা ও প্রার্থনা। এতে শ্রুতিপাঠ, স্তবগান, উপদেশ চলবে। পঞ্চমত, আত্মা ও পরমাত্মা অভেদ (অবশ্য স্বরূপত), তাই ব্যক্তি ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন গুরু বা অবতারের প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠত, ধর্মের সামাজিক লক্ষ্য হবে 'লোকশ্রেয়স্'—জনকল্যাণ, বেন্থামের ভাষায় social comfort. সব একত্র করলে এমন এক Universal theism-এ উপনীত হব, যা হিন্দুধর্মের সর্ব শাখা, ইসলাম, ইসাহিকে একসূত্রে বাঁধতে পারবে। ধর্মের ব্যাপারে এমন tour de force কেউ করেছেন কিনা জানিনা। নীতির ব্যাপারে খৃষ্টের উপদেশ Precepts of Jesus-এর প্রতি সম্যক গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন।

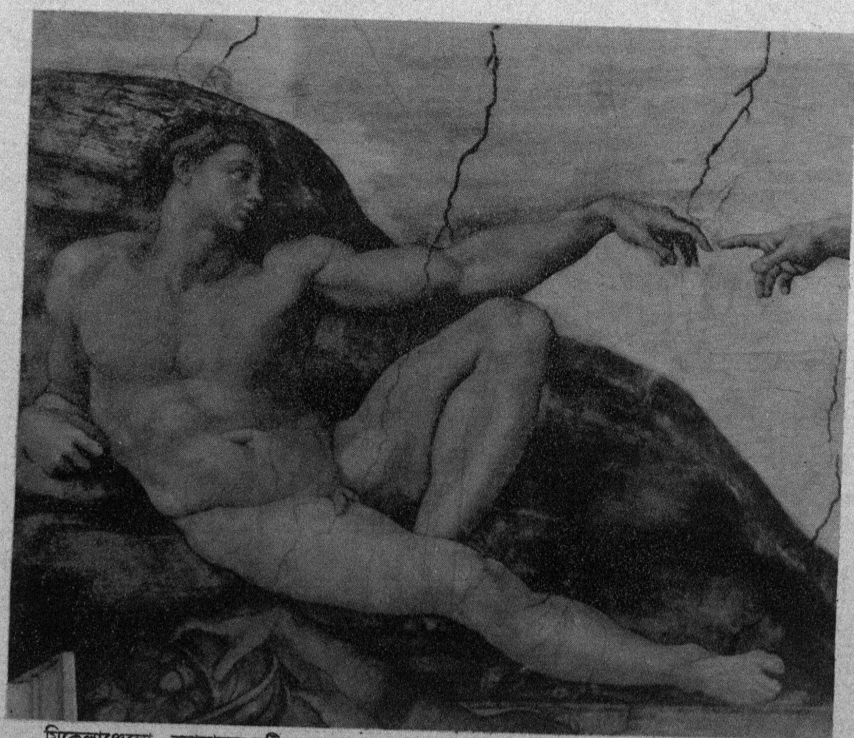
মূর্তি, অবতার, লীলা, গুরু সব বিসর্জন দিলেও খৃষ্টানদের Ex Nihilo creation বা

অসৎ থেকে সৃষ্টির মতবাদ তিনি মেনে নেননি। উপনিষদের ভাষায় বলেছেন, 'যথোর্ণনাভ সৃজতি গৃহ্নতি চ'। উর্ণনাভের মতই তিনি সৃজন করছেন ও তা নিজের মধ্যে গ্রহণ করছেন। A Supreme Being, Nature's God ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলেও, সৃষ্টির পর স্রষ্টা দ্রষ্টার ভূমিকায় চলে যান (ঘড়ি নির্মাতা যেমন ঘড়ি থেকে) এমন deist মতবাদ তিনি মানেননি। ঈশ্বর সৃজন, পালন ও লয়ের কর্তা এমন কথা তাঁর বহু ব্রহ্মসংগীতে শোনা যায়। ক্যালভিনিস্টদের মত ঈশ্বরের কৃপা বা নির্বাচন তত্ত্ব (doctrine of election)-এ তিনি বিশ্বাস করতেন না, গীতার মতই নিষ্কাম কর্মোদ্যোগকে গুরুত্ব দিতেন, বলে গেছেন তাঁর জীবনীগ্রন্থকার—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই চিন্তাধারায় মধ্যযুগীয় জড়ত্ব ও nostalgia-র কোন স্থান নেই। এ কর্মপ্রবণ, ভবিষ্যৎমুখী, যাকে বলে achievement-oriented. এমন আদর্শবাদ সে যুগের বুদ্ধিজীবীদের যে প্রেরণা দিয়েছিল তা বিবেকানন্দ পর্যন্ত প্রবহমান। হঠাৎ যেন মানুষে মানুষে, নারী পুরুষে ভেদরেখা মুছে গেল। এল এক ঐক্য উপলব্ধির আনন্দ, চিত্তশুদ্ধির প্রেরণা, মানবসেবায় আগ্রহ, সমাজসংস্কারে প্রবৃত্তি। এর অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম সংঘর্ষ, জাতিভেদ, সতীদাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি নিষ্ঠুর (এবং অবচীন) আচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। বুদ্ধিমানের মত তিনি প্রাচীন শাস্ত্র উদ্ধৃত করে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছেন (যেমন মনু থেকে সতীদাহের বিরদ্ধে, বজ্রসূচী থেকে জাতিভেদের বিরুদ্ধে)। ঐতিহ্য যদি সত্য ও মানবিক হয় তাকে আধুনিকীকরণের কাজে লাগাতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যাঁরা হুইজিঙ্গার Erasmus পড়েছেন, তাঁরা রামমোহন ও এরাজমুজের প্রকৃতির মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাবেন। তাঁকে কখনই secularism বা ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রবর্তক বা প্রবক্তা বলা যাবে না। তাঁর ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই হিন্দু কলেজের সেক্যুলার শিক্ষাদর্শের প্রতিবাদে নিজের বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সংগ্রামের জন্য তিনি গড়লেন 'আত্মীয় সভা' ও 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর মত প্রতিষ্ঠান, 'সম্বাদ কৌমুদী'র মত পত্রিকা ; অনুবাদ করলেন বেদান্ত ও উপনিষদ ; বের করলেন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ' (১৮১৮-১৯)-এর মত প্রচার পুস্তিকা। জনমত গঠনের জন্য বিচার বিতর্ক হল। শেষে রাজ দরবারে আবেদন। মনে রাখবে হবে, এ সবই আধুনিকতার লক্ষণ, ন্যায় নিয়ে মধ্যযুগীয় কচাকচি নয়। তখনকার দিনের অসংগঠিত বাংলা গদ্য তাঁর হাতে হয়ে দাঁড়াল প্রধান অস্ত্র। ডঃ সুশীল দে যাই বলুন, ফোর্ট উইলিয়ামের গদ্য থেকে তা অনেক বেশি জোরালো, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লেষাত্মক। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ও 'পথ্যপ্রদান'-এ সে গদ্য অনেক সাবলীল হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্ন স্বীকার করেছেন, তাঁর গান কবি গানের সব গ্রাম্যতা ও কুরুচি পরিত্যাগ করে পাষাণ হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল। ধ্রুপদাঙ্গের 'ভাবো সেই একে' কিংবা 'ওহে পথিকগণ'-এর অভ্রভেদী গাম্ভীর্য মহৎ অধ্যাত্মচিন্তার যোগ্য বাহন।

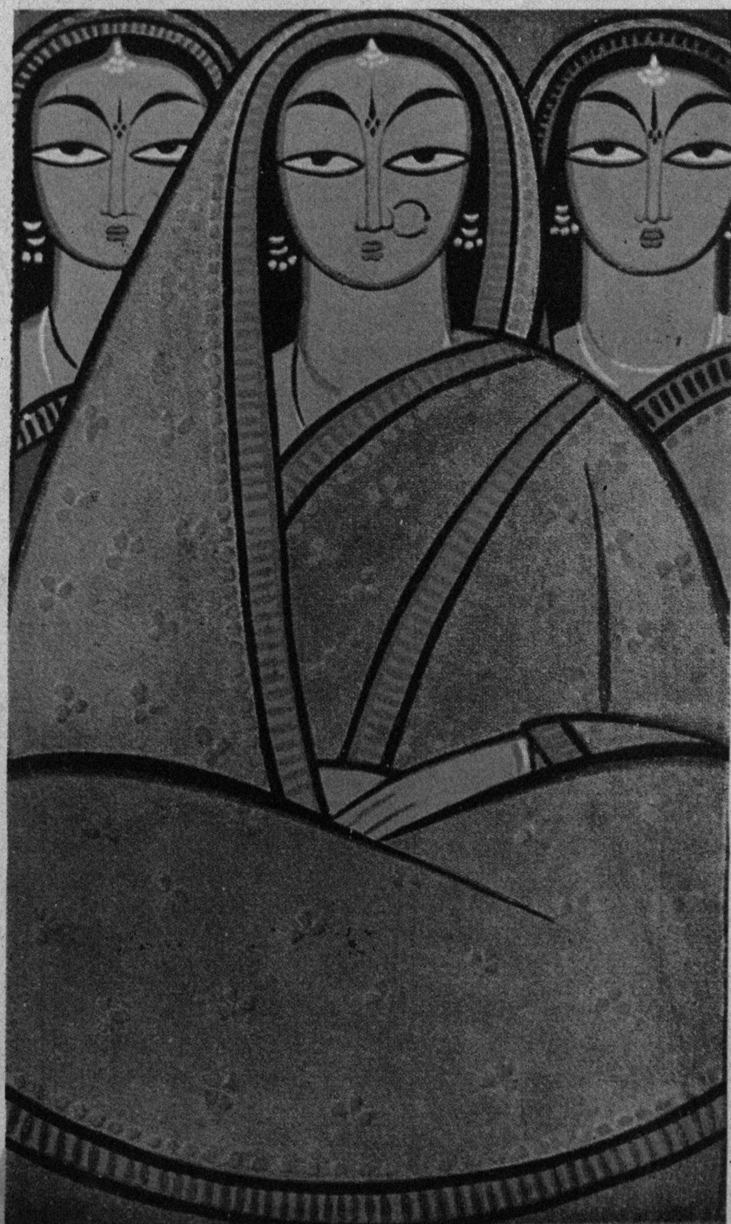
বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎ তিনি। 'সম্বাদ কৌমুদী'তে লেখা বিজ্ঞান প্রবন্ধ ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অ্যামহার্স্টকে লেখা চিঠি (১৮২৩) তার প্রমাণ। ইংরেজ শাসনের দুটো সুফল তিনি লক্ষ্য করেছিলেন : (১) পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, (২) নয়া প্রযুক্তি ও বিদেশী মূলধনের সাহায্যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর জন্য চাই ইঙ্গ-ভারতীয় সহযোগিতা। যাঁরা তাঁর নীলচাষ বিস্তার সমর্থনে ঘোর আপত্তি জানান, তাঁরা আজও দেশী-বিদেশী সহযোগিতায় শিল্পবিস্তারে আপত্তি জানাচ্ছেন। অনেকে প্রশ্ন



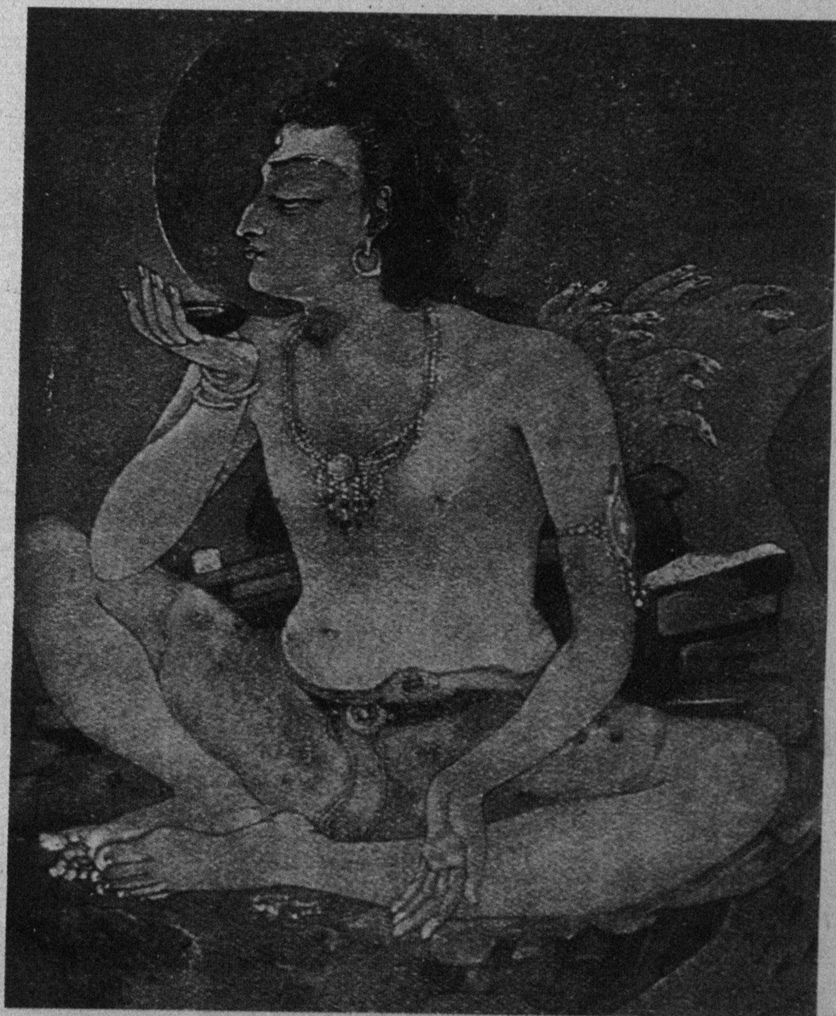
মিকেলাঞ্জেলো : অ্যাডামের সৃষ্টি। ১৫০৮-১২।



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতমাতা



যামিনী রায়



নন্দলালের 'শিবের বিষপান'। নিবেদিতার 'মিথস্' বইয়ের জন্য অঙ্কিত।



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অভিসারিকা

করেছেন, কেন তিনি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেননি। প্রশ্নটার কালানৌচিত্য দোষ রয়েছে মনে রেখেও উত্তর দেওয়া যায়—বিদেশী শাসন তিনি বিনা সর্তে সমর্থনও করেননি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, জুরি নোটিফিকেশন প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি বিরোধিতাই করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, লকের মত প্রাকৃতিক অধিকারে এবং মঁতেস্কুর মত শাসন ও বিচার বিভাগ বিভাজনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লব এবং ১৮৩২ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচন প্রথা সংস্কারের পক্ষ নিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তিনিও (অবশ্য শনৈঃ শনৈঃ) গণতন্ত্রের পক্ষে আসতে চান। পার্লামেন্টের কাছে ১৮৩২-এর প্রতিবেদনে প্রজাদের (এমনকি খুদকস্ত) ওপর কি বিষম খাজনার ভার চাপানো হচ্ছে তা বর্ণনা করেন। দু-একজন তাঁকে ওয়েন-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রের সমর্থকরূপেও দেখাতে চেয়েছেন। অতদূর হয়ত যাওয়া যাবে না—তবে নারীজাতির সম্পত্তিতে অধিকার ঘোষণা ত' সাম্যের দিকে একটা বড়ো পদক্ষেপ। মোটকথা, ইংরেজ শাসন, তাঁর মতে, আপতিক, চিরন্তন নয়। কালক্রমে ভারতও স্বশাসনের যোগ্যতা অর্জন করবে এমন আশা তাঁর ছিল। আর যাই হোক, র‍্যানেশাঁসের মানববাদী বা মোর ও এরাজমুজের মত একটা ক্ল্যাসিক্যাল স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য তৈরি করে সত্যকার দুঃখ-দুর্দশা, বর্বর সংস্কার, মূঢ় আচার ভুলে থাকতে চাননি তিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মৃতযুগের মন্ত্র জপ করা' ভারতবর্ষকে তিনি শুনিয়েছিলেন নতুন যুগের বাণী—ব্রাত্যস্ত্বংপ্রাণ—হে প্রাণ, তুমি জঙ্গম, তুমি চলো।

৩

রামমোহন যে শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন হিন্দু কলেজ ও পাঠশালা তার সবটা গ্রহণ করেনি। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার অনুযায়ী ভারতীয়দের শিক্ষা দেবার জন্য যে লাখ টাকা বরাদ্দ হয় তার উদ্দেশ্য (১) সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উৎসাহদান এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষণ, (২) বিভিন্ন বিজ্ঞানে শিক্ষাদান। এ বিষয়ে তিনটি প্রস্তাব আসে। জন সেক্সপীয়র প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ওপর জোর দেন। বাংলার ৮৪৬টি থানায় প্রত্যেকটিতে একটি করে শিক্ষক নিযুক্ত হবে, ৩৯টি জেলা সদরে দুজন করে, এবং প্রাদেশিক আপীল ও সারকিট আদালত যে ছটি স্থানে বসে তার প্রত্যেকটিতে ছজন করে। কলকাতায় থাকবে এক 'বোর্ড অব করেসপন্ডেন্স অ্যান্ড জেনারেল কনট্রোল'। উইলিয়াম কেরীর প্রস্তাবে জোর দেওয়া হয় দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার ওপর। যদি তাতে বেশি ব্যয় হয়, তবে প্রধান নগরীগুলিতে স্কুল স্থাপনা করা হ'ক অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এক নতুন বিভাগ খুলে ভারতীয়দের গণিত, প্রাণীবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শেখান হ'ক। কোলব্রুককে অনুসরণ করে হ্যারিংটন তৃতীয় প্রস্তাব দেন যে (ডানকান-প্রতিষ্ঠিত) বারানসীর হিন্দু কলেজ-কে সংস্কার করা হ'ক এবং নদীয়া ও ত্রিহুতে অনুরূপ কলেজ স্থাপিত হ'ক। সঙ্গে সঙ্গে চাই কলকাতা মাদ্রাসার সংস্কার ও ভাগলপুর এবং জৌনপুরে অনুরূপ মাদ্রাসা স্থাপন। ইংরেজী জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারের জন্য ইংরেজী বা দেশীয় ভাষার মাধ্যমে আলাদা স্কুল খোলার দরকার নেই বরং সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়াবার যে পুরোনো ব্যবস্থা রয়েছে তার সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার কলম জুড়ে দেওয়া হ'ক। পরে দেখব, হ্যারিংটন উইলসন সাহেবের পরিবর্তিত ওরিয়েন্টালিস্ট অবস্থান নিয়েছেন (যার ফল ফলবে সংস্কৃত

কলেজে)। তা ছাড়াও তিনি ইওরোপীয় পুস্তক আরবী, সংস্কৃত ও দেশজভাষায় অনুবাদ করার প্রস্তাব দেন।[১৬]

এসব কিছুই হলো না। ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহনের আত্মীয় সভার এক অধিবেশনে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সদস্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় তা নিয়ে গেলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের কাছে (১৮১৬ সালের মে মাসের প্রথমে)। ইস্ট নিজের বাড়িতে এক সভা ডাকলেন যাতে পঞ্চাশের বেশি ধনী ও গণ্যমান্য হিন্দু এবং বেশ কিছু পণ্ডিত উপস্থিত হলেন (১৪ মে, ১৮১৬)। সেখানেই স্থির হল এক কলেজ স্থাপিত হবে এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা তখুনি উঠল। ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল। বাকিংহ্যামশায়ার-কে লেখা হাইড ইস্টের চিঠিতে গণ্যমান্য হিন্দু পণ্ডিতদের কথা ছিল কিন্তু হেয়ার বা রামমোহন অনুল্লিখিত।[১৭] একটা কথা পরিষ্কার। হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা হিন্দুদের। তদনুসারে অর্থও তাঁরা দিয়েছেন। কলেজ চার্টারের ৩৪টি ধারা তাঁরই ছকেছেন। পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, পাইকপাড়ার সিংহরা। এঁরা তাঁদের সন্তানদের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, সাহেব বানাতে নয়। শিক্ষণীয় ভাষার মধ্যে প্রধানতম ছিল ইংরেজী, তারপর বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সী। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হত ইংরেজীতে। এ যেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপূরক: প্রথমটাতে সাহের সিভিলিয়ানদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে দীক্ষা (acculturation) দেওয়া হবে, দ্বিতীয়টাতে ভারতীয় অভিজাত/মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে দীক্ষা।

ব্যাপারটা অত সহজ হল না হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর মত শিক্ষকের আবির্ভাবে। বহু দিন ধরে ডিরোজিও সম্পর্কে অনেক মিথ চলে আছে। ধীরে ধীরে তার জট ছাড়িয়ে বোঝানো দরকার ঠিক কি পরিস্থিতে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা কি ভাবে কতটুকু সে শিক্ষা কাজে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মনে রাখতে হবে ডিরোজিও'র ওপর পড়েছিল অষ্টাদশ শতকের চিন্তাধারা (যাকে Enlightenment, Aufklarung ইত্যাদি বলা হয়)-র শেষ রক্তিম ছটা। তাতে সর্বজনীন ও যুক্তিবাদী ক্লাসিক্যাল এবং সীমাবদ্ধ ও আবেগপ্রবণ রোমান্টিক—উভয় বিশ্ববীক্ষাই যুগপৎ বিদ্যমান। সপ্তদশ শতকে ইংরেজ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে ফরাসীরা জ্ঞানবিজ্ঞান ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিল। বস্তুত লক ও নিউটনের এই চিন্তাধারাকে ভলতেয়র ইওরোপে প্রচার করেছিলেন। অন্য ধারাটি মুখ্যত অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ফ্রান্সে জন্ম নিয়েছিল। এতে প্রচারিত হয়েছিল আবেগের (emotion, feelings) ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী, এমনকি স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের অধিকার। এর প্রবর্তক ছিলেন রুশো। এতদুভয় বিশ্ববীক্ষা প্রায় একই সঙ্গে ভারতে এসেছিল এবং ডিরোজিও ছিলেন তাদের প্রধান মুখপাত্র। ফরাসী বিপ্লবের পীঠস্থান থেকে বহু সহস্র যোজন দূরে থেকেও তিনি নিজেকে বৈপ্লবিক চিন্তায় উত্তেজিত করেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন এক brave, new world-এর, এবং সে স্বপ্ন সঞ্চারিত করেছিলেন কিছু চরিত্রে অপরিণত কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় তীক্ষ্ণ তরুণের মধ্যে, যাদের কাছে পারিবারিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভুললে চলবে না, generation gap, generation war সব যুগেই ঘটতে পারে। সে যুগেও ঘটেছিল।

অবশ্যই ডিরজিও'র বাগ্মিতায় প্রবুদ্ধ হয়ে তারা নিজ নিজ পরিবেশ থেকে

বেকন-কথিত 'idola' বা মূঢ় ও মন্দ সংস্কারের সব ঝুল ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ডিরোজিওকে এতটা বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী করা ঠিক হবে না। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছিল, তা একদা সোক্রাতেসের বিরুদ্ধেও আসে—'Corruption of Youth'. কিন্তু তার উত্তরে তিনি উইলসনকে যেন চিঠি লেখেন তাতে স্পষ্ট যে ছাত্রদের তিনি শুধু হিউমের ঈশ্বর-বিরোধী পাঠ দেননি, সঙ্গে সঙ্গে ডঃ রিড ও ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের প্রতিবাদের কথাও জানিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—স্বাধীন ভাবে বিতর্ক ও বিচারের ফলে শিষ্যেরা যেন একটা যুক্তিযুক্ত সমাধানে আসে। মুশকিল হল এই যে নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যকে না জানলে নবীন বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে কি করে তার তুলনা সম্ভব ? বা সম্ভব জানা—কোনটার কতটুকু গ্রহণীয় বা বর্জনীয় ? কি ডিরোজিও কি তাঁর শিষ্যবর্গ (কৃষ্ণমোহন ব্যতিক্রম হতেও পারেন, কিন্তু যৌবনে কতটা সংস্কৃত তিনি জানতেন ?) প্রাচীন ঐতিহ্যে প্রবেশের ভাষা—সংস্কৃতে—অজ্ঞ ছিলেন। অতএব নতুন ভাবের বন্যায় ভেসে গিয়ে তাঁরা শাস্ত্র বলতেই মনে করলেন অযৌক্তিকতা, সংস্কার মাত্রেই—অমানবিক এবং দেবদেবীরা—মৃত অতীতের কাল্পনিক 'টোটেম' মাত্র। ভালোমন্দ বিচার (ethics)-এর ব্যাপারেও তাঁরা লকের sensational psychology ও বেন্থামের utilitarianism নির্বিচার প্রয়োগ করে বুঝলেন—সবই মানুষের সুখ বা দুঃখের প্রতিফলন—অর্থাৎ নীতির কোন চিরন্তন ও সর্বজনীন ভিত্তি নেই। ডিরোজিও নিজে কোন ডগমায় বিশ্বাস করতেন না ঠিকই। ছাত্রদের মধ্যেও তিনি নিজের উচ্চ নৈতিক আদর্শ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অপরিণত মানসে হিউমের সংশয়বাদ বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।[১৮] হিউম-ই বলেছিলেন, আত্মা থাকতে পারে কিন্তু আমরা তা আছে কিনা জানতে পারি না ; (২) কারণ ও কার্যে কোন ন্যায়সিদ্ধ সম্পর্ক নেই, এমনকি কারণকার্য সম্পর্কে আমাদের ধারণাও নিশ্চিত নয়। এমন ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াতীত, অসীম, অনন্ত ব্রহ্মের কি হবে ? ঈশ্বরকেই বা সর্বোচ্চ বা প্রথম কারণ বলা যাবে কি করে ? কর্মফলেই বা বিশ্বাস করব কেন ? কি করে জানব যে এক ধরনের কাজের ফল ভাল, অন্যটার মন্দ ? কিন্তু কোন ধর্মকেই তাহলে সমর্থন করা যায় না। নীতির ব্যাপারেও কি শুধু empirical success-কে মাপকাঠি হিসাবে মেনে নিতে হবে ? হিউমের চোখে কোনটায় সুবিধে হবে সে বিষয়ে সাধারণের মতই নীতির ভিত্তি—এ মত ত' হব্‌সের 'জঙ্গলের নীতি' থেকে খুব আলাদা নয়। বস্তুত এ সব ভেবেই ছাত্রদের অভিভাবকেরা ডিরোজিওকে সরাতে চেয়েছিলেন, তিনি দুর্নীতি শেখাচ্ছেন বলে নয়।[১৯] লক্ষ্য করতে হবে যে শুধু হিন্দু নয়, ব্রাহ্মধর্মেও ডিরোজিও অনেক পরস্পর বিরোধিতা পেয়েছিলেন।[২০] 'এনকোয়ারার' পত্রিকার সম্পাদক (ডিরোজিও-শিষ্য) কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের মতামত ধোঁয়াটে, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যহীন মনে করতেন। অন্য শিষ্যরা রামমোহনের অনুচরদের 'trimmers' বা সুবিধাবাদী ভাবতেন—"ধর্মান্ধদের সামনে ধর্মান্ধ, আবার উদারপন্থীদের সামনে উদারপন্থী"।[২১] রামমোহনের দল চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের সংস্কার, ডিরোজিওর শিষ্যরা—হিন্দু ধর্ম প্রত্যাখ্যান।

কিন্তু হিউম আবার রাজনীতিতে রক্ষণশীল টোরী ছিলেন, ডিরোজিও—বিপ্লববাদী। সেজন্য হিউম পড়ানর সঙ্গে সঙ্গে টম পেইনও তিনি পড়াতেন। পেইনের মতে রাজনৈতিক কোন প্রতিষ্ঠানই তর্কাতীত নয়। প্রত্যেক প্রজন্ম ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে যুগধর্মানুযায়ী তার সংস্কার করবে। এখানেই উঠল রুশোর সামাজিক চুক্তির কথা, যা হবসের বা লকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যুক্তির স্থানে বসল হৃদয়াবেগ। সার্বভৌমত্ব

ব্যক্তির নয়, জনগণের। এখন 'জেনারেল উইল' যদি ভোট দিয়ে স্থির হয়, তবে তার পরিণাম—গণতন্ত্র, কিন্তু যদি তার অর্থ হয় নির্বস্তুক ন্যায় ও সাম্য—তাহলে 'পুণ্যের রাজত্বে'র নামে রোব্‌স্‌পিয়েরীয় স্বৈরতন্ত্র অনিবার্য।[২২] Reign of Terror না হোক—anarchy.

অবশ্যই হিন্দুকলেজের ছাত্ররা এমন সব উল্টোপাল্টা কথা শুনে পুরো বিভ্রান্ত হল। যুক্তি না আবেগ? খৃষ্টীয় নীতি না সুবিধাবাদী নীতি? গণতন্ত্র না 'পুণ্যের রাজত্ব'? ক্লাসিসিজম না রোমান্টিসিজম? ডিইজম্ না এথিজম্? এক সঙ্গে এত রকম উত্তেজক সুরা মিশিয়ে তাদের মগজে ঢালা হল যে তারা চিন্তার শুদ্ধতা, মনের স্থৈর্য্য, ব্যবহারের শালীনতা—কোনটাই বজায় রাখতে পারল না। পশ্চিমের যা প্রধান অবদান তা, গি মেত্রো (Guy Metraux)-র ভাষায়—"New forms of political organization, new bases for economic activity, new social clases, new ways of life which removed traditional societies from the patterns which had been their's for centuries." কিন্তু এ ত' কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পবিপ্লব, উদারতন্ত্রী বুর্জোয়াশ্রেণী, বহু শত বৎসরের গণতান্ত্রিক বিবর্তন, র‍্যনেশাঁস থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত চিন্তার উদ্বর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। ভারতের ঔপনিবেশিক (পরাধীন) অর্থনীতি ও বৈদেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য আইডিয়া বিমূর্তই থাকবে, বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারবে না। কোথায় প্রতিযোগিতা, চুক্তির প্রাধান্য, সকল নাগরিকের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য আইন ও বিচার, সকল না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসন? অতএব, পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে, পশ্চিম থেকে ধার করে আনা ধারণা, অ্যালিসের আজব দেশের আয়নাতে বিকৃত ভাবে দেখা দিল। মেকলে যা চেয়েছিলেন তার অনেকটাই হল—অর্থাৎ সাহেবী বেশভূষা, খাদ্য পানীয় (বিশেষ করে পানীয়), ইংরেজী বুকনি ও চালচলন—কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলেই পুরনো সংস্কার, রেষারেষি, দলাদলি, বাড়াবাড়ি। ডিরোজিওর শিষ্যরা, এবং তারপর 'ইয়ং বেঙ্গল' নামধেয় অনুকারী শ্রেণী, মিল্টন সিংগার যাকে 'cultural brokers' বলেছেন, তা হতে পারল না। ১৮২৮ সালের 'দ্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন', ১৮৩৮ সালের 'সোসাইটি ফর দ্য অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' ত' সেইন নদীর ধারের সালোঁ নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মতিলাল শীলরা ত' ফরাসী বুর্জোয়া নন, যে গঙ্গায় আগুন ধরে যাবে! বুদ্ধিরাজ্যে এই উদ্বাস্তুদের শেকড় ছিল না বলেই বিচ্ছিন্নতার বিষাদ তারা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে গোমাংসভক্ষণে (বা 'আমরা গরু খাই গো' বলে গোলদিঘী পরিক্রমায়), বোতল বোতল বীয়ার (পরে স্কচ) পানে, মনুমেন্টের ওপর ত্রিবর্ণ পতাকা তুলে, স্ববিরোধী কাজে বা নৈষ্কর্ম্যে এবং, শেষে, আত্ম-বিলাপে। আরো খারাপ, কেউ কেউ অ্যালেকজান্ডার ডাফের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে খৃষ্টানও হয়ে গেল।[২৩] কৃষ্ণমোহন ঘোষণা করলেন, "We have attacked Hinduism and will preserve in attacking it until we seal our triumph." কিন্তু তাঁর ভেরী নাদে কোন জেরিকোর প্রাচীর ধূলিসাৎ হল না। মাঝখান থেকে কিছুটা আপোষের জন্য তৈরি রক্ষণশীল দল আরো রক্ষণশীল হল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে ঢেলে সাজালেন (পরে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করলেন), র‍্যাডিক্যাল ইন্ডিয়া গেজেট ধিক্কার দিল, এমনকি ডিরোজিও-শিষ্যদের মধ্যেও দেখা দিল মতানৈক্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও) ব্রাহ্মণদের ভারতের পতনের জন্য দায়ী করলেন আর কায়স্থ কালীপ্রসাদ ঘোষ সেই ব্রাহ্মণদের সমর্থন করলেন। এই দুরবস্থা

দেখে স্যার এডোয়ার্ড রিয়ান বেন্টিঙ্ককে অনুরোধ করলেন—ওদের চাকুরি দিয়ে ঠাণ্ডা করা হ'ক।[২৪] বেন্টিঙ্ক এদের জন্যই সৃষ্টি করলেন ডেপুটি কলেক্টর ও মুনসেফের পদ।

তবে সংস্কৃতির ইতিহাসে এঁদের অবদান নেই মনে করলে ভুল হবে। পশ্চিমী র‍্যাডিক্যাল চিন্তায় অবগাহন করে ব্রিটিশ শাসন ও ঔপনিবেশিকবাদের কুটিল নিষ্ঠুর মুখ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আইন প্রণয়ণে ভারতীয়দের অনধিকার, সমস্ত বড়ো ও মাঝারি চাকুরিতে শ্বেতাঙ্গের একচেটিয়া নিয়োগ, বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব (১৮৩৩ সাল পর্যন্ত), বিচার বিভাগের ব্যয় ও বিলম্ব (সেক্‌সপীয়র বলেছেন—'the law's delay' এবং কে না পড়েছেন হ্যামলেট?) দেশ থেকে ধননিষ্কাশন, বিপুল করভার—তাঁদের নজর এড়ায়নি। কেউ কেউ, রামমোহনকে অনুসরণ করে, নীলচাষ বিস্তার সমর্থন করেছেন (যাতে বিদেশীরা মূলধন নিয়ে আসে); কিন্তু কেউ কেউ তা করেননি। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের হয়ে নালিশ করতে বাধেনি তাঁদের। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার চেয়েছেন সবাই। বিধবাবিবাহ ও জাতিভেদ বিলোপ সমর্থন করেছেন তাঁরা—তবে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার না করে (কারণ শাস্ত্র মাত্রেই অযৌক্তিক)। দৃষ্টিভঙ্গির এসব পরিবর্তন অবশ্যই একটা আধুনিকতার বাতাবরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। আরো করত, যদি না প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রবলভাবে তাঁরা রক্ষণশীল শিবিরকে আক্রমণ করতেন।[২৫]

অথচ শিল্পসৃষ্টিতে তাঁদেরই প্রায় সমকালীন একজন অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন—মধুসূদন দত্ত। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার কোন যোগ ছিল না, কবিয়ালের ঐতিহ্য তিনি কিছু কিছু বদলেছিলেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৈশোরের এই পৃষ্ঠপোষককে উচ্চপ্রশংসা করলেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না।" এই পৃথিবীর অতি পার্থিব কবি ছিলেন তিনি, তাঁর কোন স্বপ্ন বা দূরদর্শী বীক্ষণ শক্তি ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিমের নানা সংঘাতের তাৎপর্য না বুঝে বিভ্রান্ত, কখনও বা বিপথগামীদের, নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। মেকিসাহেব যেমন, 'নস্যলোসা দধি চোষা' পণ্ডিতরাও তেমনি তার বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ হয়েছেন। তবে অপরিসীম দারিদ্র্য থেকে বেনিয়ান-বাবুদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার কঠিন পরিশ্রম এবং স্পষ্ট বা তির্যক অবহেলা বিদ্রূপের রূপ নিতে পারে। কুরুচি তাঁর স্বভাবগত নয়, পরিবেশগত। তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক কবিতার বাহুল্য, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, নির্ভেজাল দেশপ্রেম, আধুনিকদের 'বিবিজান' 'বিধুমুখী' বলে পরিহাস করেও স্ত্রী শিক্ষাবিস্তার সমর্থন—যথেষ্ট প্রমাণ।

মধুসূদনের বহুভাষী বহুপাঠী মন ও উন্নাসিক রুচি ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাকে 'মেছুনির ভাষা' আখ্যা দিয়েছিল। এমন একঘেয়ে ছন্দ ও কবি-আখড়াই মার্কা অলঙ্কার তিনি অসহ্য মনে করতেন। তিনি চেয়েছিলেন মহৎ কবি হতে এবং তাও আবার পাশ্চাত্য তুলাদণ্ডে ওজন করা মহাকবি। শামসুর রাহমানের ভাষায়, 'প্রাদেশিক জলভূমি ছেড়ে' দূর সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছিলেন তিনি—'রক্তে নাচে মায়াবী য়ুরোপ।' 'Above all Greek, above all Roman' শব্দবন্ধে এক গৌরীশৃঙ্গে আরোহণের উচ্চাশা ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর

প্রথম নাটক—'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) সংস্কৃত সাহিত্যের দাসসুলভ অনুকরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। তাঁর দ্বিতীয় নাটক—'পদ্মাবতী' (১৮৬০) শুধু যে 'মিঃ বিশ্বনাথ ও তাঁর সাহিত্য দর্পণ"-এর নির্দেশ অমান্য করেছিল তা নয়, প্রথম অঙ্কটাই "the Greek story of the golden apple indianised". তৃতীয় নাটক—'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) তাঁর নিজেরই ভালো লাগেনি। তিনি জানতেন—ধনদাস ইয়াগো নয়, আর মদনিকা বড় বেশি রোজালিন্ড বা ভায়োলার মত (শুধু শাড়ি পরা), কৃষ্ণকুমারী কোন সেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির নায়িকার কাছেও যেতে পারেনি। আমাদের কাছে সে সময়কার প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আজও জীবিত হয়ে আছে। বৃদ্ধ বাঙালীর কামুকতা (যাতে 'বিদ্যসুন্দর' ছাপ ফেলেছে—'মদন আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ' ইত্যাদি গানে) আর নব্য বাঙালীরা পরানুকরণ—উভয়ই হাস্যকর হয়ে থাকল।

কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হবার লোক ছিলেন না মধুসূদন। সহজাত সাহিত্যিক বোধ বলছিল—পূর্ব ও পশ্চিমের সামাজিক পরিবেশ এত পৃথক যে এদেশে সেক্সপীয়রীয় নাটক লেখা অসম্ভব। ১৮৬০-এর ১৫ মে রাজনারায়ণকে লিখছেন, "Alas! for the drama. But this is not the age for drama to flourish. We want the public to be attuned to the melody of the Blank verse." তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষরের পরীক্ষা শেষ করেই তিনি ধরলেন মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)। বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব ঘটে গেল। বাংলার নিরুত্তাপ নিস্তরঙ্গ উপকূলে এ যে গম্ভীরনাদী বারিধির গর্জন! শামসুর রাহমানের ভাষায়—

তোমার অমিত্রাক্ষর সমুদ্রের সুনীল কল্লোল
....
তোমার অমিত্রাক্ষর ধাবমান স্বপ্ন অশ্বদল
তোমার অমিত্রাক্ষর উন্মথিত উনিশ শতক

এত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৬)-এর মত বায়রণ, স্কট, মুরের স্বদেশী সংস্করণ নয়; এ হোমর, ভার্জিল, তাসো, মিল্টনের আঙ্গিক, চিত্রকল্প, কাহিনীর সঙ্গে বাল্মীকির কাহিনী, মিল্টনের organ voice-এর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি মিশিয়ে এক বিশাল, বহুতল স্থাপত্য! এমন tour de force বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম—হয়তো সেই শেষ।

কিন্তু ধর্মে খৃষ্টান হলেও এবং ছন্দে blank verse নিলেও তিনি মিল্টনের মত কোনো Paradise Lost রচনা করতে চাননি। স্বর্গ, মর্ত, নরক নিয়ে তাঁর কারবার, কিন্তু ঈশ্বর ও শয়তানের সংগ্রাম, মানবের পতন ও পুনরুদ্ধার—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয় নয়। এখানে জয়ী হয়েছে গ্রিক মানবতাবাদ। মোহিতলাল মজুমদার 'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে লিখছেন, "তাহার সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিত জীবন ধর্মের অনুধ্যানে তিনি (মধুসূদন) নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন...এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা মানব প্রকৃতির আদি ধর্ম; যাহা শাস্ত্রবিধি অপেক্ষাও সত্য ও বলবান, ...বীর্যে ও জীবনাবেগে যাহা মহিমময়, এবং পরিপূর্ণ বিকাশের পরে কালের নির্মম কুঠারাঘাতে যাহা করুণ।"[২৬] কিন্তু শুধু হোমর নয়, ভার্জিলের রোমক সাম্রাজ্যের জন্য গর্ব স্বর্ণলঙ্কা বর্ণনায় ফুটেছে। আর পরাজয়ের মধ্যেও মেঘনাদের অপরাজেয় আত্মসম্ভ্রমে গ্রিক ট্র্যাজেডির ছায়া। রাম এখানে বিষ্ণুর অবতার নন, রাবণ নন

অনার্য রাক্ষস। উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ। শুধু রাবণ স্বভাবানুযায়ী পথ নেন, আবার পুত্র শোকে প্রকাশ্য সভায় কেঁদে আকুল হন ; অন্যদিকে রাম প্রতিপদে ন্যায় অন্যায় বিচার করে চলেন আবার প্রমীলার দূতীর সামনেও কম্পমান, লক্ষ্মণকে বিদায় দেবার সময় শোকাকুল, এমনকি সীতা উদ্ধারের সঙ্কল্প বিসর্জন দিতেও রাজি (ষষ্ঠসর্গ)। কে বলবে তিনি বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' ? রাম ও রাবণের ঐতিহ্য-সম্মিত আদর্শ উল্টে দিয়ে মধুসূদন ঐতিহ্যকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। মিল্টনের সঙ্গেও অমিল। যুদ্ধটা এখানে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে হচ্ছে না।

মনে হয় বিদেশী ঐতিহ্যের কিছু গ্রহণ, কিছু বর্জন করে একটা সমঝোতা চেয়েছিলেন তিনি—যাতে কাব্য একটা নতুন পথ পায়, আমাদের মরচে পড়া অনুভূতি—একটা নতুন উন্মাদনা। তাই দেখি ভারতীয় পুরাণের দেবদেবীরা অলিম্পাসবাসীদের মতই ষড়যন্ত্র করছেন, পার্বতী জুনোর মত ও প্রমীলা (তাসোর) ক্লোরিন্ডার মত আচরণ করছেন, ইন্দ্রজিতের চিতায় (হেক্টরের চিতার অনুকরণে) সুরা ঢালা হচ্ছে। আবার সীতাকে ত' কেউ বিদেশিনী বলে ভুল করবে না, তাঁর মধ্যে যে জাহ্নবী দেবীর কোমল করুণ ছায়া। রাবণ বারবার ভারতীয়দের মতই বলছেন, "গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?"

কেউ কেউ বলছেন, মধু রাবণকে (ইংরেজদের মত) এক দুর্বার শক্তির প্রতীক রূপে দেখাতে চেয়েছেন, যিনি ভিক্ষুকের ত্যাগ ও প্রবীণের সংযমে বিশ্বাস করেন না, নিজের ইচ্ছাকে সমস্ত নীতির ওপরে স্থান দেন। মধু নিজেও কি হতে চেয়েছিলেন এমনি এক শক্তি, এমনি এক চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্যের সমন্বয় ? কেউ কেউ বলছেন, রাবণ ও মেঘনাদ তদানীন্তন পরাধীন ভারতের সদ্যোজাত জাতীয় চেতনার প্রতীক। মেঘনাদের অন্তিম ভাষণে (বিভীষণের প্রতি ভর্ৎসনায়) তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু এমনও ত' হতে পারে যে রাবণ তাঁরই ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ট্র্যাজেডির প্রতীক ? 'মেঘনাদবধ'-এর স্ববিরোধিতা কি আসেনি মধুসূদনের স্বপ্নের ইওরোপ (হোমর, সেক্‌সপীয়র, মিল্টনের ইওরোপ) ও বাস্তব ইওরোপ (সাম্রাজ্যবাদ, ল্যাংকাশিয়ার বস্ত্র, ম্যাক্সিম গান ও অনৈতিকতার ইওরোপ)-এর দুস্তর পার্থক্য থেকে ?

কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বাহ্য। তাঁর মধ্যেই রোমান্টিক স্বভাব ও ক্লাসিক রুচির বিরোধ ছিল। আগেই দেখিয়েছি, ইওরোপে এই দুই আন্দোলন পর পর এসেছিল, ভারতে এক সঙ্গে। তাই ইওরোপে ড্রাইডেন, পোপ, জনসন-রা চলে গেলে শেলী, কীটস্, বায়রনদের আসতে অসুবিধা হয়নি। গীতিকবিতাই ছিল মধুসূদনের স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি, অথচ তিনি নিয়েছেন মহাকাব্যের ফর্ম। অবশ্যই তাঁর বিরাট কল্পনা গীতিকবিতার ঠুনকো আঙ্গিক ধারণ করতে পারত না। কিন্তু বাঙালী কবির প্রকৃতিগত প্রবণতা (এবং যুগ প্রবণতা) কি করে এপিক বা ক্লাসিকের সঙ্গে খাপ খাবে ? উপরন্তু হোমর, ভার্জিল, মিল্টনের এপিক যে বাল্মীকি ও ব্যাসের এপিক থেকে মূলত পৃথক। দ্বিতীয়ত মধুসূদনের অশান্ত ও দুরন্ত, চঞ্চল ও অতৃপ্ত আত্মা ঠিক উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, শব্দ, ধ্বনির জন্য অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা' ও শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মধ্যে ঠিক দু বছরের ব্যবধান। 'কবিকাহিনী' রচনার পর 'সোনার তরী'র জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঢের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সন্দেহ নেই, পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে বাংলা কাব্যকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন, তার সীমাবদ্ধ জগৎকে দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত বিপুল বিস্তার। কিন্তু শুধু মিল্টনের মডেল তিনি নেননি, পুনরুদ্ধার করেছিলেন সংস্কৃত শব্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সবচেয়ে

বড়ো কথা, বাঙালীর কথ্য ভাষার ছন্দ বিদেশী অলঙ্কারের শিঞ্জিনী ছাড়িয়ে উঠেছে এবং তাই জনচিত্তকে স্পর্শ করেছিল। নাম ধাতুর অতি ব্যবহার মাঝে মাঝে পীড়া দেয় কিন্তু তা কি সংস্কৃতের গভীর গর্জনকে মৃদুতা দেয়নি ? যে গুলিকে আমরা epic simile বলে বিদেশী মনে করি, তার অনেকগুলি মালোপমা। চতুর্থ ও ষষ্ঠ সর্গ-এর চিত্রকল্প সর্বাংশে ভারতীয়। প্রমীলাই বোধ হয় তাঁকে ওভিডের আদলে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' লিখতে উৎসাহিত করে। কিন্তু তাতে স্বস্তি না পেয়ে তিনি ফিরে এসেছেন বৈষ্ণব কাব্যের কোলে—'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে। মোহিতলালের মন্তব্য—"রাধার ভূমিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া কবি আধ্যাত্মিকতাবর্জিত প্রকৃতি প্রেমের রসসৃষ্টি করিয়াছেন"—মানা যায় না। এ রাধা দিব্যোন্মাদিনী, কৃষ্ণ বিরহে সমস্ত প্রকৃতিতে কৃষ্ণ দেখছেন। যমুনাতটে, ময়ূরী, কুসুম প্রভৃতি কবিতায় লিরিকের প্রতিভা অবিসংবাদিত। এর পর পর তাঁর চির-অশান্ত আত্মা আশ্রয় খুঁজেছে পেত্রার্কার মডেলে লেখা সনেটগুচ্ছে। কিন্তু ফর্মে বিদেশী হলেও সনেটগুচ্ছের বিষয়বস্তু—কাশীরাম দাস, কালিদাস, কবি, আশ্বিন মাস, বিজয়া দশমী। তাঁর অভিমানী বাঙালী সত্তার চরম প্রকাশ—'আত্মবিলাপ'। একে ডিরোজিওর পরবর্তী যুগের আর্তনাদ বললে ভুল হবে না। বঙ্গের ভাণ্ডারের বিবিধ রতন উপেক্ষা করে তিনি বিদেশের দ্বারস্থ হয়ে ছিলেন। কি ফল হল ? "ক্ষতমাত্র হাত তোর মৃণাল কন্টক বনে কমল তুলিতে।" "নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী" শব্দবন্ধে সে যুগের ক্রুদ্ধ যুবকদের গভীর আশাভঙ্গের বেদনা ধ্বনিত। মায়াবী ইওরোপ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত মাইকেল জননী জাহ্নবীর কোলে। টাইবার, সেইন, টেমস ছেড়ে কপোতাক্ষ তটে।

৫

একজন কিন্তু আশাহত হননি, কারণ তাঁর মূল ছিল দেশীয় ঐতিহ্যের গভীরে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মধুসূদনের অন্যতম গুণগ্রাহী এবং পৃষ্ঠপোষক এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর তুলনা করুন। মধু ধনীর সন্তান, ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত, পিতামাতার অতিরিক্ত আদরে উচ্ছৃঙ্খল, হিন্দু কলেজে রিচার্ডসনের শিষ্যরূপে পশ্চিমী ঐতিহ্যের প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট, সর্বদাই মহৎ কবি হতে, অ্যালবিয়নের সুদূর তটে যাবার জন্য ব্যাকুল এবং সে জন্য ধর্মত্যাগেও প্রস্তুত। অন্যজন তাঁর মত নাগরিক নন, গ্রাম্য ; অতি দরিদ্র পরিবারে দুঃখকষ্টে মানুষ ; পিতার আদরে নয়, কঠোর শাসনে পালিত ; সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন শিক্ষাক্রমে দীক্ষিত ; যাঁর চোখে পশ্চিমী ঐতিহ্যের নেশা কেন, কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আশ্চর্য এই যে তিনি আবিষ্কার করলেন, আধুনিক হতে গেলে নবীন পশ্চিমকে জড়িয়ে ধরলে চলবে না, স্থবির প্রাচ্যকে আঁকড়ে ধরলেও চলবে না। ভারতের ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে আধুনিক হবার সম্ভাবনা, তাকে উদ্ধার করে কাজে লাগাতে হবে। এদিক দিয়ে তাঁর পূর্বসূরী—রামমোহন। কিন্তু সবটা নয়।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ তিনি, ঐতিহ্যের কোনটা আসল কোনটা মেকি, কোনটা প্রাসঙ্গিক কোনটা অবান্তর, কোনটা চিরকালীন কোনটা সাময়িক—তা বুঝতে পেরেছিলেন। গোঁড়া পণ্ডিতরা ছিল আবৃতচক্ষু, পৌরাণিক তথা আঞ্চলিক অতীতই তাঁদের আদর্শ। ডিরোজিও শিষ্যদের মতে পুরো অতীতটাই অযৌক্তিক, তাই অগ্রহণীয়। বিদ্যাসাগর এই দুই মেরুর কোনটাই নিলেন না। দেশী শিকড়ে বিদেশী কলম লাগালে জোড় খাবে না। আবার দেশী আচারের ফসিল বুকে করে বেড়ালেও অতীত মাহাত্ম্য

ফিরবে না। যা অবচীন, যা পতিত যুগের জড় কবন্ধ, তাকে সনাতন হিন্দুধর্ম বা ভারতীয় ঐতিহ্য মনে করাটাই ভ্রান্তিবিলাস। সমাজ সচল, শাস্ত্র ব্যাখ্যাও সচল। তার পূর্বাপর রয়েছে। তাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করে, কোনটা প্রাচীনতম এবং তা বর্তমানে গ্রহণযোগ্য কিনা জেনে নিতে হবে। তারপর তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে হবে বিকার ও বিভ্রমের বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে তার সঙ্গে পশ্চিমী ধ্যানধারণা মেশাতে হবে কিন্তু নির্বিচারে নয়। পশ্চিমী চারিত্র, নীতিবোধ, জ্ঞানবিজ্ঞানের সব কিছুই মন্দ নয়, আবার সব কিছুই নয় ভালো। লক্ষ্য অনুযায়ী উপায়, আর লক্ষ্য—সুস্থ, স্বভাবিক, মানবিক ভবিষ্যত গঠন। যেমন কাছ থেকে তিনি নব্যবঙ্গের বিচ্ছিন্নতার দুঃখ, হীনমন্যতাজনিত আত্মকৃপা, কর্মে ক্লৈব্য দেখেছিলেন, তেমনি কাছ থেকেই দেখেছিলেন রক্ষণশীলদের অতীতাশ্রয়িতা, অযৌক্তিক আচারানুসরণ, সমাজরক্ষার নামে নিষ্ঠুর নারী নির্যাতন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বা বহুবিবাহ/বাল্যবিবাহ রোধ করাটাই শেষ কথা নয়—এর পেছনে যে অসুস্থ মানসিকতা কাজ করছে, যা দেশাচার, লোকাচার, শাস্ত্রাচার বলে চলছে, তাকেই দূর করে দিতে হবে। তিনি আদি (archetypal) ব্রাহ্মণের চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন আদি প্রটেস্টান্ট চারিত্র। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, নির্লোভ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের গুণের সঙ্গে যুক্ত হল ব্যক্তিত্ববাদ, কর্মোদ্যম, আপন নীতিতে অনমনীয় আস্থা, তা পালনে অপরাজেয় বীর্য। সকল ছাপিয়ে উঠল আপন স্বার্থের ওপর সমাজ ও দেশের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা এবং তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প। ধর্মের কচাকচি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না তিনি (অনেকে সন্দেহ করতেন তিনি নিরীশ্বরবাদী), ইহলোকের সুখদুঃখ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। বিষয় বুদ্ধি কম ছিল না তাঁর, সেকথা প্রকাশনার আয় থেকে বোঝা যায়। চেষ্টা করলেই তিনি আদালতে বিপুল সাফল্য অর্জন করতেন—বন্ধু জজ দ্বারকানাথ মিত্রের মত। নরমপন্থী রাজনীতিতে ঢুকলে তিনি যেতেন রানাডের ওপরে। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি আপন ভূমিকা বেছে নিয়েছিলেন—শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারকের। খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, তবু সাবধানী মধ্যবিত্ত, ভীরু বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেননি।

বহু ব্যাপ্ত ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে তিনি জে. আর ব্যালান্টাইনের সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের বিরোধিতা করেন, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মত আদর্শবাদী ভারতীয় দর্শনকে বিশপ বার্কলের আদর্শবাদী দর্শন আরো বদ্ধমূল করবে। জাপানী বুদ্ধিজীবীরা যেমন কনফুসীয় মতবাদ বর্জন করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি দেশী বিদেশী সব রকম idealist দর্শন বর্জন করেন। পুরোনো পাঠ্যসূচীর খোল নলচে বদলে দিলেন তিনি। পাণিনি, বোপদেবের ব্যাকরণ পড়াতে অযথা সময় লাগে, অথচ ইংরেজী ভাষা, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই নিজেই লিখলেন 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী', যাতে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ সহজ হয়। সংস্কৃত কলেজ পড়াতে শুরু করল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতি। এবার তিনি সংস্কৃত ভাষার শব্দ সম্পদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শেখানোর জন্য তৈরি করলেন বাংলা গদ্য। 'বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ' থেকে 'কথামালা', 'চরিতাবলী'—সব লিখলেন নিজে (আগেই অনুবাদ করেন 'জীবনচরিত', 'বাংলার ইতিহাস')। মেকলে-প্রবর্তিত শিক্ষা জনগণের মধ্যে পরিশ্রুত হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র-সৃষ্ট বাংলা গদ্য জনশিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়াল। উচ্চবর্গও বঞ্চিত হল না। তারা পেল 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'-এর মত অসাধারণ সাহিত্য কর্ম। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য 'মহাভারত' অনুবাদ শুরু না করলে কালীপ্রসন্ন সিংহ

সে কাজে হাত দিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রচার পুস্তিকা—'অল্প হইল' ইত্যাদি বাংলা polemic রচনার অগ্রদূত।

একেই বলে ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ। কিন্তু থেমে থাকলেন না তিনি। দেশময় ছেলে, বিশেষ করে মেয়েদের, স্কুল বসিয়ে, শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করে, জনশিক্ষাকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অনেকেই জানেন না যে ভারত সরকারের কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভ্য হ্যালিডের লেখা মিনিট (২৪ মার্চ, ১৮৫৪) আসলে বিদ্যাসাগরের স্মারকপত্র (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪)-এর নিকট বহুলাংশে ঋণী। তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। ঐ বছরের উডের ডেসপ্যাচে যে সরকারী সাহায্যের প্রস্তাব ছিল তারই সুযোগ নিয়ে বিদ্যাসাগর হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুরে ১৮৫৫-৫৬-এর মধ্যে অন্ততঃ কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন (ছাত্র সংখ্যা—২৭৩৮)। এতে ইংরেজী সাহিত্য (অবশ্য জনসনীয়) ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, গণিত, গ্রহতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পড়ানো হত। একজন আজীবন সংস্কৃত-পাঠী পণ্ডিতের পক্ষে এই সম্পূর্ণ শিক্ষার কল্পনাটাই আধুনিকতার জয়ধ্বনি। তার চেয়েও বড়ো কল্পনা—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। বেথুন কলেজের সচিবরূপে তাঁর অবদান অসামান্য। ১৮৫৭ সাল থেকে তিনি সমানে লড়ে গেছেন বালিকা বিদ্যালয় বাবদ সরকারী সাহায্য লাভের জন্য। এমনকি সরকারী অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা না করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে বসে আছেন তিনি এবং অনুমোদন বন্ধ হওয়াতেও পণ ভঙ্গ করেননি। বস্তুত এই নিয়ে প্রাদেশিক সরকার, ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের ওতর চাপানে তাঁর মন ভেঙে যায়। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছাড়তে বাধ্য হন।[২৭]

সমাজসংস্কারের জন্য দেশীয় ঐতিহ্য প্রয়োগ বিদ্যাসাগরের অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কৌশলের নিদর্শন, শুধু হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস নয়। ডিরোজিওর শিষ্যরা প্রথম পরাশর সংহিতার শ্লোক উদ্ধার করেছিলেন ঠিকই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার জন্য আন্দোলনে নামেননি। তাছাড়া শাস্ত্রমাত্রই অযৌক্তিক বিধায় তাঁরা তা ব্যবহারও করতে চাননি। গোঁড়া পণ্ডিতরা ত' অবশ্যই এর বিরোধী হবেন এবং শত শত শাস্ত্রবচন আওড়াবেন, যেমন সতীদাহের ব্যাপারে। শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বা প্রামাণিকতা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন না। বিদ্যাসাগর শুধু যুক্তির ওপর বা শুধু অবচীন শাস্ত্রের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেন না। প্রথমে বহু শাস্ত্র ঘেঁটে সর্বাধিক প্রাচীন স্মৃতি—পরাশর সংহিতার—প্রামাণ্য পুঁথি থেকে প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি বের করে নিজে তুষ্ট হলেন এবং তারপরই, জন সমর্থন সংগ্রহ করতে, একেবারে আধুনিক প্রচারবিদের কায়দায় আসরে নেমে পড়লেন। নিজে লিখলেন বহু পুস্তিকা, নামলেন অসংখ্য তর্কযুদ্ধে, হাজার হাজার সই জোগাড় করে স্মারকলিপি তৈরি করলেন। সরকারের স্থিতাবস্থার নীতিকে আমূল নড়িয়ে প্রয়োজনীয় আইন আনালেন এবং বহু বাধা সত্ত্বেও পাশও করালেন। শুধু তাই নয়, ১৮৭০ সালে নিজের ছেলের বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, সাংসারিক অশান্তি সৃষ্টি করলেন ও বিধবাবিবাহের জন্য অর্থ সাহায্য করতে গিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হলেন।[২৮] ভুললে চলবে না—জীবনে তিনি সবচেয়ে মূল্য দিতেন আত্মসম্মানকে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে দুবারই তিনি চাকুরির জন্য সরকারের দ্বারস্থ হন। এর চেয়ে তাঁর পক্ষে বড়ো ত্যাগ অকল্পনীয়।[২৯]

কৌলিন্যপ্রথার সবচেয়ে বড় কুফল—বহুবিবাহ—বন্ধ করতে তিনি পারেননি—সরকারের গাফিলতিতে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি স্বদেশী সমাজের মাথাদের

বিরোধিতার জন্য।[৩০] ছেড়ে কথা বলেননি তিনি—তার প্রমাণ ১৮৭১ সালে প্রকাশিত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" ও ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত এ বিষয়ে "দ্বিতীয় পুস্তক"-এ। এই প্রসঙ্গে জানাই সহবাস সম্মতি আইন সম্বন্ধে তাঁর মতামত সম্পর্কে অনেক ভুল বাজারে চালু। বয়ঃক্রম দশ বছর করার ব্যাপারে ১৮৬০ সালে যে আইন পাশ হয়, তা বিদ্যাসাগরের তদ্বিরেই হয়। নিজের মেয়েদের ষোল বছরের আগে বিয়ে দেননি তিনি। শুধু ফুলমণি হত্যার ব্যাপারের পর যখন ১৮৬০ সালের আইনের সংশোধনের কথা ওঠে তখন বয়ঃক্রমের ওপর জোর না দিয়ে তিনি রজোদর্শনের ওপর জোর দেন। "As the majority of the girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I sugest would give larger, more real and more extensive protection than the Bill."[৩১] কোন চরমপন্থী ব্যাপারটায় বিচলিত হননি, জজ রমেশ মিত্র ও বিনয়কৃষ্ণ দেব ত' দেশাচারের অজুহাতে আপত্তি তুলেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের কারণে বাল্যবিবাহ অশুভ বললেও আইনের বিরোধিতা করেন।[৩২]

বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ গ্রিক ও র‍্যানেশাঁস মানবতাবাদ নয়। তার সঙ্গে বরং কোঁৎ ও মিলের মানবতাবাদের মিল রয়েছে। মানুষকে নিখুঁত করা যায়—এমন অষ্টাদশ শতকীয় বিশ্বাস তাঁর ছিল। সারা জীবন সে সাধনা করেও গেছেন। যশ বা অর্থ না চাইলেও চেয়েছেন সমাজের সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞতা। তা না পেয়ে অভিমানভরে সরে গেছেন প্রকৃতির প্রচ্ছায়ে, সরল আদিবাসীদের মধ্যে। যদি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের আদর্শে তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থাৎ সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে পারতেন, এত দুঃখ পেতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের মত তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নামেননি, নিজেকে যন্ত্র বলে মনে করতেন না। তাই এত দুঃখ—যা এস্‌কাইলাসের Prometheus Bound মনে পড়ায় :

> I pitied mortal men; but being myself not thought
> To merit pity, am thus cruelly disciplined.

কিন্তু রামকৃষ্ণ তাঁর দয়ার পেছনে ঈশ্বরেচ্ছাই দেখেছেন আর বিবেকানন্দ তাঁরই আদর্শে আপন মোক্ষের সঙ্গে জগৎহিতকেও যুক্ত করেছেন।

৬

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট বহুলাংশে বদলে গেল, তার সঙ্গে শুরু হল নতুন সংস্কৃতির যুগ। ১৮৫৭ সালেও মিলের উদারতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আদর্শ প্রবল ছিল। এখন তার স্থান নিল রক্ষণশীল, জাত্যভিমানী, প্রভুত্ব (এবং প্রতিহিংসা) পরায়ণ, সাম্রাজ্যবাদী রুক্ষ স্বর—স্টিফেনের, স্ট্রেচির, রিজলের, কার্জনের। একদা রেলপথ, টেলিগ্রাফ, অবাধ বাণিজ্য, কুশলী আমলাতন্ত্রকে আধুনিকীকরণের পরিকাঠামো (infrastructure) বলে মনে করা হত, এখন তারাই হয়ে দাঁড়াল গভীরতর শোষণযন্ত্র। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন পশ্চিমী ও দেশী—উভয় ভাষায় শিক্ষিতের দল। তাঁরা সহযোগিতার হাত গোটাতে শুরু করলেন, বিদেশী ও দেশী উৎস থেকে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজলেন। বিদেশী উৎস হল—মিল, কোঁৎ, স্পেন্সার, মাৎসিনি ; দেশী উৎস হল—গীতা, মহাভারত, ভাগবত (পরে বেদান্ত)। হিন্দু ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য পুনর্গঠনের আহ্বান যাঁর কণ্ঠে সবচেয়ে সুন্দর ও বলিষ্ঠ রূপ পেল—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়।

ইতালীর র‍্যানেশাঁসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে পড়ি, "অকস্মাৎ বিশিষ্ট বিস্তৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়,...ইউরোপের অকস্মাৎ সেই রূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন, ইউরোপের এই রূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল।" বোঝা যায়, র‍্যানেশাঁস, রেফমের্শন এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব—সবটাকেই তিনি র‍্যানেশাঁসের অন্তর্ভুক্ত করে দেখছেন। পঞ্চদশ শতকের বাংলায় এমনি এক সৌভাগ্যোদয় হয়েছিল—চৈতন্যের ধর্ম, রঘুনন্দনের স্মৃতি, রঘুনাথ-গদাধর-জদগীশের ন্যায়, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপসনাতনের কাব্য তার প্রমাণ। এর মধ্যে জয়দেব কালানুসারে বহুপূর্বের, চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতি চৈতন্যের পূর্বের।[৩৩] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে তিনি আশা পোষণ করেছিলেন—মেদেচি ফ্লোরেন্সের মত এক নবজন্ম বাংলায় আসছে।[৩৪]

তিনি আপন সাহিত্যকীর্তিকে এবম্বিধ র‍্যানেশাঁসের অন্তর্ভুক্ত করতেন কিনা জানি না। অনেকে করে থাকেন। কিন্তু তাঁর যুগের সঙ্গে র‍্যানেশাঁসের গুণগত পার্থক্য বিস্তর, পরিবেশগত পার্থক্য ত' জাজ্বল্যমান। সন্দেহ নেই, বঙ্কিমের সাহিত্যে র‍্যানেশাঁসের একটা লক্ষণ স্পষ্ট—তাঁর virtuosity বা বহু বিদ্যায়, বহু সৃষ্টি কার্যে পারদর্শিতা। কবিতা ও নাটক ছাড়া এমন কোনও সাহিত্যকর্ম ছিল না যেখানে তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া যায়নি। উপন্যাসে তিনি আজও শিরোভূষণ। প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য, যুক্তি, আদর্শস্থাপন প্রয়াস ও প্রসাদগুণের এমন যোগাযোগ দুর্লভ। কিন্তু তবু তিনি আর এক যুগের প্রতিভূ—রোমান্টিক যুগ। যাঁরা সে যুগকে বিশেষ করে কাব্যের যুগ মনে করেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন বঙ্কিমের গদ্যই কাব্যের পর্যায়ে উঠেছে, উপন্যাসের নাটকীয়তা দৃষ্টিগ্রাহ্য।

প্রথমে বলেছি, আমাদের দেশে ক্লাসিক ও রোমান্টিক আন্দোলন পর পর আসেনি, এক সঙ্গে এসেছিল। রোমান্টিক প্রবণতা সত্ত্বেও মধুসূদন নিয়েছিলেন ক্লাসিক/এপিক ফর্ম, আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস মূলতঃ রোমান্টিক হলেও তার মধ্যে ক্লাসিকের সংযম সুদৃঢ়। রোমান্টিক কাব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ অতীতাশ্রয়িতা। শিল্পবিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায়, আধুনিক যুগের ক্রমবর্ধমান কলকারখানার কুশ্রীতা ভুলতে, অনেকে মধ্যযুগে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় লক্ষণ—অষ্টাদশ শতকের সর্বজনীন যুক্তিবাদ পরিত্যাগ করে ব্যক্তিগত আবেগের উচ্ছ্বাসকে মূল্যদান। সামাজিক, ধর্মীয় বা যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনের ওপর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এর পরিণাম। তৃতীয় লক্ষণ—ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় বা প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ। এই ত্রিবিধ লক্ষণ—অতীতে ফিরে যাবার, ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠার ও জাতীয়তা উন্মেষের প্রধান হাতিয়ার ছিল—ইতিহাস। শেলী, বায়রণ, মুর ও স্কটে এই প্রবণতা প্রকট। কিছু ব্যতিক্রম ছিলেন ব্লেক ও কীটস। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম দিকে ইতিহাসের দিকে ঝুঁকে, ফরাসী বিপ্লবের বাড়াবাড়িতে ভয় পেয়ে গিয়ে, অন্তর্জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে শান্তি খুঁজেছিলেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্ররূপে (এখানকার বহিরাগত ছাত্ররূপে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন), এমনকি হুগলি কলেজেও, তিনি রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছিলেন। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনায় দেখা যায় তিনি বায়রণের অনুরাগী ছিলেন না। কীটসের মহিমা রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ বুঝেছিলেন কিনা সন্দেহ। শেলী অবশ্যই

ষাটের দশকের পরে এক অতিপরিচিত নাম, কিন্তু বঙ্কিমে তাঁর স্থান নেই। বোধহয় শেলীর বৈপ্লবিক, এমনকি নৈরাজ্যবাদী দর্শন, এবং নারীঘটিত কীর্তিকাহিনী তাঁর জুগুপ্সা উদ্রেক করেছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অতি-আধ্যাত্মিকতা তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। রোমান্টিক কবিরা তাঁকে যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি দিয়েছিলেন এলিজাবেথীয় নাট্যকার—সেক্‌সপীয়র। শুধু তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে নয়, প্রধান ট্র্যাজেডিগুলিতেও, বঙ্কিম দেখেছিলেন ইতিহাস এবং মানবচরিত্রকে দুর্বার নিয়তির রূপ নিতে। সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলীতে সফোক্লেসের নাম একবার মাত্র পেয়েছি, তাই গ্রিক ট্র্যাজেডির সঙ্গে তিনি কতটা পরিচিত ছিলেন বলা কঠিন। যাই হোক, পাঠান-মুঘলের সংঘর্ষে তিলোত্তমা ও আয়েষা, জাঁহাগীরের সিংহাসনপ্রাপ্তিতে মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা, বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় কালে মৃণালিনী ও মনোরমা, মির কাশিম ও ইংরেজের বিবাদে শৈবলিনী ও দলনী এবং রাজসিংহ-আলমগীরের যুদ্ধে চঞ্চলকুমারী ও জেবুন্নিসা ইতিহাসের প্রবল ঝটিকায় আন্দোলিত হয়েছিল, কেউ কেউ বা ছিন্নমূল। জগৎ সিংহ, নবকুমার, হেমচন্দ্র—সকলেই তাঁদের প্রণয়িনীর চরিত্রে সন্দেহ করেছেন—ওথেলো বা হ্যামলেটের আদলে। নিষ্পাপ কুন্দ ও ভ্রমরের অতলান্ত বেদনার সরোবরে কি ওফেলিয়ার মুখ ভেসে ওঠে না? 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর সেক্‌সপীয়র-প্রীতির প্রমাণ রেখেছেন একটি বাক্যে—"সেক্ষপীয়রের নাটক সাগরবৎ কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য।" প্রথমার্ধ ভিক্টর উ্যগো, দ্বিতীয়ার্ধ গ্যোটের প্রতিধ্বনি।

সেক্‌সপীয়র ছাড়া তাঁর অন্য প্রেরণা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস। তখন প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরা হিন্দুযুগ ছেড়ে মুসলিম যুগ ধরেছেন। এলিয়ট ও ডাওসনের ফার্সীতে লেখা নানা ইতিহাসের অনুবাদ, গ্র্যান্ট ডাফের 'হিস্টরি অব দ্য মারাঠাজ', টডের 'রাজস্থান', অর্মের কোম্পানীর সামরিক ইতিহাস তখন কলেজে পাঠ্য। সাধারণ্যেও অজানা নয়। জোন্স থেকে মুইর, ম্যাক্সমূলর, রথ (Roth), হ্বেবর (Weber) ও হুইটনি-পড়া বঙ্কিম প্রবন্ধকাররূপে প্রাচীন হিন্দুযুগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম কয় অধ্যায়ে এবং 'দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে তিনি যেভাবে মহাভারত, পাণ্ডব ও কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করেছেন তা অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীকেও বিস্মিত করেছিল। তাহলে কেন তিনি অধিকাংশ উপন্যাসের কাল মধ্যযুগে এবং প্রাক্-ব্রিটিশযুগে স্থাপন করলেন? যদি হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী হয়ে থাকেন, তবে কেন ছাড়লেন হিন্দু স্বর্ণযুগ? কেন নিলেন তার অবক্ষয়ের, পরাজয়ের 'থিম'? সে কি পুনরুজ্জীবনের (revival) প্রত্যাশায়? সেকি মুসলিম বিদ্বেষের জন্য? এমন কথা আজও শোনা যায়।[৩৫] আসলে উপন্যাসের কাল নির্বাচনে কাজ করেছে তাঁর রোমান্টিক ধ্যানধারণা, নাটকীয় প্রবণতা, বাংলাদেশের হিন্দু রাজত্ব পতনের জন্য লজ্জা। হিন্দু-পাঠান, মুঘল-রাজপুত, এবং হিন্দু-ব্রিটিশ (আনন্দমঠ) শক্তি সংঘর্ষের মধ্যে তিনি রোমান্স ও নাটক—উভয়ের উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। সমসাময়িক বাংলা সমাজে তার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক—ধীরোদ্ধত, নায়িকা—বীরাঙ্গনা। প্রাচীন ভারতের দ্রৌপদী ছিলেন বঙ্কিমের আদর্শ নায়িকা—সীতা নন। "সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রথমতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী।" রাজ্ঞী না হয়েও শৈবলিনী ও শান্তি যা কাণ্ড করেছেন তা ঐতিহাসিক রোমান্সের বাইরে সম্ভব নয়। দেবী (প্রফুল্ল) যতই স্বামীর ঘরের বাসন মাজুন, তার আগে

শ্বশুর হরবল্লভকে (এবং ইংরেজদেরও) ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন। দিল্লী যাবার পথে রঙ্গমুখে চঞ্চলকুমারী রাজসিংহ এবং মোবারক উভয়কেই চালে মাৎ করেছেন। তিলোত্তমা, মৃণালিনী, দলনীরা নেই তা নয়, কিন্তু তারা বাঙালীর চিত্ত আকর্ষণ করেনি। কোন কোন সামাজিক উপন্যাসেও তাই। কুন্দনন্দিনী নিষ্পাপ ভালবাসার নীরব শিকার হলেও স্বামীর দ্বিচারিতার প্রতিবাদিনী সূর্যমুখী আমাদের বেশি আকর্ষণ করে।

স্কটকে বঙ্কিমের আদর্শ বলা বঙ্কিমের প্রতি ঘোর অন্যায়। কি ঘটনা সংস্থাপনে, কি চরিত্র চিত্রণে, কি অনৈতিহাসিক চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতায়, কি প্রেমের নতুন নতুন রূপ উদ্‌ঘাটনে, শেষে ভাষার কাব্যগুণে, বঙ্কিম স্কট থেকে অনেক বড়। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে জি. এম. ট্রেভেলিয়ানের একটি উক্তি স্মরণীয় : তা "presents history as an eager aspiration, destined to perpetual change, doomed to everlasting perfection, but living, complex and broad as history itself." ইতিহাস সমগ্র অতীতকে ধরতে পারে না। "মৃতেরা তাদের গোপনকথা কবরে নিয়ে যায়।" কিন্তু ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক সে সব কথা যেন আড়াল থেকে শুনতে পান। রাজসিংহের বাইরের ঘটনা টড ও অর্ম থেকে নেওয়া, কিছু খাফি খাঁ ও মানুচি থেকে। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নির্মলকুমারী ও বাদশাহ্ আলমগীরের কথোপকথন শোনা যাবে না। "আমি প্রাচীন হইয়াছি কিন্তু কখন কাহাকেও ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে আমার বেগম হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়—পোড়া পাহাড়ের মত হৃদয়—একটু স্নিগ্ধ হয়।" মুহূর্তে আলমগীরের বাইরের খোলস খসে পড়ে। চির অতৃপ্ত, চির জ্বালাময় যে অন্তর প্রকাশিত হয়, তা কোন আচার্য যদুনাথ ধরবেন ? যদুনাথ নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন। চাক্ষুষ চিত্রকল্পে স্কট ও বঙ্কিম সমান দক্ষ হতে পারেন কিন্তু মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিম গভীরতর। "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?"—মেহেরুন্নেসার একটি স্বগতোক্তি তাঁর সঙ্গে জাঁহাগীরের সম্পর্ক যেমন মুহূর্তে প্রকট করেছে এমন কিছু স্কটে পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের দুর্বার গতিবেগ অন্দরমহলের স্থাণু প্রথাবদ্ধ জীবন কি ভাবে ওলট পালট করে দেয় তার অজস্র নিদর্শন বঙ্কিমে পাওয়া যায়। তাছাড়া তার ফলে চরিত্রের অকল্পনীয় বিবর্তনও ঘটে। যে জেবুন্নিসা একদা তাচ্ছিল্যভরে বলেছিল, "ভালবাসা গরীব দুঃখীর দুঃখ", অগ্নিদহনে শুদ্ধ হয়ে সেই বলছে, "বাদশাহজাদী মানুষ মাত্র"।

অস্বীকার করা যায় না, মানবমানবীর সম্পর্ক বিশ্লেষণে বঙ্কিম উনিশশতকের জীবনে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। এই সম্পর্কের মাধুর্য ও তিক্ততা, উন্নয়নী ও অবনমনী শক্তি সম্বন্ধে তিনি চিরসচেতন। যৌন সন্দেহের অবকাশ ছিল যেমন, তেমনি ছিল যৌন সংরক্তির (sex obsession). তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী শোনা মাত্র জগৎ সিংহ 'প্রতিমা বিসর্জন' করেছেন, তিলোত্তমার পক্ষের কোন জবাব শুনতেও চাননি। এমনি 'মৃণালিণী'তে হেমচন্দ্র। নবকুমার অবশ্য ছদ্মবেশী মতিবিবির পত্র পড়ার পরও কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করে সন্দেহ সত্য কিনা বুঝতে চেয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর ব্যতিক্রম। লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগের পর, এমনকি শৈবলিনীর নিজের মুখে প্রতাপের প্রতি তার অবারণীয় অনুরাগের স্বীকৃতি শোনবার পরও, চন্দ্রশেখর তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। যৌন সংরক্তির নিদর্শন মিলবে গোবিন্দলাল, সীতারামে। একজন সুখের সংসার বিসর্জন দিয়েছেন, আরেক জন সমৃদ্ধ রাজ্য। পরে এই সন্দেহ ও সংরক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

আজকাল স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে ইওরোপে যথেষ্ট গবেষণা চলেছে। লরেন্স স্টোন বলছেন, র‍্যানেশাঁসের সময় থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ব্যক্তি হিসেবে নারীর মূল্য বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতির মূল্য। এর নাম—'affective individualism' দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের পরিবেশ ছিল আলাদা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, যৌথপরিবারের বহু বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েনে, নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে যুগযুগ সঞ্চিত সংস্কারের চাপে—বধূর, এমনকি গৃহিণীর, নিজস্ব মতামত ও আচরণ সব সময়ই ব্যাহত হত। বঙ্কিমের রাজসিংহের কাল সপ্তদশ শতক। রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পিতার মত না নিয়ে বিবাহ করতে চান না, চঞ্চলকুমারীর পিতা অভিসম্পাত দিয়ে এমন পত্র লিখলেন যে তিনিও এগোতে সাহস করলেন না। দেবীচৌধুরাণীর পরিবেশ—অষ্টাদশ শতক। হরলবল্লভের প্রবল কর্তৃত্বের আড়ালে ব্রজেশ্বর নিষ্প্রভ। বেচারা প্রফুল্লকে কত ছল করে ব্রজেশ্বরের শয়নগৃহে প্রবেশ করতে হয়েছিল তা সবাই জানেন। প্রতাপান্বিত শ্বশুরের বলতে বাধেনি—"ডাকাইতি করিয়া খাইও।" তুলনীয়, ওপরে শ্বশুর শাশুড়ীর চাপ নেই বলে, নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবন শুধু সুখী ছিল না, তার একটা privacy-ও ছিল ('স্তিমিত প্রদীপে' পরিচ্ছেদ পড়ুন)। সূর্যমুখী জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে (যদিও অবগুণ্ঠনাবৃতা) নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছেন। (এর কিছু পরেই আমরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীকে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখব।) সন্দেহ নেই যে কমলমণি শ্রীশকে চালাত। ভ্রমর যে ভাবে কৃষ্ণকান্তের এস্টেট পরিচালনা করেছে তা রানী রাসমণিকে স্মরণ করায়। স্বামীর প্রতি তার দুর্জয় অভিমানও স্বাধীনতার লক্ষণ। ঐতিহাসিক কল্পনায় বঙ্কিম নারীকে কি সম্মান দিয়েছিলেন তার প্রমাণ 'আনন্দমঠে'র শান্তি। শৈবলিনী ও শ্রীর যেন কোন সামাজিক বন্ধনই ছিল না। প্রথমার প্রতাপের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ এবং দ্বিতীয়ার সন্ন্যাসিনীবেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণ আজও অকল্পনীয়। বিনা কারণে বঙ্কিমের উপন্যাস অন্দর মহলে প্রিয় হয়নি। সে যুগের নানা স্মৃতিচারণে বঙ্কিম পড়ে মধ্যাহ্ন যাপনের স্বাদ ধরা পড়েছে। গুরুগম্ভীর উপদেশ সত্ত্বেও সেদিনের বদ্ধ ঘরে তিনি আলোবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা কেন ভাঙে ? ভিক্টোরিয় যুগের moral panic-এর কথা তুলেছেন স্টোন। বঙ্কিমের কবির দৃষ্টিতে দায়ী—'রূপতৃষ্ণা'। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, সীতারাম—প্রত্যেক ক্ষেত্রে মধুর সম্পর্কের অবসান এবং পুরুষচরিত্রের অধঃপতনে সব চেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে রূপতৃষ্ণা। তার সবটা যৌন আকর্ষণ (sex) নয়। তার একটা নান্দনিক (aesthetic) দিকও আছে। হরদেব ঘোষালকে লেখা নগেন্দ্রের কুন্দবর্ণনা স্মরণ করুন। গোবিন্দলাল অনেক কষ্ট করেও নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি—"তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই।" শ্রীর রূপে (ও শৌর্যে) মুগ্ধ সীতারাম রাজ কার্য ত্যাগ করে সর্বদা চিত্রবিশ্রামে বসে থাকতেন। কল্যাণীর রূপমুগ্ধ ভবানন্দ সন্ন্যাসব্রত থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। প্রথম ক্ষেত্রে নগেন্দ্রেরই অবহেলায় কুন্দকে বিষ খেতে হল ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা করলেন, ভ্রমরেরও অকালমৃত্যু হল ; তৃতীয় ক্ষেত্রে রমা মরল, সীতারামের রাজ্য গেল। সর্বোপরি জয়ন্তীকে নগ্ন করে বেত্রাঘাত করার আজ্ঞা দিয়ে তিনি পশুরও অধম কাজ করলেন। রূপতৃষ্ণার ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিণাম সর্বত্র ভয়াবহ। ভবানন্দ তবু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলালের চিত্তদাহ স্মরণ করুন—"এ রোহিণী ভ্রমর

নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, সুখ নহে....তখন ভ্রমর অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা।" রিভলভারের নল নয়, এই চিত্তদাহই ট্র্যাজেডির কারণ। বঙ্কিম কিন্তু মৃত্যুতে সমাধান খোঁজেননি—প্রায়ই sublimation বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের কথা শুনি। শুধু নরক দর্শন, প্রায়শ্চিত্ত—সব সত্ত্বেও শৈবলিনী অননুতপ্তা।

কিন্তু রূপতৃষ্ণাকে খুব বড়ো করে দেখলে বঙ্কিমের মনস্তত্ত্বজ্ঞানকে পুরো বোঝা যাবে না। সূর্যমুখীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ তাঁর অতিরিক্ত অধিকারপ্রিয়তা (possesivenes). স্বামী যেন তাঁর সম্পত্তি। হয়তো নিঃসন্তান ছিলেন বলে তা আরো প্রকট হয়েছিল। নগেন্দ্র কুন্দের মধ্যে খুঁজেছিলেন এক নারী, যে তাঁরই ওপর নির্ভরশীল। আশ্রয় দেওয়া পুরুষের কাজ, অথচ সূর্যমুখী তাঁকে তা করতে দেননা, বরং তাঁকেই আশ্রিতের মত দেখেন। অতএব নগেন্দ্রের পৌরুষ গর্ব অতৃপ্ত ছিল। 'সীতারামে' রমা ও নন্দা শ্রীর তুলনায় বড়ো বেশি মেয়েলি, নিষ্প্রভ। সীতারামের পাশে শ্রীই একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে বলে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য নয়।

দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে—কপালকুণ্ডলা ও শৈবলিনী। প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির মতই নির্লিপ্তা, অথচ করুণাময়ী। সে স্বামীকে মতিবিবির হাতে তুলে দিতে আপত্তি করে না। সে যে কোন সময় মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত কারণ মৃত্যু তার অমোঘ নিয়তি, তার মাতৃ স্বরূপা, হয়তো তার মুক্তি। আশ্চর্য এই নারী—সমুদ্র থেকে উঠে যেন সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। নবকুমার তার রহস্যের আবরণ কোনদিনই ভেদ করতে পারেনি। সন্তান হলে কি হত তা বলা হয়নি। শুধু স্বপ্নের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে মাতা হলে কপালকুণ্ডলা গৃহী হতে পারত। শৈবলিনীর কাছে পত্নীত্ব, মাতৃত্ব—কিছুরই মূল্য নেই, সে শুধু সূর্যমুখীর মত প্রতাপ-সূর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অনুশীলন ধর্ম তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শত নরকদহন, শত প্রায়শ্চিত্ত (পার্থিব দুঃখ, অপবাদের কথা বাদই দিলাম) সত্ত্বেও প্রতাপের প্রতি তার প্রেম অনির্বাণ। চন্দ্রশেখর সন্ন্যাসী না হলে কি হত ? কিন্তু অতৃপ্ত কামনার ব্যাপারই এটা নয়। নানা সূত্রে বুঝি প্রতাপের প্রতি তার ভালবাসা দৈহিক স্তরের উর্ধে। তাকে sublimation দ্বারা সংযত করা যায় না।

এখানেই উঠবে অনুশীলন ধর্ম বা তত্ত্ব ব্যাপারটা কি ? বলে রাখা ভাল, তা 'নব্যহিন্দুধর্ম' বা 'রিভাইভ্যালিজম' নয়। তার পেছনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ভাবনা কাজ করেছে। মিল, কোঁৎ ও স্পেন্সারে তার শুরু কিন্তু তা পরিণতি লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্য—মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের সহায়তায়।

বঙ্কিমের সঙ্গে উনিশ শতকের elitist কালচার তার উৎস বদলাল—বেদান্ত থেকে মহাভারত-গীতা-ভাগবত। রামমোহনের চোখে নিরাকার ও সগুণ ব্রহ্মোপসনাই শ্রেষ্ঠ পরিগণিত হয়েছিল। বিশ্বজনীন theism-এর স্বার্থে নিরাকার প্রমাণ করার জন্য তিনি বেদ ও উপনিষদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। যজুর্বেদ বলছে, তাঁর প্রতিমা নেই। মাণ্ডুক্য বলছে, তিনি শুধু 'একাত্মপ্রত্যয়সার'। কঠ বলছে, বাক্য, মন, চক্ষুর অগোচর তিনি। কেন মূর্তিপূজার প্রতিবাদে বলছে, 'নেদম্ যদিদমুপাসতে'। কাঠ, পাথর, মাটি ব্রহ্ম নয়। আত্মোপসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তবে খৃস্টান ও মুসলিম একেশ্বরবাদীদের মত সমবেত/সামাজিক উপসনার ব্যবস্থাও থাকতে পারে। শুধু মূর্তি নয়, অবতার, পুরোহিত, লোকাচার সবই তিনি বর্জন করেন।

কিন্তু মুষ্টিমেয় জ্ঞানমার্গী ব্যতীত কি এই নিরাকার কল্পনা বা ধ্যান সম্ভব ? কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজক সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ বললেন, মূর্তিপূজা শুধু

দুর্বলাধিকারীর আশ্রয় নয়, জ্ঞানমার্গীর পক্ষেও চিত্তশুদ্ধির সোপান। "যতক্ষণ দেহাত্মবোধ, আমি, তুমি বোধ আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে, ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্মকে মানতে হবে।" তাছাড়া সাধনার বিভিন্ন স্তরে কখনো দ্বৈত, কখনো অদ্বৈতের প্রয়োজন হয়। অদ্বৈত ও দ্বৈত (রামকৃষ্ণের ভাষায়—নিত্য ও লীলা) সরগমের মত—আরোহী অবরোহীর খেলা। রামকৃষ্ণ নিজে ব্রহ্ম ও শক্তিকে অভেদ মনে করতেন, মৃণ্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীকে দেখেছিলেন, প্রতি বাৎসল্য সাধনা করেছিলেন। কিন্তু বারংবার ভাবসমাধিতে লীনও হতেন তিনি এবং নরেন্দ্রনাথের অদ্বৈত প্রবণতাকে জোর করে দ্বৈতের দিকে নিয়ে যেতে চাননি। 'ভাব মুখে থাক', 'যত মত তত পথ'—এসব হল উপনিষদের মহাবাক্য ('তত্ত্বমসি')-এর মত গভীর। মূর্ত, অমূর্ত সবই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ। তাঁতেই সব সাধনার শেষ—সব নদীর সমুদ্র সঙ্গম। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু সত্য দৃষ্টি রয়েছে, কিছু ভ্রান্তি। অথচ সকলে নিজের ধর্মকে অভ্রান্ত মনে করে বিবাদ বাধায়। এ জন্য তিনি সাকার-নিরাকার, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, দ্বৈত-অদ্বৈত, হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান—সবাইকে নিয়ে ধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্ব ঘোষণা করেছিলেন। তা শুধু তত্ত্ব থাকেনি। তাঁর মধ্যে সমস্ত শাস্ত্র মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দত্তের মত ইংরেজী শিক্ষিত যুবক তাঁর খোঁজ পাবার আগে হিন্দুধর্ম ও খৃস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের বিরোধ বেধেছিল। নানা কারণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে মতদ্বৈধ শুরু হয়। প্রথমে কেশবচন্দ্র সেন আলাদা হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন (পরে নাম হয় 'নববিধান')। দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা তাঁর পছন্দ হয়নি। মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ প্রচেষ্টা দেবেন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। তাই হিন্দু প্রতিরোধে ঐক্য আনতে তিনি যতটা সম্ভব জাতিভেদ, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের পুরাতন আচার মেনে নিয়েছিলেন। এগুলিকে আসলে তিনি বহিরঙ্গ ভাবতেন, তাই আপোষ সম্ভব। মহর্ষির 'আত্মজীবনী' (বিশেষতঃ অজিত চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর টীকাটিপ্পনিসহ) পড়লে বোঝা যায় তিনি ছিলেন গভীর ভক্ত। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' পড়লে বোঝা যায় দ্বৈতবাদী উপনিষদ (বিশেষতঃ শ্বেতাশ্বতর) তাঁকে প্রেরণা দেয়।

কিছু পরে কেশব সেনের সমাজও ভেঙে গেল। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসুরা স্থাপন করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। বিভেদের মূল কারণ—কেশবের অতিরিক্ত খৃস্টভক্তি, হিন্দু দেবদেবী কল্পনা গ্রহণ ও কীর্তনাদি ব্যবহার, অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং বিধি লঙ্ঘন করে কোচবিহার বিবাহ। কিছু ভক্ত তাঁকে অবতার ঘোষণা করলে বাকিরা প্রবল আপত্তি তোলেন। ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ তাই নরেন্দ্রনাথের মত উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের তুষ্ট করতে পারছিল না।

বঙ্কিম অনেকদিন ধরে ধর্ম নিয়ে ভাবছিলেন। সমসাময়িক বাদানুবাদ তিনি অনুধাবন করেছিলেন। আজকের স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেবের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য তাঁকে বিতর্কে যোগ দিতে প্রণোদিত করে। কিন্তু এর আগেই তিনি মিলের Three Essays on Religion, কোঁৎ-এর Catechism of Positive Religion, হার্বার্ট স্পেন্সারের Data of Ethics ইত্যাদি পড়েছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরেই (শ্রাবণ, ১২৭৯)-তে কোঁৎ-এর উপর প্রবন্ধ বেরোয়। এমনকি, কাণ্ট ও ফিক্‌টে প্রভৃতি জার্মান দার্শনিকদের মতবাদ তাঁর অজানা ছিল না। এসব পড়ে এবং তার সঙ্গে মহাভারত, গীতা[৭] ও ভাগবতের ভক্তিতত্ত্বের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য মিলিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের এক

যুগোপযোগী ব্যাখ্যা রচনা করলেন আর তার নাম দিলেন—অনুশীলন ধর্ম। মিলের 'আত্মজীবনী'র সমালোচনা—'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে বঙ্কিমের তত্ত্ব প্রথম উল্লিখিত হয়। পরে তা বিশদাকারে 'ধর্মতত্ত্ব—প্রথম পর্ব' নামে 'নবজীবন' পত্রিকায় (১২৯১-৯২) বেরোয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রবন্ধে এই ধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে। এমনকি উপন্যাসের সাহায্যও তিনি নেন তিনটি উপন্যাসে—'দেবীচৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', ও 'সীতারাম'-এ। এগুলিকে তিনি 'অনুশীলন ধর্ম প্রচারের কল' আখ্যা দিয়েছেন। এতে ধর্মপ্রচার কতটা হয়েছে জানিনা কিন্তু উপপাদ্য প্রমাণ করার ইউক্লিডীয় পদ্ধতি উপন্যাসের রস অনেকখানি নষ্ট করেছে।

তিনি বললেন, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হিন্দুধর্মের শেষ কথা নয়। "কেননা যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেনসর 'Inscrutable Power in Nature' বলিয়া ঈশ্বর স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না।...যাঁহাকে Impersonal God বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে Personal God বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।" কিন্তু Personal God-এর নামে হিন্দুধর্মে বহুদেববাদ চলছে। তাকেও ধর্ম বলা চলে না। "হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই।" বহু দেবদেবী পূজা—"একদিকে আত্মপীড়ন, আর একদিকে রঙ্গদারি।" মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির সম্যক স্ফুরণের, সামঞ্জস্যের এবং পূর্ণ বিকশিত সেই মনুষ্যত্বকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে এবং মানবের প্রতি প্রীতিতে উৎসর্গের নাম অনুশীলন। মহাভারত ও গীতার কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বরাবতার নন, অনুশীলনধর্মের শ্রেষ্ঠ মানবিক নিদর্শন, Superman বা পুরুষোত্তম। তিনি আত্মারাম (ছান্দোগ্য), আত্মা জগন্ময়, তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। তাই ভক্তের আদর্শ—মনুষ্যপ্রীতি। গীতার তিনটি স্তরের মধ্যে বঙ্কিম ভক্তির স্তরটি বেছে নিয়েছিলেন (চতুর্থ, সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ, চতুর্দশ (১-৬, ২৬), পঞ্চদশ এবং সপ্তদশ (৫৪ থেকে শেষ)। অন্যগুলি বড় বেশি ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। বঙ্কিম কৃষ্ণের দেবত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বকে বড়ো করেছেন। বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণকে বুদ্ধ ও যীশুর ওপরে স্থান দিয়েছেন, কারণ তিনি সংসার ত্যাগ করেননি, সংসারের সুখ রসিকের মত উপভোগ করে, দুঃখ বীরের মত বহন করে, কর্ম নিষ্কাম চিত্তে সম্পন্ন করে, এক অনন্যসাধারণ আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি যে যুদ্ধের সারথি তা ধর্মযুদ্ধ, তার লক্ষ্য—ধর্মরাজ্য স্থাপন। বঙ্কিম গীতার উদ্গাতার মুখ দিয়ে ক্লৈব্যগ্রস্ত অর্জুনোপম ভারতবাসীকে নতুন মহাভারত গঠনের জন্য নতুন কুরুক্ষেত্রে ডাক দিয়েছিলেন।[৩৮]

পাশ্চাত্য ভাবধারার গভীরে তাঁর মত কেউই যাননি, কিন্তু তার ক্ষীরটুকু নিয়ে নীরটুকু ত্যাগ করেছিলেন তিনি। বেন্থামের উপযোগিতাবাদের কথা 'ধর্মতত্ত্ব'-এ রয়েছে। কিন্তু ভালো বা মন্দকে গাণিতিক মাপকাঠিতে বিচার তিনি করতে চাননি—নৈতিক মাপকাঠিতে করেছেন। ইহকালের সুখ তাঁর অকাম্য নয়, কিন্তু বাহ্য সম্পদের পূজা (materialism) ও তার প্রবক্তা অ্যাডাম স্মিথ/রিকার্ডো/মিলদের তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন কমলাকান্তের মুখ দিয়ে। ডারুইনের তত্ত্ব তিনি রপ্ত করেছিলেন কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ (Social Darwinism) তাঁর জুগুপ্সার উদ্রেক করেছে। বিবর্তন একটা আত্মিক বিকাশ, তার প্রণালী শুধু জৈবিক নয়, নৈতিক। কোঁৎ ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—"perfect unity is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society,

when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose.'' বলতে হবে না, এর সঙ্গে বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বের আশ্চর্য মিল রয়েছে। বঙ্কিম তাকে ধর্মের ভারতীয় সংস্কার পরেই স্থান দেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। যদি কোঁৎ-এর Religion of Humanity-র সাধারণ লক্ষ্য হয় মানবসেবা, তবে কি নিশ্চয়তা আছে যে সব সময়ই তা অননুশীলিত মানবচিত্তে জাগরূক থাকবে? মানবপ্রীতির মূল কি? নোঙর কি? বঙ্কিমের উত্তর—ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত মানবপ্রীতি সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ বলতেন—আগে শিবজ্ঞান, পরে শিবজ্ঞানে জীবসেবা। প্রথমে ঈশ্বরে আরোহণ, পরে মানুষে অবরোহণ। প্রীতি ও ভক্তি অন্যন্যোনির্ভর।

বারবার যে শব্দ বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন তা হল 'প্রীতি'। প্রশ্ন উঠবে, দেশপ্রীতির স্থান তবে কোথায়? আনন্দমঠ-এ সে প্রশ্ন উঠেওছে। সেই সূত্রে স্পেন্সার অনুসরণ করে বঙ্কিম দেখাচ্ছেন যে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি—এরকম সোপানপরম্পরায় প্রীতি শেষ হয়েছে জাগতিকী প্রীতিতে। "যতদিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্তি না হইল, ততদিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্ম ও অসম্পূর্ণ।" কমলাকান্তর দপ্তর-এ প্রীতি এবং ঈশ্বর সমার্থক হয়ে উঠেছে।[৩১]

দেশভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি, দেশপ্রীতি ও জাগতিকী প্রীতি এদের মধ্যে একটা বিরোধ বাধতে পারে। এই সমস্যা ও সমাধান 'আনন্দমঠ'-এর theme. তার উদ্দীপনময় theme song —'বন্দেমাতরম্', সন্তানদলের বীরত্ব ও আত্মদান আমাদের এমন এক আবেগের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছল যে আমরা প্রস্তাবনা ও উপসংহারের প্রতি নজর দিতে ভুলি। "ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম।" এখানে ভক্তিকে উচ্চতম স্তর বলা হয়েছে। আনন্দমঠের প্রস্তাবনাতেও গভীর অরণ্যের মধ্যে সত্যানন্দ সে বাণী শুনেছেন। শেষে তিনি যখন ইংরেজরাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখলেন, তাঁর গুরু চিকিৎসক বলছেন, "প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজ রাজা করিব।...তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুজ্জীবিত হইবে।" অস্বীকার করার উপায় নেই—এ ধরনের গোঁজামিল বঙ্কিমের afterthought মনে হতে পারে। কেউ বলবেন, নিজের চাকুরীর স্বার্থে। চরমপন্থীরা এতে বিশ্বাসও করেনি। তারা মহেন্দ্রের মত মায়ের (দেশ ও দুর্গার) তিনমূর্তি দেখেছিল। অতীতের "অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না জগদ্ধাত্রী মূর্তি", বর্তমানের "হৃত সর্বস্বা তাই নগ্নিকা" কালী এবং ভবিষ্যতের "দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী"কে। যিনি দশভুজা, আবার তিনিই দেশমাতা। তার জন্য অবশ্যই চরমপন্থীরা ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তির মত প্রাণ দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে বঙ্কিমের চিকিৎসক অনুশীলনধর্মের ভাষায় কথা বলেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের আবেগ অভিভূত করেছে তাঁর তত্ত্বকে। কোথায় ভেসে গেছে অনুশীলন ধর্মের আদর্শ। বড়ো হয়ে উঠেছে সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদিনী দেশমাতৃকা। বিপ্লবীরা সন্তানদের মতই উৎসর্গ করেছেন জীবন—কোন অনির্দেশ্য জাগতিকী প্রীতির জন্য নয়, দেশ ব্রিটিশ কবল মুক্ত করতে। অরবিন্দের ব্যাখ্যা জয়লাভ করেছে, বঙ্কিমের মূল রচনা নয়।

বঙ্কিম যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপন করতে চাননি তা আগেও দেখিয়েছি, আবার

বলছি। তিনি শশধর তর্কচূড়ামণিকে charlatan মনে করতেন।[৪০] দয়ানন্দর মত বৈদিক ধর্মকে অপৌরুষেয় বা 'ঈশ্বর প্রণীত" ঘোষণা তিনি করেননি। দয়ানন্দ সায়ণ ভাষ্যকেও ভ্রান্ত মনে করতেন, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি বিদেশী, বিধর্মীর ভাষ্য ত দূরের কথা। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণের সমস্ত আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন—সায়ণ ছাড়াও, ম্যাক্সম্যুলর, রথ, হুইটনি প্রভৃতি পণ্ডিতের লেখা, এমনকি নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও, তাঁর অজানা ছিল না।[৪১] হিন্দধর্ম যে natural religion—রামমোহনের এই ইঙ্গিত বঙ্কিমে জ্যায়মান। Revivalism-এর অপবাদ না এনে যদি কেউ tour de force-এর অপবাদ আনে, তাও বোঝা যায়। কারণ, গীতার ভক্তি তত্ত্বে তিনি থেমে থাকেননি। তাকে সমসাময়িক দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ ও যুগোপযোগী করতে চেয়েছেন। মনুষ্যপ্রীতির ওপর তা না হলে এত জোর পড়ত না। বিবেকানন্দ অবশ্যই রামকৃষ্ণের কাছ থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তার সমর্থন সংগ্রহ করেননি তা বলা চলে না। জাগতিকী প্রীতি যাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন এমন মন্তব্য অশ্রদ্ধেয়। তবে তা আগেও শোনা গেছে, অধ্যাপক ক্লার্কের মত সাহেব-পণ্ডিত তা প্রতিপাদন করার চেষ্টাও করেছেন। এর প্রতিবাদ আগে করেছি।[৪২] মুসলিমরা বিধর্মী বলে বঙ্কিম বিদ্বিষ্ট এবং হিন্দু স্বধর্মী বলে তাঁর স্নেহভাজন এমন অপবাদ তাঁকে দেওয়া যায় না।[৪৩] যেখানেই তিনি উচ্চ নৈতিক/ধর্মীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি দেখেছেন, সেখানেই কশাঘাত করেছেন—নির্বিচারে। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে তাঁর কিছু কটূক্তি আজ মানা যায় না ঠিকই কিন্তু সত্যই কি সম্রাটের হিন্দু বিদ্বেষ ছিল না? অন্ততঃ রাজনৈতিক কারণে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেননি? যেখানে name of the game is power, অর্থাৎ কর্তৃত্বই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে ধর্মকে চিরকাল রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, আজও হচ্ছে। সে কথা বাদ দিলেও কতলু খাঁকে সমর্থন করবে কে? অন্যদিকে যে হিন্দুরা আদর্শচ্যুত, বঙ্কিম তাদের ক্ষমা করেননি। পশুপতির উচ্চাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত বিশ্বাসঘাতকতা, ভবানন্দের পরদারানুরক্তির জন্য ব্রতচ্যুতি, শ্রীর যৌন আকর্ষণে অবশ সীতারামের রাজকার্যে অবহেলা ও জয়ন্তীর প্রতি পাশবিক বর্বরতা—তাঁর কাছে নিন্দার্হ। 'আয়েষা রমণীরত্ন'—কার লেখনীপ্রসূত? দলনী বেগমকে কি শৈবলিনীর তুলনায় অধিকতর সাধ্বী মনে হয় না? পরম দুশ্চরিত্রা জেবুন্নিসার প্রতি কি সহানুভূতি তাঁর। তিনি সীতারামের রাজধানীর নাম রেখেছেন মহম্মদপুর, চাঁদশা ফকিরকে করেছেন তার উপদেষ্টা। "মুসলিমরাও জগদীশ্বরের সন্তান"—এমন ঘোষণা কজন বি. জি. পি. নেতা করবেন? প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তাঁর উপন্যাস বা প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে (এবং পুরো উদ্ধৃতি না দিয়ে) তাঁকে মুসলিমবিদ্বেষী বলে যে প্রচার করা হয়ে থাকে তা ঐতিহাসিক হিসাবে আমি অভিসন্ধিমূলক মনে করি।

তাঁর আর এক অপরাধ—তিনি রক্ষণশীল, এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল। ত্রিশ চল্লিশের দশকে প্রগতির ধ্বজাধারীরা এসব কথা অনকেবার বলেছেন। সত্য যে তিনি বিধবা বিবাহ বিতর্কে বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করেননি। বিষবৃক্ষে সূর্যমুখী বিদ্যাসাগরকে রীতিমত গালি দিয়েছে। কিন্তু কুন্দ ও রোহিণীর মত রূপবতী বিধবা পারিবারিক জীবনে কি ভাঙচুর করতে পারে, তাও কি তিনি দেখাবেন না? সেটাও সামাজিক সমস্যা। পুরুষরা একপত্নী থাকুক—তিনি চাইতেন। যে কোন দেশাচার বা লোকাচার তিনি মানেননি বরং তাকে হিন্দুধর্মের মধ্যেই ফেলেননি। স্পষ্ট বলেছেন, জীবনচর্যা (অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি) কি রকম হবে তা বিজ্ঞানের এলাকা, ধর্মের নয়। অধঃপতিত ব্রাহ্মণকে তিনি বর্ণগুরু বলে

পূজ্য স্বীকার করেননি। কেশব সেন বৈদ্য হলেও তাঁর কাছে ধর্মগুরু। আর্য গরিমার স্বর্ণযুগেও বাঙালীকে মিশ্রজাতি বলতে দ্বিধা করেননি তিনি। যাঁরা তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, তাঁদের জানা উচিত তদানীন্তন প্রগতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—মিল, কোঁৎ, স্পেন্সারের বহু মত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশপ্রীতির উগ্র বিসমার্কীয় নমুনা অগ্রাহ্য করে, জাগতিকী প্রীতির ওপর জোর দিয়ে, তিনি আন্তর্জাতিকতার বন্দনা গানই গেয়েছেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যবাদের ছলনা বলে মূর্খতা প্রকাশ করেননি তিনি, ওরিয়েন্টালিস্টদের ফাঁদে ত' পড়েনইনি। সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি বিরোধিতা অবশ্যই তিনি করেননি (সে যুগে কেই বা করেছিলেন ?), কিন্তু তাতে যে হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তদের স্থান নেই সে ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। তাছাড়া প্রয়োজনে, যেমন কৃষক সম্পর্কে আইনের ব্যাপারে, তিনি সরকারী নীতির নিন্দাই করেছেন। জমিদারী প্রথার বিরোধী ছিলেন তিনি।[৪৪] স্বয়ং কুলীন ব্রাহ্মণ হলেও শূদ্রদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতি তাঁর ছিল। তাঁর 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায় মিথ্যা আর্য গৌরবের প্রচারের চেয়ে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে শুধু বাগ্‌যুদ্ধ করেই তিনি নিরস্ত হননি, হাকিমরূপে খুলনার নীলচাষীদের পক্ষে লড়াই দিয়েছিলেন। স্ত্রী স্বাধীনতার ব্যাপারে পুরুষদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর মত পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই ? কিছু লজ্জা নাই ?" ইংরেজীশিক্ষা দেশকে কিভাবে বিভক্ত করে দিচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছিলেন তিনি।[৪৫] বহু বিবাহ, কৌলিন্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা সম্বন্ধে তিনি শাস্ত্র বা আইন কোনটারই দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন মনে করেননি, কারণ শিক্ষা বিস্তারের ফলে তা আপনা থেকে বিলুপ্ত হবে।[৪৬] কিন্তু তখনই জনসংখ্যা-বিস্ফোরণের ম্যালথুসীয় প্রেত আর কেউ লক্ষ্য করেছিলেন কি ?[৪৭] ইংরেজ প্রভুর অত্যাচার নিবারণের জন্য কোন বিপ্লবী জিগির তিনি তোলেননি বটে (সে যুগে কেই বা তুলেছে ?) কিন্তু 'বাহুবল ও বাক্যবল' নামক এক অসম্পূর্ণ প্রবন্ধে বাহুবল প্রয়োগ (অর্থাৎ right to revolt) উড়িয়ে দেননি। 'আনন্দমঠ'-এর কথা ছেড়েই দিলাম, সেখানে অনেক ambivalence আছে। কিন্তু 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ, স্পষ্টভাবেই, তিনি 'সারমেয় পলিটিকস' ছেড়ে 'বৃষজাতীয় পলিটিকস' নিতে বলেছেন। 'কমলাকান্তের পত্র' অংশের দ্বিতীয় সংখ্যায়, তদানীন্তন মডারেট পলিটিকস সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "জয় রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাও গো। ইহাই তাহাদের (বাঙালীদের) পলিটিকস।" 'আবেদন নিবেদন প্রতিবেদনে'র কংগ্রেসী রাজনীতির বিরুদ্ধে 'রজনী'র অমরনাথের বিরূপ মন্তব্য স্মরণীয়। চরমপন্থীদের ইডিওলজি গঠনে বঙ্কিমের অবদান যথেষ্ট। 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর জন্য অরবিন্দের লেখা বঙ্কিমের ওপর সাতটি প্রবন্ধ এ বিষয়ে মূল্যবান দলিল।[৪৮]

বঙ্কিমের প্রায় সমস্ত উপন্যাসে সুস্থ হাস্যরসের এমন একটা অন্তঃশীল প্রবাহ বয়ে চলেছে যে বেসুরো নীতিবাদের কর্কশ উপলখণ্ড তাতে কোথায় ভেসে গেছে। বিমলা-আসমানি-বিদ্যাদিগগজ দিয়ে শুরু আর দেবীচৌধুরাণীর দিবা-নিশা দিয়ে শেষ। নির্মলকুমারীর কোর্টশিপের দৃশ্য ভাবুন আর 'ইন্দিরা'র অন্তিম মিলন দৃশ্যের কথা ভাবুন, মনে হবে না যে বঙ্কিম আসলে ছিলেন গম্ভীরাত্মা—সংসার ও সাধারণ থেকে আপন বুদ্ধির আভিজাত্যে বিচ্ছিন্ন। অনুশীলন ধর্মের প্রচারককে আমরা ভুলে যেতে পারি কিন্তু আফিমখোর কমলাকান্তকে নয়। এ যেন সেক্সপীয়রের ভাঁড় ও ডিকেন্সের পিকউইক দিয়ে তৈরি। শ্রেষ্ঠ আর্টে শ্রেয়ঃ, প্রেয় বোধ এমনি একাত্ম, তাদের আরও সংহতি দিয়েছে

বঙ্কিমের হাসি (বঙ্কিম হাসিও বলা যায়)। কিন্তু এই হাসির পেছনে ছিল এক কবিমনের অতীত গৌরবচারণ, এক দেশপ্রেমিকের দুঃখের দীর্ঘশ্বাস। কমলাকান্ত সাধারণ ভাঁড় নয়, উৎকেন্দ্রিকও নয়। সে আমাদের সমস্ত অহমিকার অসার আস্ফালন, সমস্ত অকাজের অনিত্যতা সম্বন্ধে সচেতন। মানুষের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বড়ো বড়ো কথায় সে শুনতে পায় বাজারের দোকানদারি, যেখানে জ্ঞানীর পাণ্ডিত্য, নারীর সৌন্দর্য, বিচারের নৈতিক ঋজুতা—কেনা যায়। বেন্থামের উপযোগিতাবাদ তার কাছে উদরদর্শন। বাহ্য সম্পদের পূজার পুরোহিত রূপে সে চিহ্নিত করে অ্যাডাম স্মিথ ও মিলকে। সমাজতন্ত্র তার কাছে মার্জারিসুলভ লুব্ধতারই নামান্তর। 'আমার দুর্গোৎসব', একটি গীত', 'একা' সহসা তার উৎকেন্দ্রিকতার আবরণ উড়িয়ে দিয়ে বাঙালীর অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে বঙ্কিমের সীমাহীন মমতা উদ্‌ঘাটিত করেছে।

৭

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ম ও সমাজ সংস্কারে, মধুসূদন কাব্যে এবং বঙ্কিম উপন্যাসে ও প্রবন্ধে পশ্চিম থেকে যা আহরণ করলেন, তার চেয়ে বেশি দিলেন। কিন্তু তাঁদের সমসাময়িক বা পরবর্তী সংস্কারক ও লেখকরা তাঁদের ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারলেন না। আগেই বলেছি ব্রাহ্ম সমাজ তিনভাগ হয়ে গেল এবং সমাজসংস্কারের ব্যাপারে প্রথমে আগ্রহ দেখালেও কেশবচন্দ্র সেন বেশিদূর এগোতে পারলেন না। কোচবিহার বিবাহে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল, তাই সমাজপতি হয়েও সমাজের বিধান ভাঙতে দ্বিধা ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন মধুসূদনের দুর্বল উত্তরাধিকারী। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' থেকেই দেখা যায় দেশ প্রেমের উচ্ছ্বাসে হেমচন্দ্র অসম্ভব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কাল্পনিক বীরবাহুকে দিয়ে কাল্পনিক পাঠান রাজ হত্যায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বস্তি পেতেন না। 'ছায়াময়ী' দান্তের প্যারডি হতে পারে। নরক আছে কিন্তু স্বর্গ অনুপস্থিত। 'বৃত্রসংহার' পৌরাণিক কাহিনীর ছদ্মবেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক, কিন্তু মৃত্যুর দৃশ্যে মাইকেলের মেঘনাদ যে উদাত্ত স্তরে পৌঁছেছেন, তা দেখি না। রাম-রাবণের যুদ্ধ মধুসূদনের চোখে মানুষে মানুষে লড়াই —হেমচন্দ্র দেবদানবের লড়াই বর্ণনা করছেন। দেবতারাও দধিচীর আত্মত্যাগের ওপর নির্ভর। বন্দিনী শচী স্কটের নকলে 'Breathes there the man with soul so dead' বললেও প্রমীলার গুরুত্ব পাননি। 'বৃত্রসংহার'-এর অদৃষ্টের কল্পনা আদৌ গ্রিক নয়, তা হিন্দু বিশ্বাসে ভরা কর্মবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৪৯] সংলাপের নাটকীয়তা দুর্বল, ভাষা—জাড্যদোষগ্রস্ত, অলঙ্কার-ব্যবহার—ত্রুটিপূর্ণ, মিত্রাক্ষরের বাহুল্যে বোঝা যায় অমিত্রাক্ষরে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যহীন। একাদশসর্গে আগাগোড়া পয়ার ব্যবহার ত' রীতিমত রসাভাস সৃষ্টি করেছে। 'দশমহাবিদ্যা'য় মঙ্গলের দিকে যে ক্রমপ্রগতির চিত্র আঁকা হয়েছে তা ডারুইনের অপলাপ মাত্র।

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬) বঙ্কিমচন্দ্রের মহান 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে প্রতিভার অভাব ও অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি ভয়ানক হতে পারে—তার নিদর্শন এই ট্রিলজি। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন, "নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ-মূর্তি পাণ্ডিত্যলব্ধ নহে,—উহা তাঁহার অন্তরের গভীর প্রেরণায় প্রকাশিত।" প্রেরণা কোথা থেকে এল জানতে ইচ্ছা করে।

একে 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' রচনার চেষ্টা বলা বাতুলতা। আর্য-অনার্যের সংঘাত, আর্যদের আত্মকলহের ক্লেদাক্ত আবহাওয়া, যজ্ঞভিত্তিক বৈদিকধর্ম ও অনার্য নাগপূজার দ্বন্দ্ব—অবশ্যই আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান। একজাতি, একরাষ্ট্র, এক ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্গাতারূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখাও যায়। কিন্তু দ্বাপর যুগে ব্রিটিশ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী !! ডারুইন, স্পেন্সার ও গীতার এই 'ককটেল' দুর্বোধ্য এবং দুষ্পাচ্য। টোটেম ও ট্যাবুর শৈশব, যজ্ঞের কৈশোর, বিজ্ঞানের যৌবনের পর আসবে পূর্ণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের যুগ :

অখণ্ড উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো ! নহে অবনতি !
মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ.....
যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে, নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মানবজাতি উন্নতির পথে।

সরল রেখার এই প্রগতির ধারণা ভিক্টোরিয় যুগের উদারতন্ত্রের বাঁধা গৎ। উনিশ শতকের শেষে অনেক ইওরোপীয় পণ্ডিতই তাতে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কাব্যে টেনিসন এধরনের কথাবার্তা (যথা Locksley Hall-এ) লিখেছেন, ব্রাউনিং-এর Pippa Passes -এও এমনি সহজ আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু হপকিনসের The Wreck of Deuschland-এ যুগ শেষের (fin de siecle) নৈরাশ্য প্রকট, তবু তা ক্যাথলিক আত্মসমর্পণের ফলে আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে।

তবে কংগ্রেসী আন্দোলন দানা বাঁধার সময় নিম্নলিখিত স্তবক

শিখাব একত্ব মর্ম
একজাতি এক ধর্ম
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্যস্থাপন

অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং নবীনচন্দ্রের 'মেশিয়ানিক' জাতীয়তাবাদ, যা ভারতের সীমান্তে থামেনি, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বিশ্ব জয়ে বেরিয়েছে, তা বিপিন পাল, অরবিন্দ প্রভৃতিকে প্রেরণা দিয়েছিল। মুশকিল এই, বিভিন্ন স্তরে দুর্বাসা ও কৃষ্ণের দ্বন্দ্ব বোঝা যায়, কিন্তু চরিত্র হিসাবে দুর্বাসাকে মেনে নেওয়া যায় না। দু দুটো প্রণয়-ত্রিভুজ (জরৎকারু-কৃষ্ণ-সত্যভামা এবং বাসুকি-সুভদ্রা-অর্জুন) ডারুইনীয় বিবর্তনবাদের বা অতীন্দ্রিয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে খাপ খায়নি। মনে রাখতে হবে, তিনি যখন এই ট্রিলজি লিখছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের 'মানসী-চিত্রা-সোনার তরী'র যুগ। লিরিকের সেই প্রবল বন্যায় এপিক (literary epic হলেও), এবং দুর্বল এপিক, বেমানান ও ব্যর্থ। নবীনচন্দ্র স্রোতের বিরুদ্ধে ভেসেছিলেন। আগে আমি বলেছিলাম— "The trilogy is a monumental misadventure in poetry of ideas."মত বদলাইনি। 'সিরাজউদ্দৌলা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু আচার্য যদুনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে— "Nobin has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing forth his readers' tears for fallen greatness and blighted youth."[২০] এখানে সিরাজই আসল বলি নয়, বলি—বাংলা, সমগ্র ভারত, যার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নবীনচন্দ্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস-এ। বর্ণনামূলক অংশগুলি রোমান্টিক উচ্ছ্বাসে

আপ্লুত—নৈতিক ঘৃণা এবং দেশপ্রেমী আবেগও তাকে সহনীয় করতে পারেনি। দুএকটা ক্ষেত্র ছাড়া —যেমন রানী ভবানী ও মোহনলাল। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি বলে বঙ্কিমকে দোষী করেছিলেন নবীন। নিজে অত্যধিক আদর্শ চিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে তিনি সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

গদ্যের দিক থেকে বরং কিছু নতুন জিনিস আমরা পাচ্ছি, যেমন দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮)। যদিও তা চেল্লিনির আত্মজীবনীর মত intimate নয়, তবু এখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের ভাষায় কথা বলেননি, মহর্ষির দূরত্ব রাখেননি। যে সব ভ্রমণবৃত্তান্ত এতে গ্রথিত হয়েছে তা শ্রেষ্ঠ travelogue -এর নিদর্শন। তাঁর বন্ধু, রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা', 'সেকাল ও একাল', 'আত্মচরিত' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। 'হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত' ত' শিবনাথ শাস্ত্রীর পূর্বাভাস। অক্ষয়কুমার দত্ত এরকম গতিশীল, সরল গদ্য লিখতে পারেননি, কারণ তাঁর বিষয়বস্তু—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। তবু 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্মের ইতিহাসে একটা বড় পদক্ষেপ। সমাজতত্ত্ব নিয়ে বঙ্কিমের মতই ভাবিত ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। মাইকেলের সহপাঠী হয়েও কোনদিন নিজেকে আধুনিক বা প্রগতিশীলরূপে প্রচার করতে চাননি তিনি। অল্প বয়সে বিবাহের পক্ষে ছিলেন তিনি ; নারী শিক্ষা বলতে বুঝতেন গৃহিণী ধর্মে শিক্ষা ; এমনকি বহু বিবাহে বা বিধবার কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁর আপত্তি ছিল না। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ'-এ আমরা যেন এক ভিন্ন গ্রহে ও যুগে বাস করছি মনে হয়। বঙ্কিম ও বৃদ্ধ রাজনারায়ণ এমন হিন্দু হতে চাইতেন না। কিন্তু 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এ তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব প্রয়োগ প্রশংসার্হ। তিনি স্পেন্সারের organismic view গ্রহণ করেননি। সমাজ ও ব্যক্তি ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমটির ব্যক্তিত্ব নীতি-নির্ভর, দ্বিতীয়টির দেহ-নির্ভর। রাষ্ট্র ও সমাজ পৃথক সত্তা। রৈখিক প্রগতিতে বিশ্বাস করতেন না তিনি, খানিকটা বৃত্তাকার পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। বঙ্কিমের মত ভক্তি-মার্গী ছিলেন না ভূদেব, ছিলেন জ্ঞানমার্গী। তাঁর মতে খৃষ্ট ধর্ম আবেগ-ভিত্তিক ও কৃপা-নির্ভর, তাই যুক্তি নির্ভর হিন্দু ধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট। সাম্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়বে, অসন্তোষ বাড়বে। বেন্থামের উপযোগিতাবাদ এবং ম্যাবলি-মরেলির বস্তুবাদ—কোনটাই তিনি গ্রহণ করেননি, কারণ তারা শুধু ইহলোকে উন্নতির কথা ভাবে। এই প্রসঙ্গে তপন রায়চৌধুরীর Three Views of Europe from Nineteenth Century Bengal ও তদ্‌পূর্ববর্তী ব্যাপকতর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্কিম হয়ত 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' বা 'অঙ্গুরী বিনিময়' থেকে কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন ; 'পুষ্পাঞ্জলি'তে ভারতকে মাতৃরূপে বন্দনা হয়তো বন্দেমাতরম মন্ত্রের পূর্বাভাস ; 'সর্বজনীনপ্রীতি'র ধারণা ভূদেবেরও ছিল। তবু ভূদেব ও বঙ্কিম যেন এক যুগের পূর্বাপর প্রজন্ম হয়েও বিভিন্ন মেরুর। ভূদেব অতীতের দিকে, বঙ্কিম ভবিষ্যতের দিকে নির্দেশ করছেন। বঙ্কিমের উত্তরসূরীরা তাঁর প্রতিভার আলোয় ছায়াবৃত। তবু সঞ্জীবচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয় সরকার গদ্য সাহিত্যকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনে কোন কিছু একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেননি। তাঁরও দার্শনিক গদ্যে ভালো হাত ছিল। সবচেয়ে নতুনত্ব আনেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। Belles-lettres -এর ক্ষেত্রে এমন লেখা বিরল এবং সমসাময়িক যুগের নির্মোহ (নির্মম ?) আলেখ্য। তখনকার কথ্য (ঈষৎ

আদিরসাশ্রিত) ভাষাকে এমন তির্যক ও শাণিত রূপ দেওয়া সহজ ছিল না।

কথ্যভাষাকে নিয়ে নাটকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেলের 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় তার যে নিদর্শন দেখি, তা 'সধবার একাদশী'তে অনেক মর্মভেদী। কিন্তু সামাজিক 'স্যাটায়ার'-এর চেয়ে 'নীলদর্পণ' অনেক বড়ো মাপের প্রচেষ্টা। একে নতুন ধরণের ট্রাজেডি বলা চলে—যার সঙ্গে অ্যারিস্টটলবর্ণিত গ্রিক ট্রাজেডির বা সেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির লক্ষণ মেলে না। দ্বন্দ্বটা এখানে দৈব নয়, মানবচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বও নয়। দ্বন্দ্বটা দুই অর্থনীতির সংঘর্ষ থেকে জাত। রাজা-প্রজার সম্পর্ক তার প্রেক্ষাপট। বিলেতের বস্ত্র শিল্প চায় সস্তায় নীল, নীলকর চায় শ্রেষ্ঠ ফসলিজমিতে নীলচাষ ও দাদনি প্রথার মাধ্যমে শোষণ। নীলদর্পণের নায়িকা ক্ষেত্রমণি (সরলা নয়)র নামটার প্রতীকীমূল্য রয়েছে। 'ক্ষেত্র' এখানে কৃষি ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের ধর্ষণ চেষ্টা হচ্ছে—rape of the land -এর ইঙ্গিত। এই ট্র্যাজেডিতে গোলোক বসুর মত উচ্চবিত্ত জোতদার ও তোরাবের মত গরীব চাষী, নবীনমাধবের মত প্রতিবাদী ও সরলার মত নিষ্পাপ অন্তঃপুরচারিণী—সকলেই নীলকরের লোভ ও ক্রোধের শিকার। কি বিদেশী বণিক কি ভারতীয় প্রজা—কেউ কাউকে বুঝতে পারছে না। প্রতিবাদের ভাষাও বর্গ হিসাবে আলাদা। নবীনমাধবের ভদ্র, মার্জিত বিদ্রোহ এবং তোরাবের নিম্নবর্গসুলভ বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে দীনবন্ধু নাটকটিকে অসাধারণ গভীরতা দিয়েছেন। গোমস্তার চরিত্র collaborator-এর সরীসৃপসুলভ পিচ্ছিলতা ফুটে উঠেছে, সঙ্গে কিঞ্চিৎ নিরুপায় আত্মকৃপা। 'কৃষ্ণকুমারী'র ব্যর্থ গ্রিক আদলের চেয়ে এর আবেদন কত জোরালো তা আজও অভিনয়ের সময় বোঝা যায়। মাইকেল মন্তব্য করেছিলেন, "With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairy lands." দীনবন্ধু এ দোষে দোষী নন। শশীভূষণ দাশগুপ্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল'কে এর চেয়ে ভালো ট্র্যাজেডি কোন অর্থে বললেন? যদি সেক্সপীয়র আদর্শ হন, তবে বলতেই হবে গিরিশ সেক্সপীয়রের গভীর মর্মে প্রবেশ করতে পারেননি।[৫১] ম্যাকবেথের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কি ওথেলোর সন্দেহ, কি হ্যামলেটের চিত্তে মাতার প্রতি ভালোবাসা ও ঘৃণার সংঘাত (এবং চরিত্রগত দ্বিধা) যে সব ট্র্যাজেডির মূল তার সঙ্গে ব্যাংক ফেল-সঞ্জাত সর্বনাশ, কি পানদোষ, কি ফুকো আত্মাভিমান তুলনা করা যায় কি? শুধু লীয়রের আত্মাভিমান কি ট্র্যাজেডির কারণ? "সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল"—যোগেশের এই উক্তির মধ্যে কোথায় সেই 'pity and fear' যা লীয়রের বারংবার উচ্চারিত আর্তনাদ—'Never, never' ইত্যাদির মধ্যে ধ্বনিত? রমেশকে খলনায়ক বলা হয় কিন্তু ওথেলোর ইয়াগোর নখাগ্রও সে স্পর্শ করতে পারবে না। 'বলিদান'-এর সাময়িক মূল্য থাকতে পারে (এখনও পণপ্রথার বিরুদ্ধে তা প্রচারিত হয়), কিন্তু এ ধরনের সামাজিক সমস্যা মানুষের চিরন্তন সমস্যা বলে পরিগণিত হতে পারে না। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' কি 'জামাই বারিক' সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা— কিন্তু নাট্যকার তাকে কমেডি বলে চিহ্নিত করেছেন।

তবে কি বাঙালী জীবনের শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি প্রকৃত ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে? তাতে দুর্বার গতি নেই, অনিবার্য এবং সমাধানহীন দ্বন্দ্ব নেই। অরবিন্দ বলছেন, "it is due to the absence of any bold dramatic treatment of the great issues and problems of life." গ্রিক সাহিত্যে সুপণ্ডিত

অরবিন্দ গ্রিক ট্রাজেডির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। বাঙালীর নাটকে তিনি অরেস্টিস, ইডিপাস, আন্তিগোনেদের সংকট লক্ষ্য করেননি। সন্দেহ নেই, নাটকে আমরা র‍্যানেশাঁস (অন্তত এলিজাবেথীয়)-কে স্পর্শ করতে পারিনি।

৮

কিন্তু আর এক ধরনের গদ্য লিখেছিলেন এক সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দ-যার ওজস্বিতা, গতিবেগ, বিস্তার, গভীরতা, কথ্যভঙ্গি ও মর্মভেদী ব্যঙ্গ একটা আলাদা genre সৃষ্টি করেছে। এই অগ্নিস্রাবী গদ্যের চালিকা শক্তি ছিল ঐতিহ্য ও অধ্যাত্ম-চেতনা এবং সে চেতনা সঞ্চার করেছিলেন এক অবতারকল্প পুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যে সব উক্তি করেছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা বদলেছেন কিনা জানি না। কিন্তু পরিষ্কার করে বলা দরকার যে ঐতিহাসিক বিচারে এমন সিদ্ধান্ত অগ্রহণীয়। রামকৃষ্ণ মিস্টিক ছিলেন, অতএব তিনি মধ্যযুগীয় ; অভিজাত (গ্রাম্য জমিদার, রানী রাসমণি ও তাঁর জামাতা মথুরামোহন, যদু মল্লিক প্রভৃতি) শ্রেণীর পরোক্ষ স্তাবক, অতএব প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক—এবম্বিধ নানা কুযুক্তির জাল বোনা হয়েছে।[৫২] মার্ক্সীয় ডিটারমিনিজমের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বা শ্রীম-লিখিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে’র অতি সরলীকরণ, কোনোটাই ধর্মের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে না। বিশেষত যাঁরা মরমিয়া, তাঁদের অনুভূতি ও উপলব্ধি রাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি পেতে গেলে মরমিয়া দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য বুঝতে হবে, অ্যারিস্টটেলীয় ন্যায়ের ভিত্তিতে নয়। যেখানে শুধু বোধে বোধ, যা আভাসে ইঙ্গিতে, ঠারেঠোরে, কবিতার চরণে বা গানের সুরে অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, তাকে বিষয়াসক্ত মানুষ—রাজা, সেনাপতি, সামন্ত প্রভু, বুর্জোয়া বা কৃষক/শ্রমিকের ভাবনা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মেশানো যায় না। কোন মধ্যযুগবিশারদ—ব্লখ, হীয়ার, ল্য গফ, যিনিই হ'ননা কেন—কেউই আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসকে পোপ গ্রেগরি বা তৃতীয় ইনোসেন্ট, এমনকি সন্ত বেনেডিক্ট বা সন্ত বার্নার্ড-এর সঙ্গে তুলনা করবেন না। সে যুগের উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্ক, এমনকি mentalite দিয়ে, ফ্রান্সিসের মত মরমীয়া সাধককে বোঝা যাবে না। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রিডরিশ হীয়ার ও ডেভিড নোলেস তাঁকে কিছু কিছু বুঝেছেন।[৫৩]

প্রশ্ন উঠবে, র‍্যানেশাঁসের প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের কথা কেন তোলা ? কারণ, ফ্রান্সিসের মত তিনি কোন বিশেষ যুগের নয়, বরং তাঁর চিন্তায়, কথায়, চিরন্তনের যে সুর লেগেছে, আধুনিকতা তার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমের র‍্যানেশাঁসে সাভোনারোলার মত সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ বেমানান। তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছেন না, মৃত অতীতকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরছেন, এমন কি ইতিহাসের ঘড়িকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। অথচ মধ্যযুগের লোক হয়েও ফ্রান্সিসের দৃষ্টি সকল মানুষের, এমনকি সকল প্রাণীর, কল্যাণ কামনায় করুণ। তিনি সম্রাট, পোপ, সামন্ত প্রভু কিছুই জানেন না—শুধু জানেন যীশুকে। তাঁর কাজ—ঈশানুসরণ। তাঁর সঙ্গে থাকত শিশুযীশুর দোলনা (আমাদের বাৎসল্যরসের প্রতীক গোপালের কথা ভাবুন)। হীয়ারের ভাষায়, তিনি বলতে চাইছেন, "Behold your God, a poor and helpless child, the ox and the ass beside him.... Your God is of your flesh, He lives in your nearest neighbour, in every man, for all men and your brothers." প্রচণ্ডভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে একি

সাম্যের বাণী শুনছি ! এ যে রামকৃষ্ণের 'জীবরূপী শিবসেবা'র প্রতিধ্বনি !

এমনিভাবে রামকৃষ্ণকে দেখতে হবে : কামকাঞ্চনত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী (outsider), আবার সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ জীবের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গিত করুণাঘন গুরু। তাঁর শ্রেষ্ঠ বর্ণনা পাই বিবেকানন্দের My Master (মদীয় আচার্যদেব) প্রবন্ধে, স্বামী সারদানন্দ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'-এ এবং ১৮৮২-৮৬ পর্যন্ত ডায়েরীর আকারে সংকলিত, শ্রীম-র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে। ম্যাক্সমূলরের Ramakrishna : His Life and Sayings (১৮৯৮)-কে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন (tribute) আখ্যা দেওয়া চলে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের The Face of Silence (১৯২৬) মাঝে মাঝে গভীর উপলব্ধির চিহ্ন বহন করে। ১৯২৯ সালে রোম্যাঁ রঁলা যে The Life of Ramakrishna লেখেন তার অধিকাংশ উপাদান নেওয়া হয়েছে, সারদানন্দ ও শ্রীম থেকে। ১৯৬৫-তে বেরোয় ইশারউডের Ramakrishna and His Disciples —সারদানন্দের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু প্রাণস্পর্শী। ১৯৬৬ (১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)-তে স্বামী গম্ভীরানন্দ—'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' নামে তিন খণ্ডে বিবেকানন্দের যে প্রামাণ্য জীবনী লেখেন, তারও মূল উপাদান ঐ দুটি গ্রন্থ। অতিসাম্প্রতিক Les Hixon-এর Great Swan (১৯৯২) বড় বেশি আবেগপ্রবণ আর নিখিলানন্দ-নির্ভর।

কি চিত্র এতে পাচ্ছি ? রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি—তিনি আবার আমাদের হারানো ঈশ্বর ফিরিয়ে দিলেন। সে ঈশ্বরকে ব্রাহ্মসমাজের বিতর্কে ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক কলহে আমরা হারাতে বসেছিলাম। তিনি বললেন, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, বাকী সব অবস্তু, তিনিই একমাত্র নিত্য, বাকী সব অনিত্য। তাঁকে 'যো সো করে' পেতে হবে। আর পেতে গেলে সগুণ-নির্গুণ, সাকার-নিরাকার, দ্বৈত-অদ্বৈত, জ্ঞানভক্তি কোনটা ঠিক তা নিয়ে কচকচি বা বিবাদ চলবে না। চাই বিচার, বিবেক, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তিনি-মা, আমি-ছেলে, এই একান্ত নির্ভর শরণাগতি। এমন অভিজ্ঞতা ছাড়া ধর্ম একটা মৃতবস্তু।

এমন ধর্ম আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অতিবুদ্ধিবাদী অনুশীলন ধর্ম নয়, আবার রামমোহন রায় থেকে কেশব সেন পর্যন্ত নানা ধর্মের সার নিয়ে যে eclectic ব্রাহ্মধর্ম চালু হয়েছিল, তাও নয়। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তার ভাষ্য, টীকা কিছুই জানা ছিল না এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের। কিন্তু তিনি ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলেন অপরোক্ষানুভূতি। তার জন্য সব রকম সাধনাই করেছিলেন —ইসলাম এবং খৃষ্টধর্মও বাদ যায়নি। অধ্যাত্মরাজ্যে এ যেন কোপার্নিকাস, গ্যালিলেও, নিউটনের বিপ্লব। স্বয়ং কালী হয়তো তাঁকে কিছু সাহায্য করেছিলেন ; যোগেশ্বরী, তোতাপুরী, জটাধারীরা হয়তো শাস্ত্রীয় মতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ যেন সবগুলিকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালালেন এবং সাধনার শেষে দেখলেন—এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি এবং তাঁর শক্তি (ব্রহ্ম ও কালী) অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম, যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী, তখন কালী। কোন ধর্মই অনন্য নয়, অভ্রান্ত নয়। "আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না। কি আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না.... এ সব মতুয়ার বুদ্ধি।" আবার বলছেন, "যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে.... হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয় ; তাঁকেই যীশু, তাঁহাকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম।" সেজন্য রামকৃষ্ণ নিলেন সমন্বয়ের পথ। 'যত মত তত পথ' এ

যুগের মহাবাক্য। ঈশ্বর মত নন, তিনি পথের শেষ। সচ্চিদানন্দ সাগরে সব সাধনার নদীর সঙ্গম।

তিনি সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূল উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। অদ্বৈত ও দ্বৈতের বিরোধ ভঞ্জন করতে গিয়ে বোঝালেন—যে ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর, যাঁকে দেখলে সব বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, তাঁর সংখ্যা গুনবে কে? "তিনি এক দুই আরো কত কি।" যাজ্ঞবল্ক্য জীবনের শেষে একই কথা বলেছিলেন—দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতঃ। সাকার-নিরাকারের ব্যাপারে বললেন, "ভক্তি হিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়...জলে জল" (অর্থাৎ নিরাকার)। একটা ঠিক জানলে অন্যটাও জানা যায়। তিনি জানিয়ে দেন। ভক্তির যা অন্তর্দশা, তাই বেদান্তের সমাধি। আর প্রতিমাপূজা নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের এত আপত্তি কেন? প্রতিমা উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণের সোপান —মৃন্ময়ী রূপে চিন্ময়ী। ব্রাহ্মরাও কি ঈশ্বরকে পিতা (দেবেন্দ্রনাথ) রূপে, মাতা (কেশব) রূপে ভজনা করেন না? ঈশ্বর লাভের পর এ সবের দরকার থাকে না। এমন কি গায়ত্রীও লোপ পায়।[৫৪]

রামকৃষ্ণ নিজে নানা ভাবে ঈশ্বরকে আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন—কখনও সাকারে, কখনও নিরাকারে, কখনও সগুণে, কখনও বা নির্গুণে। এক ধরনের সাধনা তাঁর কাছে 'আলুনি' লাগাত। তাছাড়া তিনি আধারের ভাবানুযায়ী সাধনার প্রণালী স্থির করতেন। "যার যা পেটে সয়, মা সেই রূপ ব্যবস্থা করেছেন।" যার ভক্তি ভাব প্রবল, তাকে জোর করে জ্ঞানের পথে আনা ঠিক নয়। "ভাব মুখে থাক"—তাঁর দ্বিতীয় মহাবাক্য। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথেরা কেউই আধারের মূল্য দেননি, সবাইকে এক ছাঁচে ঢালতে চেয়েছিলেন—যা মনস্তত্ত্ব বিরোধী।

অবতার, গুরুবাদ ইত্যাদি ব্যাপারে ব্রাহ্ম সমাজের আপত্তি তিনি মানতেন না, কিন্তু এমন ব্যাখ্যা করতেন যা অভিনব অথচ যুগোপযোগী। কাঁচা গুরু সম্বন্ধে তিনি বারবার সতর্ক করে গেছেন। পূর্ণজ্ঞানী ছাড়া গুরু হয় না। আর ঈশ্বরের চাপরাস না পেয়ে লোক শিক্ষা দিতে যাওয়াকে পরিহাস করেছেন। এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর উদাহরণ। কর্তাভজাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য শুনে মনে হয়, কর্তা অর্থাৎ গুরুকে ঈশ্বর বোধে ভজনা করা তিনি পছন্দ করতেন না। ঈশ্বরই গুরু, তিনিই ইষ্ট। রামকৃষ্ণ মন্ত্র দিতেন না, সাধনা প্রণালী বুঝিয়ে দিতেন, কখনো মাঝে মাঝে (যেমন বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে) স্পর্শ দ্বারা জাগিয়ে দিতেন। যাকে 'সিদ্ধাই' বলে তা ছিল তাঁর। কিন্তু বারবার সে বিষয়ে সাবধান করে গিয়েছেন।

রামকৃষ্ণের মানবতাবাদ পশ্চিমী মানবতাবাদ থেকে পৃথক—যেমন secularism পৃথক 'যত মত তত পথ' ধারণা থেকে। এই পৃথিবীর সব অশুভ অমঙ্গল রামকৃষ্ণ এক পরমানন্দে, অনন্তে বিশ্বাসে উড়িয়ে দিতেন না। শুধু এই অশুভের (mal) বিরুদ্ধে লড়ার এক বেদনাকরুণ ও বীরোচিত আচ্ছন্নতাবোধ (যা বিবেকানন্দে দেখি) তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি তাকে অদ্বৈতবোধের মধ্যে সমন্বিত করতে পেরেছিলেন—যার প্রতীক কালী—বিবেকানন্দ যাঁকে মৃত্যুরূপা মাতা বলেছেন। গ্রিক সোফিস্টদের মধ্যে পশ্চিমী ধরনের মানবতাবাদের প্রথম উচ্চারণ শুনি। র‍্যানেশাঁসে তা জোরদার হয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা তাকে আরো প্রসারিত করে। তার কোন দিক ধর্মবিপ্লবের ফলে, কোন দিক ফরাসী বিপ্লবের ফলে, সমৃদ্ধ হয়। শেষে অগুস্ত কোঁৎ ও জন স্টুয়ার্ট মিল তাকে প্রায় ধর্মের স্তরে তোলেন। তখনকার কলেজে পড়া ছাত্র—নরেন্দ্রনাথের মত—অনেকেই

এমন মানবতাবাদ মেনে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু দেখালেন, আগে ঈশ্বরে আরোহণ করতে হবে, তাঁকে ভালবাসতে হবে ; পরে মানবে অবরোহণ এবং তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখে তাকে সত্যকার ভালবাসা। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই পঞ্চভূত, জীবজগৎ ইত্যাদি হয়েছেন। ছাদে উঠলে যেমন বোঝা যায় ছাদ ও সিঁড়ি একই মশলায় তৈরি, তেমনই ঈশ্বরে উঠলে বোঝা যায় তিনিই সব। জীবকে শিবরূপে না দেখলে তার প্রকৃত সেবা করাও যায় না। এ কথাই তিনি বিবেকানন্দের সামনে একদিন বলার পর তাঁর সাধনের ধারাই বদলে যায়।[৫৫]

এদিকে শুষ্ক জ্ঞানের রাজ্যে ঘুরে ঘুরে নরেন্দ্রনাথ দত্ত শান্তি পাচ্ছিলেন না। সেই সময় তিনি বি.এ. ক্লাসে দর্শনের ছাত্র (১৮৮১-৮৩)—পাশ্চাত্যদর্শন অর্থাৎ মিল, কোঁৎ, স্পেন্সার, হিউম, কান্ট ও হেগেল-এ ডুবে আছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিচারণে পড়ি—পাশ্চাত্য দর্শন নরেনের তীব্র আত্মিক সংকট সৃষ্টি করল। মিলের মত তিনিও সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময় স্বভাবের সঙ্গে সৃষ্টির অমঙ্গলকে সমন্বয় করতে পারলেন না। রুদ্ধশ্বাস হলেন হিউমের সংশয়বাদ ও স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদে। আদি ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে বহু পঠিত এমার্সন, থিওডোর পার্কার প্রভৃতির transcendentalism এবং স্কটিশ দার্শনিকদের intuitionism তাঁকে শান্তি দিতে পারল না। অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেবের বক্তৃতায় তিনি প্রথম শুনলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কথা। যখন অপরোক্ষ ঈশ্বরানুভূতির জন্য তিনি ব্যাকুল, তখনই দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আগমনের দিন, রামকৃষ্ণ তা দিলেন। তারপর ভালবেসে (আর সে কি ভালবাসা) বুঝিয়ে, আপন জীবনে দেখিয়ে, কখনও গানের সুরে, কখনও সমাধির প্রশান্ত স্তব্ধতায় নরেনের বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করলেন রামকৃষ্ণ। ৪ অক্টোবর ১৯২৬ রম্যাঁ রঁলার দিনপঞ্জীতে পড়ি, "রামকৃষ্ণ যেখানে সাধারণ মানুষ সেখানে তিনি অভিজাত, রামকৃষ্ণ যেখানে অমননশীল সেখানে যিনি অতিসংস্কৃত এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্য অহংকারী—তাঁকেই দামাস্কাসের পথে পলের মতো রামকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়েছিল।" পিতার মৃত্যুর পর শেষ আত্মিক সংকট কাটল এক মিস্টিক অভিজ্ঞতায়—যাকে ঠাকুর কালীমানা বলেছেন। নরেন্দ্রনাথ এতদিনে কালীর সর্বগ্রাসী অদ্বৈততত্ত্ব বুঝলেন।[৫৬]

কিন্তু নির্বিবাদে নির্বিকল্প সমাধির দিকে অগ্রসর হতে তিনি পারলেন না। কাশীপুরের বাগানবাড়িতে এল ঠাকুরের অপ্রত্যাশিত তীব্র ভর্ৎসনা—"ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা!"[৫৭] তখনই তিনি তাঁকে একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত হতে, জীব কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে, আদেশ দিয়ে যান। রামকৃষ্ণ বারবার বলতেন, ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নরেনের আগমন। সে শুধু "আত্মনোমোক্ষার্থম" নয়, তা "জগৎ হিতায় চ"।

"জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষার ও উদারতার জমজমাট" গুরু বিদায় নিলেন ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট। প্রব্রজ্যায় চললেন নরেন্দ্রনাথ,অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, যেমন শত যুগ ধরে চলেছেন ভারতের সন্ন্যাসীরা। গুরু দেখেছেন, শাস্ত্র পড়েছেন, এবার মাতৃভূমি। কি দেখলেন তিনি? দেখলেন—পথের দুধারে পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, রুগ্ন, অশিক্ষিত, জীবরূপী শিব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—যাঁরা ধর্মের রক্ষক—তাঁরাই করছেন শোষণ, শাস্ত্রের নামে, স্মৃতির দোহাই দিয়ে। জাতিভেদ সৃষ্টি করে সমাজ দেহ

শত খণ্ড করছেন বলে অধিকাংশ হিন্দু আজ অস্পৃশ্য। ধর্ম আশ্রয় করেছে ভাতের হাঁড়, নারী হয়েছে সন্তান ধারনের যন্ত্র, নরকের দ্বার। আবুরোডে তাঁকে দেখে হরিভাই-এর মনে হল, "তাঁর হৃদয়টা একটা বড় কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে পাক করে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি হচ্ছে।"

গ্যোটে যাকে বলেছেন wanderjahre (or wander years), সেই তীর্থযাত্রার শেষে মলম তৈরির একটা পরিকল্পনা এল। আমেরিকা পৌছে এক চিঠিতে লিখছেন রামকৃষ্ণানন্দকে, "একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরোর ওপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা, পাজীবেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।....আমাদের জাতটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্য ভারতের এত দুঃখ কষ্ট। ....নীচ জাতকে তুলতে হবে,... তাদের ওঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে—গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে।... ধর্মের দোষ নেই, লোকেরই দোষ। এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি দশপনর জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তার পর ঘুরলাম। ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে !!!—তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজগার করব, করে দেশে যাব, আর আমার বাকী জীবন এই এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করব।"[৫৮] কি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, কি নির্ভীক সিদ্ধান্ত! উনিশ শতকের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নবদিগন্তের উন্মোচন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে এতদিনের প্রতিক্রিয়া ছিল—নির্বিচার বর্জন বা নিরঙ্কুশ গ্রহণ। প্রথমটার পেছনে ছিল শূন্যগর্ভ শ্রেয়োমন্যতা, দ্বিতীয়টার পেছনে দাসমনোবৃত্তিসুলভ অনুকরণ। কোনটাই সুস্থ, স্বাভাবিক, বিচারসিদ্ধ নয়। অনুকরণবাদীরা জোর দিল ধর্ম ও সমাজসংস্কারের ওপর, তাদের বিকৃতির গভীরে না গিয়ে। বর্জনবাদীরা জোর দিল হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যের ওপর। তারা লক্ষ্য করেনি যে কালগুণে তা স্থবির হয়ে পড়েছে, ভাষ্যটীকা দেশাচারের জালে জড়িয়ে পড়েছে তার গতি, যুগোপযোগী পরিবর্তনের ক্ষমতা। বিবেকানন্দের পূর্বে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন পশ্চিমী সভ্যতা যে চ্যালেঞ্জ এনেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন বিদেশী বিজয়ীর দল তা আনেনি। তার নাম বিজ্ঞান, কৃৎ কৌশল, ব্যবহারিক নৈপুণ্য, অর্থবিনিয়োগ করার বুদ্ধি, সংগঠনী শক্তি, উৎপাদন বাড়িয়ে দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষমতা। এর মোকাবেলা করতে গেলে এর থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে হবে, তবে আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়ে।

পরাধীন দেশের এই স্বাধীন সন্ন্যাসী বললেন, বিনিময় একতরফা হবে না। পাশ্চাত্যের অর্থ ও বিজ্ঞান তিনি নেবেন কিন্তু প্রাচ্যের অধ্যাত্মতত্ত্বের মূল্যে। জড়বিজ্ঞান ও বস্তুতন্ত্র, ঐহিক সাফল্য ও ব্যক্তিগত ভোগ জর্জরিত পশ্চিমকে তিনি দেবেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূলতত্ত্ব—সমন্বয়, হিন্দুধর্মের মূলবাণী—অদ্বৈত। তিনি শোনাবেন: ধর্ম অসীম, অনন্ত তার পদচিহ্ন, সেখানে জ্ঞানকর্ম ভক্তি সকলেরই স্থান রয়েছে, কোন ধর্মের/জাতির শ্রেষ্ঠতা নেই, এমন কি পূর্ব পশ্চিমের ভেদও নেই। তিনি শোনাবেন—ঈশ্বর সমরস, একত্বের উপলব্ধিই ঈশ্বরোপলব্ধি। জ্ঞানীর লক্ষ্য—তাঁকে সর্বব্যাপী সমষ্টিভূত বলে জানা আর ভক্তের লক্ষ্য—তাঁকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমষ্টিকে ভালোবাসা। রম্যাঁ রঁলা

দিনপঞ্জীতে (১৩ মে, ১৯২৭) লিখছেন, "তিনি চাইতেন আন্তর প্রবাহের নিরন্তর স্বাধীনতা।" ধর্ম স্ববিরোধিতাকে ভয় করে না। তা হবে "সকল মানুষের মনের উপযোগী—সমভাবে দর্শনমূলক, তুল্য রূপে ভক্তিপ্রবণ, সমভাবে মরমী এবং কর্ম প্রেরণাময়।" এজন্য আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে তাঁর অধিকাংশ ভাষণ ছিল যোগের ওপর। রম্যাঁ রঁলার ভাষায়, "স্বামীজী চার যোগের চৌঘুড়ি হাঁকাতেন।"

তিনি যে সময় আমেরিকা যান তখন এমার্সন ও থোরোর transcendentalism-এর প্রেরণা অবসিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও শিল্পের অসাধারণ উন্নতির ফলে এসেছে ধনকুবেরদের যুগ— 'gilded age', আর তাদের মনোমত দর্শন— pragmatism. বস্তুতন্ত্রের পরিণাম: কর্মের জন্য কর্ম, সাফল্যের জন্য ইঁদুর দৌড়, Social Darwinism-এর প্রয়োগে দুর্বলের বিনাশ, যান্ত্রিক পরিবেশে মূল্যবোধের অবক্ষয়। স্বামীজির যোগশিক্ষা ছিল তার প্রবল প্রতিবাদ। বিবেকহীন দৈত্যের বিবেক জাগ্রত করেছিলেন সার্থকনামা বিবেকানন্দ। সারা বুল, লেগেট দম্পতি, জোসেফিন ম্যাকলড, মার্গারেট নোবল, জেভিয়ার দম্পতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৫৯] মহাযুদ্ধের পর রঁলা রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন (২৬ অগস্ট ১৯১৯), ইওরোপ ও এশিয়া পরস্পরের চিন্তার সাহায্য প্রার্থী, "There are the two hemispheres of the brain of mankind. It is necesary to reestablish their union and their development." একথা তিনদশক আগে বুঝে প্রাচী-প্রতীচির মধ্যে বিবেকানন্দ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন অদ্বৈতবাদের সেতু।

সম্প্রতি এডিনবারার অধ্যাপক জে. এল. ব্রকিংটন তাঁর A Short History of Hindusim গ্রন্থে বলেছেন, বিবেকানন্দ খৃষ্টীয় মিশনারীদের অবদান স্বীকার করেননি, তাঁর জীবসেবার ধারণা সংগ্রামী ও আগ্রাসী। তাঁর পেছনে কাজ করছে এক ধরনের মরমীয়া দেশপ্রেম—রামকৃষ্ণের নিখাদ অধ্যাত্ম প্রেরণা নয়।[৬০] এ কথা মানা যায় না। বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছেন, সব ধর্মই যদি সত্য হয়, তবে ধর্মান্তরকরণের সার্থকতা কোথায়? তিনি ত' কোন খৃষ্টানকে হিন্দু করতে চান না। তিনি চান, "মেথডিস্টকে আরো ভালো মেথডিস্ট করতে, ব্যাপটিস্টকে প্রেসবিটেরিয়ানকে আরও ভালো ব্যাপটিস্ট বা প্রেসবিটারিয়ান করতে।" হিন্দুর মুক্তি খৃষ্টান হওয়া নয়, আরো ভাল হিন্দু হওয়ায়। স্বদেশে ফিরে হিন্দুদের তিনি কেমন কশাঘাত করেছিলেন, ব্রকিংটন সাহেব তা পড়লে আর chauvinism-এর কথা তুলতেন না।[৬১]

মিশনারীদের অনুকরণে ব্রাহ্মরা হিন্দু সমাজ ত্যাগ করেছিলেন, তা অবশ্য বিবেকানন্দর ভালো লাগেনি। ভিতরে থেকে, ভালোবেসে সমাজকে বদলাবার চেষ্টা করলে হয়তো তাঁরা আরও সফল হতেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। অন্যদিকে নব্যহিন্দু প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করেননি বিবেকানন্দ। আর্য সমাজ শুধু সংহিতাকে প্রামাণ্য স্বীকার করে—বেদান্তকেও নয়। তাদের অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতা কেবল ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের পরবর্তী হিন্দুধর্মের সমস্ত ধর্ম দর্শনের সম্বন্ধেও। তাদের গোমাতা পূজাকে ত' তিনি পরিহাসই করেছেন। ঠিক তাই শশধর তর্কচূড়ামণির অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে। তার চেয়েও বড়ো কথা—রামকৃষ্ণকে অবতার, ঈশ্বর ইত্যাদি বলে পূজা করা বা তাঁকে কেন্দ্র করে নূতন এক সম্প্রদায় স্থাপন তিনি পছন্দ করতেন না। "রামকৃষ্ণ এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নেই। হরে, হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও

যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি। আজ ঘন্টা হলো, কাল তার ওপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, এর নাম imbecility. কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।" অথচ "এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। ... সাক্ষাৎ ভগবান নর নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে।[৬২] আবার শিবানন্দকে লিখছেন, "তস্য দাস-দাস-দাসোহহম্ তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তার ভাবের ব্যাঘাত হয়। তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবতী হক। তিনি কি নামের দাস ?"[৬৩] রামকৃষ্ণ অবতার, এমন কি অবতার বরিষ্ঠ, এ'ত তিনি নিজেই লিখে গেছেন, তবে অন্য শিষ্যদের মত এর ব্যাখ্যা করেননি। এখানেই আধুনিক প্রগতিশীল মন কথা বলে উঠেছে। অবতার মানে—যাঁরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। অন্যতম গোঁড়া শিষ্য রামকৃষ্ণানন্দকে তাই লিখছেন (১৮৯৫), "বেদ বেদান্ত, আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেননা, He was the explanation. এখন থেকে সব ভেদাভেদ উঠে গেল। আচন্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান ভেদ, সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন...হিন্দু মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল।"[৬৪]

কি শিক্ষা এই অবতারের ? "এ অবতারের শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের উৎকৃষ্টভাব এক করে নূতন সমাজ তৈয়ারি করতে হবে। এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নতুন ধর্ম, নূতন বেদ।" তার ভিত্তি অদ্বৈত। দ্বৈতভাব আশ্রয় করে থাকলেও—রামকৃষ্ণ বলতেন, "অদ্বৈত রত্ন আচলে বেঁধে যা খুশি করগে যা।"

বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন অদ্বৈতবাদীদের একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। তিনি "বনের বেদান্ত"কে ঘরে আনতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের সময় থেকে যে বেদান্ত সন্ন্যাসীদের অবলম্বন ছিল এবং তাদের সঙ্গে পাহাড়ে, বনে, লোকালয়ের বাইরে, চর্চিত হচ্ছিল—তাকেই মানব হিতের কাজে লাগাতে হবে। যা ছিল নির্বিকল্প সমাধির উপায়, তাকেই তিনি পরিপূর্ণ জীবনচর্যার উপায় করতে চাইলেন। পশ্চিমে থাকার সময় অদ্বৈত প্রসঙ্গে বললেন—মানুষ স্বরূপতঃ মুক্ত, অমৃতের পুত্র ; মায়ায় বদ্ধ হয়ে সে নিজেকে বদ্ধ ও পাপী মনে করে। খৃষ্টান ধর্মও তাই শেখায়। পাপী বলেই তার প্রয়োজন ঈশ্বরের কৃপা (grace), তাকে নির্ভর করতে হয় ঈশ্বরের নির্বাচন (election)-এর ওপর। কিন্তু অদ্বৈত বলে—ইচ্ছা করলেই সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত জগজ্জাল থেকে বেরোতে পারে। "অবিদ্যা ও অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হয়ে সে কখনও শয়তানকে দোষ দেয়, কখনও আঁকড়ে ধরে ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে, তাকে মনে করতে হবে আমরাই আমাদের অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই ডেকে আনছি মঙ্গল ও অমঙ্গল। কিন্তু আসলে আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, জাত নেই, সম্প্রদায় নেই, বাপ মা বন্ধু শত্রু নেই। আমিই সে—সৎ, চিৎ ও আনন্দ।" গোঁড়া খৃষ্টধর্মের প্রতি এমন চ্যালেঞ্জ কেউ ছুঁড়ে দেয়নি।

তাই বলে নিজের দেশবাসীদের ছেড়ে কথা বলেননি তিনি। 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করতে চাহে ; যেথায় ক্রুরকর্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ ; বিদ্যা কেবল পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব

কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে...রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিচার না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ?"[৬৫] ভারতে সত্ত্ব নেই, রজঃ নেই, তাকে গ্রাস করেছে তমঃ। তমঃই এনেছে ভয়, ছুঁৎমার্গ, প্রবলের কাছে নতি, দুর্বলের ওপর অত্যাচার। তার সঙ্গে লড়াই করতে চাই, অভীঃ—লৌহের মত পেশী, বজ্রের মত স্নায়ু। অদ্বৈত আনবে অভয়, দেবে আত্মোপলব্ধি। "Arise, awake, and stop not till the goal is reached. Arise, awake! Awake from this hypnotism of weakness. None is really weak, the Soul is infinte, omnipotent and omniscient. Stand up, assert youself, proclaim the God within you, do not deny Him"....[৬৬]

অভয় প্রথম, তারপর কর্মযজ্ঞ—জীবরূপী শিবসেবা। নিজের মিশন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধু দেশব্যাপী জড়ত্বের সঙ্গেই তাঁকে লড়তে হয়নি, লড়তে হয়েছে আপন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে। তাঁরা বেদান্তের আধ্যাত্মিক উপদেশের ওপর জোর দিয়েছেন, জোর দিয়েছেন রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপদেশের ওপর। বিবেকানন্দ কি তার উলটো স্রোতে যেতে চাইছেন না ? বিবেকানন্দ বললেন, গুরুদেবই তাঁর ওপর এ ভার চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। তাছাড়া কর্মযজ্ঞের ফলই ত' অধ্যাত্মোপলব্ধি। কর্ম চিত্তশুদ্ধির উপায়—গীতাই বলে গেছে। তাছাড়া কর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চতুর্বিধ দান—অন্নদান, স্বাস্থ্যদান, শিক্ষাদান, ধর্মদানের—মধ্যে অন্তিম এবং শ্রেষ্ঠ দান—ধর্মদান। খেয়ে পরে সুস্থ হয়ে সাক্ষর হয়ে তবেই ত' মানুষ ধর্মদানের যোগ্য হবে। তখন জ্ঞানালোক দিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগাতে হবে। পরমাণুর অন্তস্থ শক্তির বিস্ফোরণে যেমন জগৎ উড়ে যায়, তেমনি আত্মার শক্তির বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সব সামাজিক গ্লানি, এমনকি পরশাসন। নেতি নেতি করে নয়, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ইতি ইতি করেই স্বামীজির বেদান্ত ভাষ্য রচিত হয়েছে। এই তাঁর বনের বেদান্ত ঘরে আনা।

অবশ্যই এর ফলে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে আমাদের জাতীয়তাবাদে একটা প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। দেশের মানুষ ছিল বিবেকানন্দের চোখে একমাত্র জাগ্রত ভগবান—সর্বত্র তাঁর হাত, পা, কান, সর্বব্যাপী তিনি। রোম্যাঁ রঁলা মন্তব্য করছেন, "If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi.....it is due to the initial shock, to the mighty 'Lazarus, come forth' of the message from Madras."[৬৭] 'বর্তমান ভারত'-এর শেষ অনুচ্ছেদ যেন তাঁর উদাত্ত জাতীয়তাবাদের সমুদ্রকল্লোল। অথবা মাদ্রাজের শেষ বক্তৃতা—"আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত ; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। .... তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ?"

এ সবের মধ্যেই উগ্রপন্থীরা ব্রিটিশ বিতাড়নের আহ্বান শুনেছিল, কোন বিশ্বব্যাপী বিরাটের পূজার আহ্বান নয়। তারা অধ্যাত্মের সামনে রেখেছিল রাজনীতিকে, যাকে বিবেকানন্দ বলতেন 'the dance of devil in man'. তা মানুষকে এক করে না, বিচ্ছিন্ন করে। তারা ভারতবর্ষকে (কখনও বা নিজ প্রদেশকে) বিশ্বের ওপর স্থান দিয়েছিল।

তারা লক্ষ্য ও উপায়ের অভিন্নতা স্বীকার করেনি। বৈদান্তিকের কাছে 'আমি' ও 'সে'র বিভেদ নেই, কিন্তু উগ্রপন্থীদের কাছে সেটাই চরম এবং অরবিন্দ বলছিলেন, 'আমরা' দেবতার দলে, 'তারা' অসুরের দলে। নানা ভাবে তাঁর বাণীকে রাজনীতির প্রয়োজনে বিকৃত করা হয়েছে।[৬৮] এই প্রসঙ্গে তাঁর Socialism-এর কথাও ওঠে। তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে socialist আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া শূদ্র বা অস্পৃশ্য জাতির উৎকর্ষ সাধন, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ইত্যাদি আমাদের মনে সেরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করে। তথাকথিত নীচ জাতিরা যে ভারতের ভবিষ্যৎ সে আশা তিনি পোষণ করতেন, শূদ্র যুগ আসবেই, এমন কথা বলতেন। তবু আমার ধারণা তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণী-সমন্বয় (যেমন যোগ-সমন্বয়)। মেরী হেলকে লেখা ১ নভেম্বর ১৮৯৬ চিঠি বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রের দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তির ঘোর সংকীর্ণতা, কিন্তু বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ক্ষত্রিয় শাসন বড় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী কিন্তু ক্ষত্রিয়রা অনুদার ছিলেন না। এ যুগে শিল্প ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। তারপর বৈশ্যযুগ। "এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ।" কিন্তু সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের ভাবরাশি বিস্তৃত হলেও সভ্যতার অবনতি শুরু হয়। "সর্বশেষে শূদ্র শাসন যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ কমে যাবে।" যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়—"যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ তাদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?" শূদ্র যুগ আসবেই, কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। "কিন্তু আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এই নয় যে, আমি ঐ মত, সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা ভাল'—এই হিসাবে।"[৬৮ক] অনেকটা হেবরের (Weber) মতই তিনি circulation of the elite চেয়েছিলেন তার প্রমাণ পাই 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ'এ।[৬৮খ]

ইতালীর র‍্যানেশাঁস যে ধরনের বিশ্ববীক্ষা ও জীবনচর্যার মডেল, তা বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োগ করা চলে না। র‍্যানেশাঁসের ব্যক্তি আপন সর্বোত্তম বিকাশের জন্য কোন কিছুর দাবীকে অগ্রাধিকার দিত না। সে moral ও immoral নয়, সে amoral: ধর্মবোধকে সে সৃষ্টির ক্ষেত্রে লাগিয়েছে। যেখানে তার সৌন্দর্যানুভূতি (বা পেট্রনের রুচি)র সঙ্গে ধর্মের বিরোধ বেধেছে, দ্বিতীয়কে ত্যাগ করতে সে দ্বিধা করেনি। মিকেলাঞ্জেলো হয়তো ব্যতিক্রম। র‍্যানেশাঁসে ব্যক্তির দেশপ্রেম জাগেনি—নগর থেকে নগর রাষ্ট্রে আরও লাভজনক জীবিকার খোঁজে সে ভ্রাম্যমান। মানুষের মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কথা সে বলেছে, কিন্তু তার দুঃখমোচনের চেষ্টা করেনি। এখানে বিবেকানন্দ কত পৃথক! তবে একটা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে র‍্যানেশাঁস মানবের মিল পাওয়া যায়—তাঁর বিচিত্র বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা, সাহিত্য-সঙ্গীত-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসে মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভা। কার্লাইলের বীর বিচারে তিনি The hero as Sannyasin. যিনি

'মৃত্যুরূপমাতা' লিখতে পারেন, তাঁর কবিত্ব শক্তি অনস্বীকার্য, 'বর্তমান ভারত' লিখতে পারেন, তাঁর গদ্য রচনার ওজস্বিতা অবিসংবাদিত। ভাষণে, আলাপে, পত্রে তিনি সংস্কৃতি বিষয়ে যে ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন, তাই প্রেরণা দিয়েছিল নিবেদিতাকে, জগদীশচন্দ্রকে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আমাদের বিস্মিত করে। হরিপদ মিত্রর "স্বামীজীর সহিত কয়েকদিন"-এ পদার্থবিদ্যায় এবং রামব্রহ্ম সান্যালের সঙ্গে ডারুইনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় জীববিদ্যায় তাঁর বোধিলব্ধ ভবিষ্যৎদর্শিতা অত্যাশ্চর্য। Unified field theoryর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি। ডারুইনের struggle theory যে Social Darwinism-এ পরিণত হয়ে দুর্বলদের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে---তাও তাঁর অজানা ছিল না। ঠিক ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাংকের কোয়ান্টাম থিওরির জন্ম হয়। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন ও বোরের বিতর্ক --দৃশ্য বস্তু ও দ্রষ্টার সম্পর্ক—তিনি আগে থেকেই অনুমান করে গেছেন। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম পরস্পর বিরোধী নয়, পবিপূবক। উভয়েই চাইছে সত্যকে জানতে, একপক্ষ বস্তুর দিকে থেকে, আরেক পক্ষ আত্মার দিক থেকে। প্রথম পক্ষ কোন দিনই পারমার্থিক সত্যকে জানতে পারবে না---যতই না স্টিফেন হকিং দাবী করুন। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, পাশ্চাত্যের মুজিয়াম ঘুরে দেখা ছিল তাঁর বাতিক। মেরী হেলকে লেখা পত্রে, রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনায়, নিবেদিতা ও ম্যাকলডের স্মৃতিচারণে বারংবার তাঁকে ভারতীয় শিল্পের আদর্শ বোঝাতে দেখি। [৬৮গ] নিবেদিতার মাধ্যমে তাতে লাভবান হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালরা।

৯

ঐতিহ্যের সাহায্যে আধুনিকীকরণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—রবীন্দ্রনাথ। কি বিশ্ববীক্ষায় কি জীবনচর্যায় (জীবনশিল্প কথাটি অন্নদাশঙ্করের), কি সাধনার বৈচিত্র্যে, কি তার অসামান্য সিদ্ধিতে তাঁর তুলনা নেই। ইউরোপের র‍্যানেশাঁস শিল্পের শিখর স্পর্শ করেছিলেন মিকালেঞ্জেলো, র‍্যানেশাঁস সাহিত্যের—সেক্সপীয়র। উনিশ-বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতি র‍্যানেশাঁস হোক বা না হোক, শিল্প ও নাটক ছাড়া সৃষ্টির অন্য সকল বিভাগে রবীন্দ্রনাথের মত এমন মৌলিক পারদর্শিতা আর দেখা যায়নি। কাব্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ডায়েরী, চিত্র, সর্বোপরি গান—এ যেন এক সঙ্গে গ্যোটে, মোৎসার্ট, মোপাঁসা, তলস্তয়ের সমারোহ।

রামমোহনের ভারতপন্থা বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হয়নি। তাতে জ্ঞান ছিল, কর্ম ছিল, বহুজনের হিতের কথাও ছিল, কিন্তু ভক্তি ও সৌন্দর্য সাধনা ছিল না। মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র রসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন জীবনকে। কিন্তু আত্মদ্বন্দ্ব মাইকেলকে অনেকটা পঙ্গু করেছিল, যেমন প্রচার বঙ্কিমের সৌন্দর্য সৃষ্টিকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দের মতই) এমন এক অধ্যাত্মচেতনায় অভিষিক্ত ছিলেন যে সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখেছিলেন ঐক্য, মঙ্গল, শান্তি। দেখেছিলেন—ঈশ্বর শুধু জ্ঞান ও ক্রিয়া নন, আছেন রূপে, রসে, আনন্দে। রসোবৈসঃ রসহ্যেবানন্দলব্ধীভবতি। আনন্দ রূপমমৃতম্। রসের পথ প্রেমের পথ। মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর সবই সে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা। সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প তারই অভিসার, তারই প্রকাশ। সে প্রেম কখনও ছন্দে, কখনও সুরে, কখনও রঙে দুলবে, বাজবে, ফুটবে। সংসারের কাজ, সমাজের কাজ, বিশ্বমানবের জন্য কাজ তখন ভার ঘুচিয়ে সেই নটরাজের তালে তালে নাচবে।

বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা বারংবার বাংলার রূপ দেখি। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এ নদীমাতৃক বাংলা দেশের গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে সাহিত্যের পটভূমিকা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতায় শুরু হলেও তাদের সমাপ্তি ঘটেছে এক নৈর্ব্যক্তিক, কিছুটা বা উদাসীন, বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতায়। 'পোস্ট মাস্টার', 'এক রাত্রি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি'—চারটি গল্পের শেষ পর্ব যেন কবিতা হয়ে উঠেছে। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা চূড়ান্ত। কে এমন ভাবে ফোটাতে পারত শিশু বা কিশোরের মনস্তত্ত্ব (আপদ, ছুটি), বালিকা বধূর যৌবনোদগম (সমাপ্তি), হৃদয়হীনা নারীর অলঙ্কার নিয়ে obsession (মণি-হারা), পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (ত্যাগ), স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (স্ত্রীর পত্র), এবং অনেক কাহিনীতে—সংসারের ভালো মানুষের দুর্ভোগ ? কিন্তু রতনের মুখচ্ছবি বিশ্বের অন্তর্গূঢ়, অব্যক্ত এক মর্মব্যথা প্রকাশ করে ('যেতে নাহি দিব'র মত) ; সেকেন্ড মাস্টারের বঞ্চিত জীবনে ক্ষণকালের জন্য অনন্ত রাত্রির আকাঙ্ক্ষা জাগে ; মিনির প্রতি কাবুলিওয়ালার স্নেহ বাংলা ও কাবুলের সমস্ত পিতৃহৃদয়কে এক সূত্রে বাঁধে। শরৎচন্দ্র মোটামুটি এক পথ নিয়েছেন, যদিও মহেশ এবং অভাগীর স্বর্গ-এ বাস্তবতা অনেক বেশি রূঢ়। পল্লীসমাজে স্পষ্টতই ভাঙন ধরেছে, সহরের এবং কলকারখানার টান প্রবল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ১৯০৭ সালে 'গোরা' রচনার সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশকে অতিক্রম করে গেছেন। সেখানে ভারতবর্ষই যেন নায়ক—এক অনুদার আবেগপ্রবণ অসহিষ্ণু ঐতিহ্যের হাত থেকে, জাতিধর্মবর্ণের সব সংকীর্ণতা থেকে, মুক্তি চাইছে পরম ঐক্যের উপলব্ধিতে। তাঁর ভারতবর্ষ শুধু উপনিষদের ভারতবর্ষ নয়, তাতে বাল্মীকি ও ব্যাস, কালিদাস ও বিদ্যাপতি, কবীর ও দাদূ, আউল ও বাউল সকলেরই স্থান।[৬৯] তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যের বিস্তার স্মরণ করায় এলিয়টের বিখ্যাত কয়েকটি বাক্য : "It involves, in the first place, the historical sense, and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence; the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is at the same time that makes a writer more accurately conscious of his place in time, of his own contemporaneity." কবিদের ঐতিহ্য একটা ইতিহাসবিষয়ক অনুভূতি যার মধ্যে অতীত ও বর্তমান অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যাতে ইউরোপীয় (এলিয়টের ক্ষেত্রে) মানস বিবর্তিত হচ্ছে সময়ের সঙ্গে কিন্তু হোমর, সেক্সপীয়ার, এমনকি ম্যাগডেলিয় গুহাচিত্রকেও বাদ দিচ্ছে না।[৭০]

কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরসূরী মাত্রই পূর্বসূরীর কাছে ঋণী। ভার্জিল, দান্তে, সেক্সপীয়ার, গ্যোটে, শেলী বা কীট্স যখন জন্মান, তখন তাঁরা ভবিষ্যৎ কাব্যধারাকেও বদলে দিয়ে যান। তেমনি করেছেন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, বৈষ্ণব কবিরা। মাইকেল তা জানতেন, জানতেন রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি। তাই ব্রাত্য কবিদের আত্মীকরণ করতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। তবে কালিদাসের কাছেই তিনি সর্বাধিক ঋণী।

বারংবার বিদেশ ভ্রমণের ফলে সমস্ত বিশ্ব হয়েছিল তাঁর নীড়। যৌবনের প্রাক্কালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছিলেন রোমান্টিক কাব্য, এলিজাবেথীয় গদ্য, স্কটিশ/আইরিশ মেলডি। ১৯১২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত বারংবার পথে বেরিয়ে সংগ্রহ করেছেন চীন জাপানের ও ইউরোপের অত্যাধুনিক চিত্রশৈলী, বলি ও সিংহলের নৃত্য প্রকরণ, মুক্তছন্দের পরীক্ষা, সমাজ বদলাবার নয়া ভাবনা। নিলেও তিনি অভিভূত হননি। পশ্চিমী সভ্যতার বর্জন করেছেন বেশ কিছু—যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদ, অতিযান্ত্রিকতা, ধনতান্ত্রিক লোভ, সাম্রাজ্যবাদী পেশী আস্ফালন। তবে নানা বিকারের নিন্দা করেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমের বিজ্ঞানমনস্কতা, কর্মোদ্যাম, উদ্‌ভাবনী প্রতিভা, জনকল্যাণকামী সংগঠনী শক্তিকে —সর্বোপরি তাঁরই সমগোত্রীয় বিশ্বপথিকদের, যেমন—ইয়েটস্, কাইজারলিং, রোম্যাঁ রঁলা আইনস্টাইন, দুহামেল, ওকাম্পোকে। রোম্যাঁ রঁলার দিনপঞ্জী Inde (1915-1943) ও Selected Lettersএ তার অনেক প্রমাণ মিলবে। শিলারের ভাষায় এরা বলতে পারতেন, "I am a fellow citizen of those who will come later."

অদ্বৈতবোধ অবশ্যই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণমালায় বারংবার উচ্চারিত হয়েছে উপনিষদের সেই সব মন্ত্র যাতে বহুর মধ্যে একের প্রকাশ, অনেক বর্ণে এক বর্ণের নিহিতার্থ বিধৃত। কিন্তু এই এক বহু ও বিচিত্রকে বাদ দিয়ে নয়। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র স্বতন্ত্র করে দেখলে চলবে না, তারা একই সত্যের দুই পি৺। আধ্যাত্মিক সত্যের ওপর বেশি জোর দিয়ে ভারত ডেকে এনেছে প্রকৃতির মৃত্যুবাণ। আবার প্রকৃতিকে বশ মানাতে গিয়ে পশ্চিম ডেকে এনেছে আত্মার মহতী বিনষ্টি। কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের প্রয়োজন, সামঞ্জস্যও সম্ভব। তার পথ—'পরম আমি'র কাছে 'ক্ষুদ্র আমি'র আত্মসমর্পণ—তখন "অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।" ভারতবর্ষ একদা সর্বত্র পূর্ণকে দেখেছিল। তারপর ভাটার টান পড়ল। কোথায় গেলেন আদিত্যবর্ণ সেই তমসঃপরস্তাৎ পুরুষ? সম্প্রদায়, মন্দির, শাস্ত্র, গুরু,—অচলায়তনের সব দ্বার রুদ্ধ করে প্রহরী সেজে দাঁড়াল। তারা আলো, বাতাস, এমনকি ঐক্যবোধকেও ঢুকতে দিল না। "এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান একের উপলব্ধির অভাবে, যত ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফলতা, দৌর্বল্য সে এই একের বিচ্যুতিতে, যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্য।" এক ও বহুর, ভাব ও রূপের, সীমা ও অসীমের লীলার কবি —রবীন্দ্রনাথ, অসীমের মাঝে সীমার সুর বিস্তার ঘটিয়ে আবার সমে ফিরে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা যে প্রতীকী রূপ নিয়েছে তা—আলো। নীটশের ভাষায় তিনি Apollonian. আলোর ভাবনা আর্য ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবাহিত দুই আর্যসংস্কৃতিতে সবিতা বা অ্যাপোলো একটা বড় স্থান অধিকার করেছিলেন। গায়ত্রীমন্ত্র বরেণ্য সবিতার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের প্রার্থনামন্ত্রের অন্যতম—তমসো মা জ্যোতির্গময়। বাল্মীকির রামায়ণ ও কালিদাসের রঘুবংশ রচিত হয়েছিল সূর্যবংশের মহিমা কীর্তনের জন্য। তেমনি প্রাচীন গ্রিসে অ্যাপোলো—আলোর দেবতা, জ্ঞানের দেবতা, কাব্যসংগীতশিল্পের দেবতা। জ্ঞান ঘটায় চৈতন্যের জাগরণ, কাব্যসংগীত শিল্প—চৈতন্যের বিস্ফারণ। তিনি শুধু আলোর দেবতা ছিলেন না, ছিলেন শৃঙ্খলা, সংযম, সৌন্দর্যের দেবতা। কিন্তু কালক্রমে কি প্রাচ্যে কি গ্রিসে আর এক ধরনের সাধনার আবির্ভাব ঘটল। ভারতবর্ষে অনার্য ও প্রাগার্য ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াল, তার সঙ্গে যুক্ত হল বহিরাগত মধ্য

এশীয় ধর্ম। নানা সংস্কৃতি সংঘর্ষ ও সমন্বয় চেষ্টায় ফলে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব ও শক্তি প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন। তবু দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সূর্যোপাসনার ঐতিহ্য ভালোভাবে বেঁচেছিল, তার প্রমাণ কোনারক। ইসলামের আবির্ভাবের পর শক্তির উপাসনা প্রাধান্য পেল, তা আগেই দেখিয়েছি। চৈতন্য তার থেকেও মাহাত্ম্য দিলেন কৃষ্ণ সাধনাকে। তিনি নিজেই ছিলেন "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ।" যখন এই দুই সাধনার খাতে ধর্মস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, তখন এল ইংরেজরা। ব্রাহ্মধর্ম আবার ফিরে যেতে চাইল উপনিষদের আর্য ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথ তারই পরম ফলশ্রুতি। 'প্রভাত সংগীত', দিয়ে তাঁর আলোক বন্দনা শুরু, 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' দিয়ে শেষ। ততদিনে গ্রিসে ও গ্রিসকে অনুসরণ করে অন্যত্র ডায়োনিশিয় উপাসনা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। প্লেটো ও প্লটিনাসে অ্যাপোলো ফিরে আসার চেষ্টা করেছিলেন, র‍্যানেশাঁসের শিল্পীরা খৃষ্টকে নয়া-অ্যাপোলো বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু ধর্মান্ধতার আঁধি উঠল রেফর্মেশনের সঙ্গে, ঢেকে দিল র‍্যানেশাঁসের আলো। অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিজীবীরা ভাবলেন, অন্ধকারের যুগ শেষ হয়ে তাঁরা age of enlightenment বা আলোকিত যুগ এনেছেন। তা হল না। বিপ্লবের পর বিপ্লব ডায়োনিশাসকে জয়ী করল। রুশ্যো প্রবর্তিত রোমান্টিসিজমে তাঁরই পূজা প্রকট। গ্যোটের Song of Wurther-এ তাঁরই প্রশস্তি।

১০

এখানেই প্রশ্ন উঠবে রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি, অথচ তিনি কি করে ১৯১২ সালে পশ্চিমে নিয়ে গেলেন অ্যাপোলোনীয় আলোর সাধনা? এ জন্য বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁর রোমান্টিকতার বৈশিষ্ট্য, ইংরেজী/ইওরোপীয় রোমান্টিকতার সঙ্গে কোথায় তার মিল, কোথায়ই বা পার্থক্য। একটা সূত্র দেওয়া হচ্ছে। প্রাচ্য মিস্টিসিজম্ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবনাকে এক অভিনব মাত্রা দিয়েছিল।

ইংল্যান্ডের রোমান্টিক কাব্য এক বিশেষ যুগের ফসল। পোপ, ড্রাইডেনরা ছিলেন নিউটনের নিয়মের শেকলে বাঁধা জগতের প্রতিনিধি। রোমান্টিকরা বাঁধাধরা সৌন্দর্যের পূজারী নন। তাদের মূল রয়েছে রুশ্যোর সংজ্ঞায়— "addition of strangeness to beauty" এতে শুধু ফুল, চাঁদ, নারী, সৌন্দর্য ও প্রেমের স্থান নেই। আছে গথিক, অতিপ্রাকৃত। এই কাব্যের অন্যতম প্রধান প্রেরণা প্লেটোর দর্শন, গ্রিক কাব্য ও ভাস্কর্য, বিশেষতঃ তার মিথ ও সিম্বল, অন্যদিকে ডায়োনিশীয় আদিমতা, বন্যতা, উন্মাদনা (entheos).

প্লেটোর চিন্তা শেলীকে প্রভাবিত করেছিল। মৃত কীট্সকে শুধু Adonais বলেই তিনি শান্ত হননি।

> Dust to the dust! but the Spirit shall flow
> Back to the burning fountain, whence it came,
> A portion of the eternal.

কিংবা

> The one remains, the many change and pass,
> Life's like a dome of many-coloured glass,
> Stains the white radiance of enternity.

উভয় উদ্ধৃতিতে eternal, eternity- অনন্তের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা মাটির তলার কীট হতে পারি কিন্তু in love and worship, blends itself with God, প্রেমে ও পূজায় মিলে যাই সেই অনন্ত বা ঈশ্বরের সঙ্গে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের সুর অনুরূপ।

Dust as we are, the immortal spirit grows
Like harmony in music; there is a dark
Inscrutable workmanship that reconciles
Discordant elements, makes them cling together
In one Society.

সেই অজ্ঞেয় অমর শক্তি সমস্ত পরস্পরবিরোধী পদার্থ ও প্রবণতাকে ধরে আছে সূত্রে মণি গণাইব, সংগীতের হার্মনির মত। শুধু অনন্ত, অজ্ঞেয়, অমর নয়—অধরাও। তবু তা প্রতি ক্ষুদ্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যে প্রতিফলিত—

Like hues and harmonies of evening
Like clouds in starlight widely spread
Like memory of music fled. (Shelley, Hymn to Intellecture Beauty)

রোমান্টিক কবিদের অগ্রগণ্য—শেলী ও কীট্‌সে—জীবনের অনিত্যতা ও মৃত্যুচেতনার পাশাপাশি মৃত্যুঞ্জয়ী আশারও বলিষ্ঠ উচ্চারণ শুনি। Ode to the West Wind-এর আরম্ভে কি বেদনা— "I fall upon the thorns of life I bleed." আর শেষে কি প্রত্যয়— "If winter comes, can spring be far behind?" 'A Lament' কবিতায় পড়ি—অতীত গৌরব কোনদিন ফিরবে না। ('উর্বশী'-তে শুনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি—'ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব শশী'।) আবার 'Hellas' কবিতায়—পৃথিবীর নিত্য নবীভবনের ইঙ্গিত। যিনি To a Skylark কবিতায় মধুরতম সংগীতের বিষণ্ণতম সুর শোনেন, তিনিই Prometheus Unbound-এ প্রেমের দ্বারা, দুঃখবরণের দ্বারা, দেবরাজের ওপর মানবের জয় ঘোষণা করেন।

কীট্‌সের কবিতায় অনিত্যের বেদনা আরও বেশী— যেমন Ode to Melancoly.

She dwells with Beauty—Beauty that must die,
And joy, whose hand is ever at his lips
bidding adieu,.....

বা

Ode to a Nigatingale-এ—
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan.

কিন্তু তিনিও মনে করতেন, "A thing of beauty is a joy for ever...." আর সব মরে, কিন্তু সত্যকার সৌন্দর্য অমর। Ode on a Grecian Urn যেন শেষ হচ্ছে উপনিষদের মন্ত্রে—

'Beauty is truth, truth beauty'—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছিল এই দুই চরণ এবং মৃত্যুর দু বছর আগে লেখা 'সানাই' গ্রন্থে এর পুরো এক স্তবক তুলে দেওয়া হয়েছে। সুন্দর এবং সত্যের মধ্যে গভীর

সম্পর্কের কথা কত প্রবন্ধেই তিনি আলোচনা করেছেন।

শেলী কবির সামাজিক দায়িত্ববোধ ভোলেননি। Prometheus Unbound শ্রেণীহীন, কৌমহীন, জাতিহীন, মানবতার সিম্ফনি। To defy power, which seems omnipotent, ত' শুধু দেবরাজ জিউসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা নয়, প্রাক্-বিপ্লব ancien regime-এরও বিরুদ্ধে। প্রাচীন অন্যায়, অত্যাচারের ভারে পৃথিবী ধ্বংস হোক। কিন্তু প্রেম, অক্রোধ, সৌভ্রাত্র আবার গড়ে তুলবে নতুন আথেন্স।

To love, and bear, to hope till Hope creates
Form its own wreck the thing it contemplates.

সে আথেন্স আবার উঠবে তার জন্মলগ্নের শুভ্র শুচিতা নিয়ে—সমুদ্র থেকে ভিনাসের মত। কি মহান কল্পনা।

শেলীর স্বপ্ন সফল হয়নি। ফরাসী বিপ্লবের আগেই এসেছিল শিল্পবিপ্লব। তৎসঞ্জাত ধনতন্ত্রের শোষণ দূর করে সাম্যবাদী স্বর্গ গড়তে মার্ক্স দিয়েছিলেন বিপ্লবের, শ্রেণী সংগ্রামের ডাক। আর রোমান্টিকরা তার কুশ্রীতা সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছিল প্রকৃতির ক্রোড়ে। রবীন্দ্রনাথও—কখনও পদ্মার নির্জন তীরে, কখনও শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক প্রচ্ছায়ে। কিন্তু শ্রীনিকেতন-ই তাঁর প্রোমেথিউসের নতুন পৃথিবী।

অষ্টাদশ শতকের কাব্যে প্রকৃতি ছিল পরিকল্পিত উদ্যান (ভেসাইতে যা দেখি)—সবই কাটাছাঁটা, মাপাজোকা। রুশ্যো তার স্থানে আনলেন আদিম অরণ্যের, উদ্দাম স্রোতস্বিনীর, কঠিন পর্বতের উচ্চাবচ বিস্ময়, এমন কি ভয়। শেলীর বহু কবিতায় এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ চেয়েছিলেন শান্ত, প্রায় তপোবনসুলভ, পরিবেশ—একটি ড্যাফোডিলের ঝাড়, একটি ডেইজি ফুল, কোকিলের একটি কুহুতান।

No bird, but an invisible thing
A voice, a mystery.

শেলীর মত কোন য়ুটোপিয়ার জন্য অধীর হননি তিনি। The Prelude-এ পড়ি—

Not in Utopia—subterranean fields,
Of some secret island, Heaven knows where
But in the very world, which is the world
Of all of us—the place where, in the end,
We find our happiness, or not at all.

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে শেলীর মত নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়েছেন, প্রলয় দোলায় দুলতে চেয়েছেন, আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত 'বসুন্ধরা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', ও 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতায় সসীম ধরণীর শান্ত প্রেমময় প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি অসীম টান অনুভব করেছেন। তিনি যেন একই সঙ্গে শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের Skylark, কখনও তাঁর পাখা অনন্ত নীলে উড্ডীন, কখনও true to the kindred points of heaven and home.

বাংলায় রোমান্টিসিজমের প্রভাব ষাটের দশক থেকে পড়ল। হয়তো উপবাসী হৃদয় এর বেগ ও রুদ্রতা কামনা করত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, পোপের 'ঢিমে তেতালের' স্থানে বায়রণের 'ঝাঁপতাল' তাই এত ভাল লেগেছিল। কিন্তু "সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে। তাহা উত্তেজনারই দিন।" ইওরোপীয় ইতিহাসে র‍্যানেশাঁস, ফরাসী বিপ্লব, জার্মান আদর্শবাদ সত্য ঘটনা, তাই সেক্সপীয়র, শেলী-বায়রণ বা কোলরিজ সম্ভব হয়েছিল। "আমাদের এখানে ঝড় নেই, ঝড়ের ডাকের নকল, হাট নেই তবু হট্টগোল।"

অর্থাৎ আবেগের অনেকখানি আরোপিত, তাই কৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিসিজমের আর একটা দুর্বলতার দিক উল্লেখ করেছেন, তা হল অত্যধিক অন্তর্মুখিনতা। "ওয়ার্ডসওয়ার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়, শেলীর ছিল শেলীয়।" ব্লেক প্রতি বস্তুর মধ্যে স্বর্গীয়কে দেখতেন,

To see a world in grain of sand
And a Heaven in a wild flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

শেলীর 'weak grasp on the actual' উল্লেখ করে লিভিস খুব ভুল করেননি। যিনি মনে করেন জগতের সব কিছু "mirrors the fire for which all thirst", তাঁকে আর কি বলা যেতে পারে? কোলরিজ ত' বাইরের প্রকৃতির আলাদা অস্তিত্বই স্বীকার করেননি— "And in our life alone does Nature live." তবে কীট্স সম্পর্কে এমন আদর্শবাদের অপবাদ ওঠে না— "O for a life of sensations rather than of thoughts." রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে একটা সাম্যরক্ষা করেছে চিরদিন। আবেগের টানে বুদ্ধির বল্গাকে শিথিল তিনি করেননি বলা চলে না, তবে খুবই কম।

পরবর্তী রোমান্টিকরা আবেগকে imagination-এর মুখ্য উপাদান মনে করল, intellect পরিহার করল, তাই ভাবালুতার শিকার হল। Sensibility রূপান্তরিত হল sentimentality-তে। তাছাড়া ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে গিয়ে হারালো আপন শিকড়ের শক্তি। শেলী বা কীট্স কোনওদিন গ্রিক ঐতিহ্য (র‍্যনেশাঁসের মাধ্যমে) ভোলেননি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত স্থিতধী কবিও pagan হতে চেয়েছিলেন। আরও দেখি, শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবিরা চিত্রকল্প ও সংগীতের যে সমন্বয় করেছিলেন, পরবর্তীকালে সুইনবার্নরা সংগীতের ওপর জোর দিতে গিয়ে তা নষ্ট করেন। সাধারণ বস্তুতে অসাধরণের প্রকাশ দেখে বালকের মত বিস্ময় বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। মাঝখান থেকে ফুল, চাঁদ, শিশির, পাখি, কুঞ্জ—ইত্যাদি কিছু বিষয়কে poetic বলে বেঁধে দেওয়া হল। যত সুন্দরই হোক, অতি ব্যবহারের ফলে তা প্রথম আস্বাদের রস হারায়। লিভিস তাঁর New Bearings in English Poetry-তে এই সংকট আলোচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর মত রসের রাজ্যেও শুচিবায়ু দেখা দিয়েছিল। কয়েকটি সিদ্ধ রসে বার বার ঘা দিলে পাঠকের মনের তন্ত্রী অসাড় হয়ে যাবে—এতে আশ্চর্য কি! কথা ত' মুদ্রার মত, বারবার ব্যবহারে ক্ষয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ অনেক পরে এলেন বলে এসব দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি কিছু সতেচন ছিলেন। শেলী ও কীট্সের পেগান আবেগকে ব্রাহ্মধর্মের শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ দিয়ে সংযত করলেন তিনি। শেলীর প্যানথিইজম উপনিষদের সাহায্যে আধ্যাত্মিকতার গভীরতর স্তরে নিয়ে গেলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের রক্ষণশীলতায় কোনদিন তিনি সায় দেননি আবার বায়রণ ও শেলীর নৈরাজ্যের আহ্বানে সাড়াও দেননি (শেলী নিজে স্বীকার করতেন তাঁর মধ্যে tranquility-র অভাব রয়েছে)। কোলরিজের অতি-জার্মান দার্শনিকতা তিনি কালিদাস ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের মানবিক সৌন্দর্য দৃষ্টি দ্বারা সংশোধন করলেন। জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও কীট্সের মৃত্যু চেতনা ও চিরবিষাদ তাঁকে স্পর্শ করেনি। পত্নী, পিতা, পুত্র, কন্যার পরপর মৃত্যু সত্ত্বেও। দুঃখ মৃত্যু

বিরহ—এসব ত' আছেই, কিন্তু তাদের শিয়রে জেগে রয়েছে আনন্দ, অনন্ত, অমৃত—এমন দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর শেষদিন পর্যন্ত ছিল। যেখানে রোমান্টিকরা সিম্বলের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি তৈরি করলেন নিজস্ব সিম্বল। তাতে রোমান্টিকতা পেল আশ্চর্য গভীরতা। রোমান্টিকদের মত ধর্ম বিশ্বাসকে তিনি ছেড়ে দেননি বা রোমান্টিসিজমকে ধর্মে পরিণত করেননি। তাই বিজ্ঞানের রূঢ় আঘাত তাঁকে স্পর্শ করেনি। যাকে romantic fallacy বলা হয়েছে, রোমান্টিক কবি হয়েও, তিনি তা এড়াতে পেরেছেন। এলিয়ট তাঁকে "humourless, pedantic, self-centred" ইত্যাদি গালাগাল দিতে পারতেন না (যা শেলীকে দেন)।

যখন তিনি 'মানসী' থেকে 'চিত্রা' লিখছেন, তখন ইংল্যান্ডের রোমান্টিক কাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে, প্রি-র‍্যাফেলাইট পর্ব পার হয়ে কলাকৈবল্যবাদীরা সোরগোল শুরু করে দিয়েছে। ফ্রান্সে রোমান্টিক কবি উ্যগো ও দ্য ভিনির দিকে তাকিয়ে হাসছেন বোদলেয়ারের অনুরাগীর দল, এমন কি মালার্মে-র‍্যাঁবোরা বিখ্যাত। শিল্পের জগতে রিয়ালিজম শেষ হয়ে শুরু হয়েছে ইমপ্রেশনিস্ট—মানে, মোনে, সেজ্যানের-রাজত্ব। আমাদের দেশে এই পালাবদলের ঢেউ পৌঁছয়নি, এমনকি ইংল্যান্ডেও নয়। তবে উনিশ শতকের শেষের দশকে কিসের প্রেরণায় লিখছেন রবীন্দ্রনাথ ?

কবি উত্তর দেবেন—'জীবনদেবতা'র। তিনি কবির অন্তরের কবি—"যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দের আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন.... তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্য দান করিয়া বিশ্বের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, তাহা আমি মনে করি না। আমি জানি, অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন।" রোদেনস্টাইনকে ১৯২৭-এর ২০ এপ্রিল কবি লিখছেন, জীবনদেবতা হলেন "the limited aspect of divinity which has its unique place in the individual life, in contrast to that which belongs to the whole universe.... individual for the individual, working out through our evolution in time, our ultimate destiny." ধর্মশাস্ত্রে যাঁকে ঈশ্বর বলে জীবনদেবতা তা নন, তিনি বিশ্বলোকের নন, কবির নিতান্ত আপন। তিনি শুধু এই জীবনের খণ্ড সূত্রকে এক অখণ্ড সূত্রে গাঁথছেন না, লোকলোকান্তর, জন্মজন্মান্তরের প্রবহমান প্রাণলীলারও সঙ্গী এবং সাক্ষী তিনি। কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তিনি নন, মিলন বিরহের সম্পর্কে তিনি অবয়বী। তিনি অর্ধনারীশ্বর। কখনও 'অন্তরতম', 'অন্তর্যামী', কখনও 'অন্তরযামিনী', 'অন্তরবাসিনী'। কখনও তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গিনী, কখনও প্রলয় দোলায় তাঁর সঙ্গে দোলেন, কখনও সিন্ধুপারে মৃত্যুর দেশে বধূরূপে মালা দেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর একটু ব্যাখ্যা করে কবি বলেছিলেন—জীবনদেবতা ও তিনি যুগ্মসত্তা। তিনি যন্ত্রী, কবি যন্ত্র—আর 'দুয়ের যোগেই ত সংগীত।' একে কোলরিজের imagination বলা চলবে না, নীরদ চৌধুরীর রোমান্টিক 'cult of the ego' ত' নয়ই। এ এক মিস্টিক উপলব্ধি। তবে আবে ব্রেমঁ (নীরদ চৌধুরীর আপীল আদালত)-র ব্যাখ্যা দিয়ে এমন মিস্টিসিজম বোঝান যাবে না। আসলে খৃষ্টীয় মিস্টিসিজমের মডেল দিয়ে বোঝাতে গিয়ে ভুলটা হচ্ছে। কবি প্রকৃতি মিস্টিক হতে পারে না বা হলেও 'জাল মিস্টিক', এমন উক্তি অশ্রদ্ধেয়, যেমন 'রোমান্টিক কবি হাস্যরসিক হতে পারেন না'—উক্তি। তবে কি মানতে হবে উপনিষদের কোনো কোনো অংশ, বৈষ্ণব পদাবলী,

সুফী কাব্য—কাব্যপদ বাচ্য নয় ? ব্রেমঁ বলছেন, "(১) মিস্টিসিজম পার্থিব অস্তিত্বকে মায়া বলিয়া মনে করে, পক্ষান্তরে পার্থিব অস্তিত্বই কাব্যের অবলম্বন, (২) আর মিস্টিসিজম অন্তর্মুখীন, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, করিলেও স্বগতোক্তির মত শোনায়।" নীরদ চৌধুরী একে বেদবাক্য মনে করলেও আমরা সকল প্রকার মিস্টিসিজম সম্বন্ধে এমন ভাষ্য প্রয়োগ করতে পারি না। একমাত্র শাঙ্কর ভাষ্য মায়া বলে বিশ্বজগতের অস্তিত্বের উড়িয়ে দিয়েছে। তাও পুরো নয়। এ জগৎ এর একটা phenomenal ও relative অস্তিত্ব আছে শঙ্কর তা বলেছেন। অন্যদিকে উপনিষদের সবগুলি কিছু কট্টর অদ্বৈত-পন্থী নয়, দ্বৈতপন্থী উপনিষদ—শ্বেতাশ্বতরকে ভুললে চলবে না। দ্বিতীয়তঃ 'মায়া' শব্দটা ব্রহ্মের অনির্বচনীয় শক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, illusion অর্থে নয়। যে দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মের প্রথম পাঠ, তিনি বৃহদারণ্যকের 'সোহহমস্মি' বা ছান্দোগ্যের 'তত্বমসি' মন্ত্রের অদ্বৈত বাদে তৃপ্তি পাননি। মায়াবাদ বা নির্বাণ-মুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি তিনি। শ্বেতাশ্বতরের দ্বৈত ভক্তি মার্গ তাঁকে অধিক আকর্ষণ করত। ব্রহ্ম তাঁর পরম পিতা (পিতা নোহসি)—সখা—তাঁর "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হাফেজের মাধ্যমে সুফী মরমিয়াবাদ। সুফী আবু ইয়াজিদ অদ্বৈতপন্থী হলেও হাফেজ, জামি, রুমি, আল গাজালি, জুনিয়াদ তা ছিলেন না। এঁদের কাছে ঈশ্বর—অসীম সুন্দর ও অনন্ত প্রেমময়। সুন্দর ও প্রেম ওতপ্রোত। সুন্দর দেহ, প্রেম তার আত্মা। সুন্দর খনি, প্রেম তার মণি। ভালোবাসার অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তার অভিসারে যেতে হবে। বেদনা তিনি প্রতিপদেই দেবেন, আর ভালোবেসে সাহসও জোগাবেন। শেষে সেই আলোর আলো আমাদের হৃদয়ের সব অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবেন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবু নিজেকে দেখতে চান আমাদের মুকুরে। আমাদের ভালোবাসেন বলেই তিনি সৃষ্টি করেছেন—

> .....the verdant filds of Time
> and Space was the life-giving graden of the world[১১]

উপনিষদ আরও একটু এগিয়ে বলেছে, তিনিই সব হয়েছেন—'রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপম্ বভূব' ; তিনিই সব ব্যাপ্ত করে আছেন—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম' ; সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করে আপন সৃষ্টির মধ্যে লুকিয়েছেন তিনি—ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে। এই শেষ দুই উক্তি অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—যাজ্ঞবল্ক্যের। তাই যদি হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ কেন এই ঈশ্বরের মহিমায় মহান, ঈশ্বরের সৌন্দর্যে সুন্দর, ভুবনে মরতে চাইবেন ?

ভুবন আর ভুবনেশ্বর ত' আলাদা করা যায় না। একা থেকে সাধ মিটল না, তাই তিনি আমাকে গড়লেন। আমি তবে সামান্য নই। 'নৈবেদ্যের' এক অসামান্য পঙক্তি—"দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ।" আমাতে তাঁর আনন্দ, তাই জীবনে জীবনে যুগে যুগে আমাকে নিয়ে তাঁর লীলা। আমার সঙ্গে মিলনের জন্য কত দূর থেকে তিনি আসছেন, আমার গান শোনার জন্য বরণমালা হাতে। তাঁর সঙ্গে আমার নিরুদ্দেশযাত্রা, আমার ঝুলন, সিন্ধুপারে মৃত্যুর পর মিলন। বাউলদের মত শুধু দেহতত্বে রবীন্দ্রনাথ সীমাবদ্ধ থাকেননি।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতিপ্রেমের পার্থক্যও লক্ষণীয়। এই প্রকৃতি কবির আবেগের নিছক আলম্বন নয়, পটভূমিকা নয়। এর অস্তিত্ব ও আমাদের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গী জড়িত। শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময় অভিব্যক্তিবাদের

জন্ম হয়নি। কিন্তু ডারুইন/ওয়ালেস রবীন্দ্রনাথের পরিচিত। তিনি উপলব্ধি করতেন সমুদ্রের সঙ্গে, বসুন্ধরার সঙ্গে, এমন কি তার প্রতিটি বৃক্ষ, লতা, পুষ্পের সঙ্গে এবং মধ্যে তিনি হয়ে উঠছেন।

১। মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। (সমুদ্রের প্রতি)

২। মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে...
আমার আনন্দ লয়ে
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার... (বসুন্ধরা)

শেষ জীবনের 'বৃক্ষবন্দনা' বা 'সেঁজুতি' যারা পড়েছেন, তাঁরা বুঝবেন—এ নাড়ীর যোগ কোন দিন ছিন্ন হয়নি।

প্রকৃতি প্রেমের আর এক প্রেরণা—অবশ্যই কালিদাস। 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা'র কবি রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেছিলেন, সে প্রমাণ 'প্রাচীন সাহিত্য', 'মেঘদূত', 'কুমাসম্ভবের কবি', 'স্বপ্ন', 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'তপোভঙ্গ', 'যক্ষ'—কত কবিতায় না পাওয়া যাবে ! কোথাও অনুষঙ্গ, কোথায় তির্যক উল্লেখ, কোথাও দীর্ঘ উদ্ধৃতি, কোথাও নতুন ব্যাখ্যা। 'সেকাল'-এ যেমন স্তবকের পর স্তবক কালিদাস থেকে তুলে নেওয়া, 'যক্ষ'-এ তেমনি কালিদাসের ভাবনা থেকে নিজস্ব আধ্যাত্মিক ভাবনায় উত্তরণ। মিলন বিরহ-প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা—কালিদাস দ্বারা প্রভাবিত।

মেঘদূত একদিক থেকে যক্ষের কামনা ও বিরহ যন্ত্রণার বাহ্য প্রকাশ, অন্য দিকে তা কালিদাসের উপলব্ধি যে সৌন্দর্যকে সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু খণ্ডভাবে। তাকে সম্পূর্ণ, অখণ্ড রূপে মেলে না। তাকে বুঝতে হলে ভারতবর্ষের সব গিরি, নদী, বনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হয়। উপলব্যথিত গতি রেবা, শ্যামজম্বু বনচ্ছায়ে দশার্ন গ্রাম, ক্বচিৎ বিদ্যুতালোক দীপ্ত উজ্জয়িনী রাজপথে অভিসারিকা থেকে কামনার মোক্ষধাম অলকা পর্যন্ত সৌন্দর্যের এমন বৃহৎ অনুসন্ধান পৃথিবীর কোন সাহিত্যে নেই। বাংলার, বিশেষত পূর্ব বাংলার, প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাই খুঁজেছেন। তারপর দেশ বিদেশের কত অজানা ফুল (পূরবী, মহুয়া), বীরভূমের রাগী রুক্ষ প্রান্তর, সমুদ্র, পাহাড় থেকে দরজার বাইরে, ঘাসের শিষের ওপর শিশির বিন্দু কিছুই বাদ যায়নি। উমার কামনা হর কোপানলে দগ্ধ হয়ে উমার তপস্যা হয়ে উঠল হিমালয়ের পটভূমিতে, যেখানে 'হিমালয় নির্ঝর শিকরাণাম্ বোঢ়াঃ মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ'। কণ্বের আশ্রমে যে শকুন্তলা ছিল সৌন্দর্য ও সৃষ্টি শক্তির প্রতীক, সে মারীচের আশ্রমে 'নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈক বেণী'। কাম প্রেম হয়েছে প্রকৃতিরই আশ্রয়ে। নারী ও প্রকৃতি পরস্পরের পরিপূরক। 'তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।'

এবার এল স্বদেশ প্রেমের পালা। 'প্রেমের অভিষেক' লেখা হল ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৪ মাঘ, আর 'এবার ফিরাও মোরে'—২৩ ফাল্গুন। যিনি একমাস আগে লিখছেন—

হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছে সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত আলয়ে, সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান।

ঠিক এক মাস পরে তিনিই লিখেছেন,

বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার

ছুটে যেতে চাইছেন, "নির্ভীক পরাণে সংকট আবর্ত মাঝে।"

প্রথম বিলাত ভ্রমণের সময় লেখা পত্রাবলী ও 'রাজাপ্রজা'র গুণগত প্রভেদ স্পষ্ট। এর কারণ—শতাব্দীর শেষ পাদে সাম্রাজ্যবাদের শাসন শোষণের রূপটা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে 'এবার ফিরাও মোরে', 'রাজাপ্রজা'র কিছু প্রবন্ধ এবং 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ মুদ্রিত অরবিন্দের চরমপন্থী প্রবন্ধাবলী সমকালীন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ওপর অন্যায্য উৎপাদন শুল্ক, তিলকের বয়কট, পুণায় প্লেগদমনের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচার, তার জবাবে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যা, তিলকের কারাদণ্ড—দেশবাসীকে উত্তেজিত করেছিল। কার্জনের করপোরেশন আইন, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের নামে উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, এবং বঙ্গভঙ্গ তাতে ঘৃতাহুতি দিল।

বাঙালীর আবেগপ্রবণ মন এমন রূঢ় আঘাত আগে পায়নি। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেননি, যে পদ্মা তীরে বা বুকে ভাসমান তিনি 'সোনার তরী', 'মানসী', 'চিত্রা', 'গল্পগুচ্ছ' লিখেছেন, কার্জনের কলমের এক খোঁচায় তা আলাদা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই লাভাস্রোতের মত বেরিয়ে এল শত শত স্বদেশী গান—'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'আমার সোনার বাংলা', 'ও আমার দেশের মাটি'। এ যেন অগ্নিস্রাবী অশ্রু।

কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম স্বরাজ ঘোষণা বা বয়কট বা সন্ত্রাসবাদ ছিল না। তার মধ্যে একদিকে আত্মশক্তি উদ্বোধন,[৭২] অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের মহিমাকীর্তন। বিদেশী বর্জনের বিরোধী ছিলেন তিনি, কারণ স্বদেশীর নামে তা দরিদ্র ক্রেতাবিক্রেতার ওপর অত্যাচারে পরিণত হবে, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত করবে এবং তার সদ্‌ব্যবহার করবে তৃতীয় পক্ষ—ইংরেজ। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এ বিশ্বাসে তিনি বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বিপিন পালদের শরিক ছিলেন বেশ কিছু দিন। বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। "সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোক ব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়তা দান করিয়াছে।" এই সনাতন ভারতবর্ষ "আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রকীর্ণ, বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।" পশ্চিম থেকে এসেছে ঝড়, দশদিক অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু "যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ওই সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহ বলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ ঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইয়া উঠিবে।" এই সনাতন ভারতবর্ষ কবির কল্পনার। য়ুরোপের সঙ্গে তার আত্যন্তিক পার্থক্য। "য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ,...ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী।" ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করার ব্রত আমাদের প্রত্যেককে গ্রহণ করতে হবে। য়ুরোপ যাকে ফ্রীডম বলে' তা আমাদের লক্ষ্য হবে না। "সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু,

তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর, তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে। *এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন।*" য়ুরোপের পোলিটিক্যাল ঐক্যের মধ্যে বিরোধের ফাঁস। পৃথককে বলপূর্বক এক করলে তা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হবেই। অন্যদিকে "ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে।" "ভারতবর্ষের এই ধর্ম সমস্ত সমাজের ধর্ম—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।" সে দেখার মূলে ছিলেন সমাজপতি ব্রাহ্মণ। নানা কারণে ব্রাহ্মণ আজ অধঃপতিত, আপন কর্তব্য পালনে অক্ষম। তাই নেতৃত্ব দেবার জন্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য (বৈদ্য কায়স্থ বণিক)-কে ও দিতে হবে দ্বিজত্ব। "ইহা যদি না হয়, সমাজ যদি শূদ্র সমাজ হয়, তবে কয়েক জন মাত্র ব্রাহ্মণকে লইয়া এ সমাজ য়ুরোপীয় আদর্শেও খর্ব হইবে, ভারতবর্ষীয় আদর্শেও খর্ব হইবে।"[৭৩]

বলা বাহুল্য, পূর্ববিশ্লেষিত বিবেকানন্দের ভাবনা থেকে এর পার্থক্য খুবই কম। এটিই ছিল Zeitgeist বা যুগধর্ম। কিন্তু বিবেকানন্দের মতই তিনিও প্রাচীন ভারতবর্ষের পুনঃপ্রবর্তন (revival) চাননি। বিদেশীদের সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়া তীব্র, কিন্তু তা Xenophobia-তে পরিণত হয়নি। আপন সমাজের কূপমণ্ডূকতা, পুরুষ-নারী সম্পর্কের রূঢ়তা, উচ্চনীচ বর্ণভেদের অমানবিকতা, শ্রেণীবৈষম্য-ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি। তাই কখনও রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় ('পরিত্রাণ'), আচারের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে গুরু ('অচলায়তন'), সংগ্রহের নিষ্ঠুর ও লুব্ধ চেষ্টার জালে জড়িত বিশ্ব থেকে রাজার বিরুদ্ধে, প্রাণের মাধুর্য ও প্রেমের পূর্ণতার প্রতীক—নন্দিনী ('রক্তকরবী'), যন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক শোষণের বিরুদ্ধে—অভিজিৎ ('মুক্তধারা')—বিদ্রোহ করেছে। সব বাঁধ ভেঙে দিয়ে এক সুস্থ, মুক্ত সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তাই হবে তাঁর স্বদেশী সমাজ (কেউ বলবে—য়ুটোপিয়া, তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু বিবেকানন্দও তাই দেখেছিলেন)।

পশ্চিম নয়, তার যন্ত্র সভ্যতার অপব্যবহারই ছিল বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর শত্রু। এর প্রতীক বিভূতির বাঁধ, রক্তকরবীর সুড়ঙ্গ তলার স্বর্ণখনি। 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হবার ছমাস পরে প্রবাসীতে এক দীর্ঘ আলোচনা করেন কবি, যা 'যাত্রী'তেও প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্ণলঙ্কা শুধু বাল্মীকির কল্পনা নয়, তাই আজ মাটির উপর থেকে লুকিয়েছে মাটির তলায়। রাম ছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম, কর্ষণজীবীর প্রতীক, রাবণ—আকর্ষণ ও হরণজীবীর। নন্দিনী কিন্তু সীতা নয়, কোন সোনার হরিণের লোভে সে বন্দিনী হয়নি। সে এসেছে স্বেচ্ছায়—ওপর তলার প্রাণের, প্রেমের, সহজ সুন্দরের দূতীরূপে। আজ তারই প্রবর্তনায় যক্ষপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ভাঙবে আপনসৃষ্ট কারাগার। অহিংস অসহযোগের স্বেচ্ছাবৃত দুঃখ এরই বিবেক জাগানোর জন্য। বিবেকানন্দের যোগশিক্ষা এরই কর্মোন্মত্ততাকে নিষ্কাম করবার জন্য। পশ্চিমী সভ্যতার এই ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া—the hero as sannyasin, the hero as poet এবং the hero as politician—এর রহস্য বুঝেছিলেন রোঁম্যা রঁলা।

তবু দেখি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসছেন ১৯০৭ সালে, 'গোরা' লিখবার সময়। গোরার tension কোথায়? সে পুরাতন ভারতবর্ষ, ব্রাহ্মণত্বের মহিমা ফিরিয়ে আনতে চাইছে, কিন্তু কঠিন বাস্তব তা হতে দেবে না। "আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে

সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্য এতদিন আমার চারদিকের সঙ্গে কি লড়াই না করেছি।" তাকে সংকীর্ণ দেশপ্রেম উত্তীর্ণ হতে হবে, পরেশবাবুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে তাঁকে—"যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন—ভারতবর্ষের দেবতা". খেতে হবে লছমিয়ার হাতে জল।

"গোরা" লেখার সমকালে তাঁর মিস্টিক চেতনার পালাবদল ঘটল। পিতার কাছ থেকে যে দ্বৈত ভক্তি/সুফী প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব 'জীবনদেবতা'র ভাবনা। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে তা আরও উচ্চস্তরে উঠল—মুখ্যত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে। 'ভারতী'র প্রথম বর্ষ (১২৮৪) থেকে প্রকাশিত ভানুসিংহের কবিতাগুলি থেকে বোঝা যায় পদামৃতমাধুরীর সঙ্গে তিনি নিবিড় ভাবে পরিচিত। প্রথম কবিতাটি ছিল মল্লারে বাঁধা অভিসারের পদ—'সজনী গো আঁধার রজনী ঘোর ঘনঘটা চমকত দামিনীরে' (পরে বদলে যায়)। ১৯০৭ থেকে রাধাকৃষ্ণের লীলা হয়ে ওঠে তাঁর মিস্টিক ভাবনার প্রতীক। পূর্বরাগ থেকে ভাব সম্মেলন—এখন থেকে তাঁর কাব্যে ও গানে কখনো প্রেরণা, কখনো বিষয়বস্তু, কখনও বা আবহ। রাধার ভক্তি রাগানুগা, মধুর রাগের পরাকাষ্ঠা। সে কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, বৈকুণ্ঠের জন্য নয়। 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।' এ বাঁশি ঈশ্বরের সংকেত। এ বাঁশি বাজে—'বন মাঝে না মনমাঝে' তা বোঝা যায় না। কবির চেতনা 'তখন মগন গহন ঘুমের ঘোরে।' এমন সময় নামল বৃষ্টি। দারুণ বাঁশিতে বাজল রাধা নাম। তখন ঘরেও থাকা যায় না। পথে বেরোতে হয় কাঁটার অভিসারে। কখনও মনে হয় 'বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি'। ভয় হয়—কলঙ্ক লাগবে গায়ে। পরে নির্ভাবনায় বলে—'আমি সকল দাগে হব দাগী'। তাকে সব দিতে হবে—'আমার যত বিত্ত যত বাণী'। কাঁদাবেন তিনি, তবু তাঁকে এড়ান যাবে না। এড়িয়ে মুক্তিও চাই না। তিনি দুঃখ দিয়ে প্রেমের মান রাখেন যে।

"পরাণে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা
দুঃখের মাধুরীতে করিলে দিশা হারা।
সকলই নিলে কেড়ে দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কি দায়ে ?"

কোন বৈষ্ণব পদকর্তা এমন আক্ষেপানুরাগের পদ বেঁধেছেন ?

প্রতীক্ষার পদগুলি একই সঙ্গে বর্ষারও গান। বস্তুত প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর—এ তিনকে রবীন্দ্রনাথের মত আর কেউ সুরে সুরে ধরতে পারেননি। ঘনিয়ে আসা আঁধার সন্ধ্যার ব্যাকুল প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে বজ্র ও বন্যায়। এত মধুর খেলা নয়, এত সহজ গান নয়। অনেক দহন, অনেক আঘাত সইলে তিনি ঘরভরা শূন্যতার বুকের ওপর এসে দাঁড়ান। কখনও তাঁর পায়ের ধ্বনি দ্বারের কাছে থেমে যায়। আমার অহম্ দিয়ে যে দুয়ার বন্ধ করেছি। 'আপনারে লয়ে রচিলি কি এ আপনার আবরণ।' অনেক সময় এসে পাশে বসেছেন, তবু জাগিনি। এখন বলি, 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।' তারপর চোখের জলে একদিন সব মান, সব বেদনা ধুয়ে যাবে। নিঃসংশয়ে অন্ধকার রাত্রি শেষে বলব—'আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো।'

সাধারণ বৈষ্ণব সাধনা নয় এ। কোন গৌড়ীয় আচার্য সাহস করে বলতে পারতেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে ?' বা 'আমার মধ্যে তোমার লীলা হবে, তাইত আমি এসেছি এই ভবে ?' কেবল আমি অভিসারে বেরই না, তিনিও 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।'

তাঁকে যখন সত্য করে পেলাম, তখন বুঝলাম তিনি শুধু আমার একার নন, তিনি সবার। জীবনদেবতা হন বিশ্বদেবতা। এবার বাইরের জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমারও নিমন্ত্রণ।

এমন যখন রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, তখন ঈশ্বর ও মানুষের মিলন বিরহের গান কণ্ঠে নিয়ে ইংল্যাণ্ড রওনা হলেন তিনি। সেটা ১৯১২ সাল। গেলেন, আর শুধু ইংল্যান্ডের নয়, অল্প সময়ের জন্য হলেও, পশ্চিমের চিত্ত জয় করলেন। রোদেনস্টাইনের মনে হয়েছিল, "Here was poetry of a new order which seemed to me on a level with that of the great mystics." আধ্যাত্মিক আনন্দের কথা উল্লেখ করেছেন মে সিনক্লেয়ার। পাউন্ডের ভাষায় (শিকাগোর Poetry পত্রিকার জন্য লিখিত)—"It brings a quiet proclamation of the fellowship between man and the Gods; between man and nature"... আর্নেস্ট রীস স্মরণ করেছেন প্রবক্তা আইজায়ার কথা, টাইম্‌স লিটররি সাপ্লিমেন্ট—ডেভিডের Psalm—গাথা।

অর্থাৎ কেউই প্রাচ্য মিস্টিসিজমের কথা ভাবেননি। আর্কুহার্ট সাহেব ত' রবীন্দ্রনাথকে একেবারে খৃষ্টান মিস্টিকদের কাছে ঋণী করে ছেড়েছেন। ভারতবর্ষের মিস্টিক সাধনার কথা সচেতন ভাবে কাব্যে এনেছিলেন এলিয়ট—অনেক পরে। Wasteland-এ তার পূর্বাভাস, Four Quartets-এ পরিণতি। কিন্তু তিনি দান্তের মিস্টিক উপলব্ধির কাছে অধিক ঋণী।

রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য মরমী ভাবনার সঙ্গে গ্রিক মরমী ভাবনার বেশি মিল পাওয়া যাবে। গ্রিসের সভ্যতা সম্পর্কে নীটসে দুটি মডেলের উল্লেখ করেছেন—Apollonian ও Dionysian. রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আর্যদের Apollonian ভাবনার ঐতিহ্য পেয়েছিলেন। গ্রিক আর্য ভাবনার প্রথম স্তরে অ্যাপেলো শুধু আলোর দেবতাই ছিলেন না, শৃঙ্খলা সংযম ও সৌন্দর্যের দেবতাও ছিলেন। যেমন আমাদের আর্য ভাবনায় সবিতা শুধু আলোর দেবতা নন, তাঁর কাছে গায়ত্রী মন্ত্রে 'ধী' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রার্থনাও করা হয়েছে। বিবর্তন ও পার্শ্ববর্তী প্রাচীনতর autochthonous সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গ্রীসের সভ্যতায় ডায়োনিশিয়ান রূপ প্রকট হল। প্লেটো ও প্লাটিনাস অ্যাপোলনিয়ান ধারার সাধক রয়ে গেলেন। খৃষ্টিয়ান মরমীরা তা থেকে সরে এসে divine darkness, abyss of Godhead, cloud of unknowing ইত্যাদি নিরালোক রাজ্যে প্রবেশ করলেন। কোনো কোনো উপনিষদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি—মেইস্তর একহার্ট বা জন রুইসব্রোয়েকে শোনা যায়। ওখানে যা abyss এখানে তা 'গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠম্ পুরাণম্'। ডায়োনিসাস দ্য অ্যারিওপ্যাজাইট যাকে Radiance of divine darkness বলছেন তাই 'তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্' ইত্যাদি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও 'অন্ধকারের রাজা'র প্রতীকে তাঁকে দেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য আর্যভাবনা অন্ধকার পছন্দ করত না। 'প্রভাতসংগীত' থেকে জীবনের শেষে লেখা 'হে পূষণ, সংহরণ কর' ইত্যাদি চরণে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল তাঁর ধ্যানের সবিতা।

পরবর্তী ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যে, ফ্রান্সে বোদলেয়ার ও র‍্যাঁবোর সিম্বলিস্ট কাব্যে, ডায়োনিশিয়ান মাত্রা ঢের বাড়ল। শিল্প বিপ্লব, ধনতান্ত্রিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ—সবই তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। বিচ্ছিন্ন, বিষণ্ণ কবিরা পালাতে চেয়েছেন মধ্যযুগে, প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মতো, বা নান্দনিক চাতুরীতে, কলাকৈবল্যবাদী (art for art's sake)-দের মতো। ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে "this iron time of doubts, disputes,

distractions, fears." ইয়েটসের The Second Coming যেন এই alienation-এর আর্তনাদ। এমন সময় এলেন রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' হাতে। সুইডেনের Alleezandru Phillipide তাঁর প্রতিক্রিয়া সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন : "The whole of Tagore's poetry is devoted to light...light, my light, the world-filling light, the eye-kissing light, heart—sweetening light". বলা বাহুল্য, তিনি "আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবনভরা"য় শুনেছিলেন মহাযুদ্ধের প্রদোষান্ধকারে আবৃত ইওরোপে আলোর, আশার বাণী। গ্রিস একদা এমন উক্তি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আবার সেই হৃত ঐতিহ্য (Apollonian ঐতিহ্য) ফিরিয়ে দিলেন।

১১

কিন্তু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে দৌত্য করতে পারলেন না। এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যাচ্ছে পশ্চিমী লেখকদের জবানীতে। মেরি লোগোর Imperfect Encounter (রোদেনস্টাইনকে কবির লেখা পত্রাবলী ১৯১১-১৯৪১, হাভার্ড, ১৯৭২), হিউ টিঙ্কারের অ্যান্ড্রুজ-জীবনী—The Ordeal of Love, অতি সম্প্রতি প্রকাশিত ই.পি. টম্‌সনের Alien Homage প্রভৃতি গ্রন্থে যেটা বেশী পরিস্ফুট হয়েছে সেটা হল—(১) রেভারেন্ড টমসন, রোদেনস্টাইন, অ্যান্ড্রুজ, ম্যাকমিলান কোং ইত্যাদিতে রেষারেষি ও ভুল বোঝাবুঝি, (২) রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুবাদের অক্ষমতা, (৩) রবীন্দ্রনাথপ্রশস্তি (যার জন্য রবীন্দ্রনাথের অহমিকাও কম দায়ী নয়)—রবীন্দ্রনাথের বর্তমান অখ্যাতির কারণ। কিন্তু আরও কারণ আছে। সৌরীন্দ্র মিত্র 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' গ্রন্থে ইয়েটস্, পাউন্ড প্রভৃতি একদা উচ্ছ্বসিত ভক্তের আকস্মিক ভোল বদল (খানিকটা ঈর্ষাসঞ্জাত)-এর কথাও তুলেছেন। তবু রাদিচের প্রশ্ন, কেন রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি এত অল্পকালীন, বুঝতে গেলে পশ্চাৎপটের দ্রুত পরিবর্তনও জানা দরকার। মনে রাখতে হবে, (১) গীতাঞ্জলি এমন একসময় ইংরেজদের হাতে এসেছিল যার অল্প পরে ইওরোপীয় উদারতন্ত্রের হ্রস্ব গ্রীষ্ম অবসিত হবে প্রথম মহাযুদ্ধের দীর্ঘ শীতে। (২) উনিশ শতকের বস্তুবাদের প্রতিক্রিয়া—মিস্টিসিজমের প্রতি আকর্ষণের ফ্যাশান—টমসনের ভাষায়—'a classic epidemic of western orientalism'—উবে যেতে বেশি সময় লাগবে না। বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের সাফল্য আবার জেঁকে বসবে—অন্তত ১৯২৯-এর মান্দ্য পর্যন্ত। (৩) রবীন্দ্রনাথের Nationalism বক্তৃতাবলীতে উগ্রজাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা ইংরেজ শাসকশ্রেণীর ভাল লাগেনি। (৪) জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে নাইটহুড ত্যাগ ত' রীতিমত অপমানজনক। (৫) শুধু টমসনের অক্ষম অনুবাদকে দায়ী করে রাদিচে ঠিক করেননি। টমসন-পুত্রের মতে "Tagore's literary reputation in England was killed by his own translations and by the Tagore cult."[৭৪]

সব চেয়ে বড়ো কথা, ১৯২০ সাল থেকে ইওরোপে ডায়োনিশিয়ান বিশ্ববীক্ষা আরো প্রকট হল। এমন কি বিকট হল ইতালী, রাশিয়া ও জার্মেনীতে—totalitarianism-এর আবির্ভাবে। আমেরিকা থেকে, ইংল্যান্ড থেকে, অ্যান্ড্রুজকে লেখা নানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শত্রুদের চিহ্নিত করেছেন : (১) উগ্রজাতীয়তাবাদ, (২) ভোগলব্ধ সমাজ ও লাভলুব্ধ যন্ত্র সভ্যতা, (৩) সাম্রাজ্যবাদ, (৪) বিবেকহীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।

স্বদেশের উগ্রজাতীয়তাবাদ অসহযোগের রূপ নিলে তিনি তাঁর তীব্র সমালোচনা

করেছিলেন। টমসন-পুত্র ১৯২১-২২-এর কলকাতাকে ডাবলিনের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন, সেখানে কত রকম পরস্পরবিরোধী স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের মত অনেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের গুরুত্ব বা সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেননি, আর শান্তিনিকেতনে চলছিল গুরুদেব-উপাসনা। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধেও নানা ভুল ধারণা চালু ছিল। তার কিছুটা অপনোদন করতে চেয়েছিলেন প্রশান্ত মহলানবিশ।[৭৫]

কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা ambivalence থেকেই যায়। তিনি ব্রিটেনকে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন, যদিও তার চেয়ে বেশি চেয়েছেন আত্মশক্তি বিকাশ করে সমান্তরাল স্বদেশী সমাজ (রাষ্ট্র নয়) স্থাপন করতে। তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্র বড়ো নয়, জাতি বড় নয়, বড় সমাজ। তাকে সাবলম্বী ও প্রগতিশীল করাটা বড়, ক্ষমতা দখল নয়। কিন্তু ক্রমশ তিনিও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। 'কালান্তর'-এর প্রথম প্রবন্ধে ইংরেজকে তিনি ইওরোপের চিত্তদূত রূপে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সত্যানুসন্ধানের সততায় জ্ঞানের জগৎকে তারা বাড়িয়েছে, স্বীকার করেছে ন্যায়াদর্শের সর্বজনীনতা, শুনিয়েছে মানব শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা, কিন্তু ভারতের 'ছোট মাপের ইংরেজ' আর বিলেতের 'বড়ো মাপের ইংরেজ' এক নয়। প্রথম দল ভারতবর্ষের প্রগতির রথের রশিতে হাত লাগাবে না, বরং উল্টো টানবে। তাদের শাসনতন্ত্রের গর্ব—ল অ্যান্ড অর্ডার ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধনবৃদ্ধি, সুষমবন্টনে তাদের অনাগ্রহ। "উরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়। আগুন লাগাবার জন্য।" মহাযুদ্ধের বীভৎস হানাহানিতে আব্রু গেল ঘুচে। য়ুরোপ হারাল আপন শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাস, উপহাস করল কল্যাণের আদর্শকে, এমন কি নিজেকে ভদ্র প্রমাণ করার দায়িত্বকে। দেশে জালিওয়ানওয়ালাবাগ, ধর্শানার সত্যাগ্রহীদের ওপর নির্যাতন, পেশোয়ারে গুলি, দেউলির রাজবন্দীদের ওপর গুলি, আর ইওরোপে ফাসিবাদ এবং ব্রিটিশ রক্ষণশীলদলের তা সমর্থন ক্রমশঃ কবির মন বিষিয়ে তুলল। ১৯৩৭ এ লেখা 'প্রান্তিক'-এ শান্তির লালিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হবে জেনেও তিনি দানবের সাথে সংগ্রামের ডাক দিলেন। 'সভ্যতার সংকট' আসলে উনিশ বিশ শতকের উদারতন্ত্রী বাঙালীর আত্মিক সংকট। ১৯২৯-৩৩ এর মান্দ্য তথাকথিত বাঙালী ভদ্রলোকদের প্রবল আঘাত করেছিল অর্থনীতির দিক থেকে, ১৯৩২-এর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—রাজনীতির দিক থেকে। ১৯৩৭ থেকে কৃষক প্রজা পার্টির কৃষিনীতি পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজনদের মূল ধরে নাড়া দিল। নানা বিপরীত টানের মধ্যে একটা ছিল মার্কসবাদের দিকে। অতএব উনিশ বিশ শতকের উদারযন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা উত্তরোত্তর কঠিন হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংকট তীব্র করল এবং কবি তা প্রত্যক্ষও করে গেলেন।

১২

'ডাকঘর', 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'গীতিমাল্য'—বেশ কয়েক বছর মিস্টিক অনুভূতির রাজ্যে বাস করে রবীন্দ্রনাথ আবার বাস্তব জগতে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৩০ পর্যন্ত যে কটি শ্রেষ্ঠ কাব্য তিনি রচনা করেন তা হল 'বলাকা', 'পূরবী' ও 'মহুয়া'। অজিত চক্রবর্তীরা তাঁর কাব্যের যে সব অতি-দার্শনিক ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন, তার সবটা কবির ভাল লাগেনি। একটা অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসছিল। টমসনের নোটবইতে পাই—এক সন্ধ্যায় হঠাৎ

তাঁর বোধ হল—"There is flowing, rushing, all round me—the invisible rush of creation." বিশ্বের সেই অকারণ, অবারণ চলার প্রতীক—বলাকা, নদী, কাল স্রোত। ১৯১১ সালে অনুদিত বের্গসঁর Creative Evolution অবশ্যই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, তবে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের 'চরৈবেতি' থাকা স্বাভাবিক। 'উচ্ছ্বিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুর পর্বতে'র ভাবনা সম্পূর্ণ বের্গসঁর । 'বলাকা'র দর্শন যাই হোক, আমার মতে এখানেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সূত্রপাত। অসাধারণ কিছু চিত্রকল্প পাচ্ছি তাতে। ফুল, চাঁদ, পাখি, নদী, বধূ—এ সব রোমান্টিক চিত্রকল্প আর ফিরবে না তা নয়। কিন্তু 'আঁধারে মলিন হল খাপে ঢাকা বাঁকা (অন্তমিল) তলোয়ার', 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', 'শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে', 'মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা/ লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা'—নতুন একটা বিস্ময়ের জগৎ উদ্‌ঘাটন করল। ছন্দের অভিনবত্ব লক্ষণীয় প্রথম স্তবক থেকেই। 'খেয়া'র দীর্ঘ চরণ ভেঙে ছোটো বড়ো করে, সাধারণত অন্তমিল রেখে, কিন্তু প্রায়ই প্রথম ও চতুর্থ চরণে বা পরপর তিনটি/চারটি চরণে মিল দেখিয়ে, তিনি একটা প্রচণ্ড গতিবেগ তৈরি করেছেন। তাতে শুনতে পাই বলাকার অন্তহীন পক্ষবিধূনন, বা নদীর অন্তহীন স্রোতধ্বনি। মধ্যমিলের এক আশ্চর্য উদাহরণ—'ঝিলিমিলি ঝিলমের', 'দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ প্রান্তে', 'হেথা নয় হেথা নয়; অন্য কোথা'। অনেক কবিতায় প্রথম ভাগে একটি বিশেষ ভাবনার বিকাশ করে মধ্য পথে বিপরীত ভাবনার আমদানী করে, একটা আঘাতের সৃষ্টি করে, কবি আমাদের চেতনাকে নতুন এক স্তরে উন্নীত করতে চাইছেন। শা-জাহানের ঠিক মধ্যপথে, 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নই প্রিয়া' যখন আমাদের পরিচিত আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শোনা গেল—'মিথ্যা কথা ! কে বলে যে ভোল নাই ?' 'ছবি'তে উল্টোটা ঘটেছে। 'তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি' এই সিদ্ধান্তে যখন আমরা বিষণ্ণ, তখন হঠাৎ শোনা গেল তীব্র প্রতিবাদ—'কী প্রলাপ কহে কবি ! তুমি ছবি ! নহে, নহে, নও শুধু ছবি।' 'দান' ত' 'শেষের কবিতার'র শেষ কবিতার পূর্বাভাস।

এরকম আরেকটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 'পূরবী'তে সূচিত। তার প্রথমদিকের 'লীলসঙ্গিনী' জীবনদেবতা পর্যায়ের 'নিরুদ্দেশযাত্রা'র সঙ্গিনী থেকে আলাদা নয়। কিন্তু নতুন সৃষ্টির জন্য চাই নতুন প্রেক্ষাপট, চাই প্রেরণাময়ী নারী সঙ্গ, যার থেকে বহুদিন কবি বঞ্চিত। 'তপোভঙ্গ'-এ শিবের চিত্রকল্পে নিজেকে দেখেছেন কবি। 'গীতাঞ্জলি' থেকে যে দীর্ঘ তপস্যার শুরু তা শেষ হয়েছে। তাই অস্থিমালার বদলে চাই মাধবী বল্লরী, চিতভস্মের স্থানে পুষ্পরেণু। 'আহ্বান' কবিতায় আমরা জানতে পারি কেমন হবে সে নারী—'মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো আনো আনো ডাকি—বর্ষণ কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো হে কালবৈশাখী।'

একটি চরণে 'র'র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে কবির সব ব্যাকুলতা আর্ত—'তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার সঙ্গ সুধা রস।'

১৯২৪-এর শেষে আর্জেন্টিনার সানইসিদ্রো-তে দেখা পেলেন তার। পটভূমিকার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা মিলবে শঙ্খ ঘোষ ও কেতকী কুশারী ডাইসনের রচনায়। 'অতিথি' ছাড়া 'হে বিদেশী ফুল', 'আশঙ্কা', 'শেষ বসন্ত', 'বনস্পতি', 'মিলন', 'অন্ধকার' এবং 'বদল' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্মৃতিতে সুরভিত। 'কিশোর প্রেম'-এর ভীরুতার সঙ্গে তুলনা করুন 'বনস্পতি'র—

দয়া করো, দয়া করো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,

ধৈর্য্য ধরো ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গন মাতিয়ো না।
এ কি তীব্র প্রেম, এযে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ—
দুরন্ত চুম্বন বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব ॥

সেই সময়কার যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে ভিক্টোরিয়ার দিক থেকে কোনো তীব্র প্রেমের কথা কল্পনা করা যায় না। তাঁর সচিব তা অস্বীকার করেছেন এবং আমরা অন্য সূত্রে জেনেছি তিনি তখন এক গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত। কিন্তু কবি বহুদিন পরে খুঁজে পেয়েছিলেন 'যথার্থ দোসর', যার জন্য ১২৮৮ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'তে এত দীর্ঘশ্বাস শুনি। এই 'যথার্থ দোসর' বা 'মম মানস সাথী' তিনি পেয়েছিলেন মাতৃসমা বৌদি কাদম্বরীতে, লুসি স্কটে এবং ওকাম্পোতে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের দোল পূর্ণিমায় পর পর যে কটি কবিতা লেখেন (যা 'মহুয়া'য় সংকলিত), তাতেও অনুরণন শুনি। 'দ্বৈত' কবিতায় নিজেকে 'প্রান্তরভূমি' এবং প্রিয়াকে 'নিরালা পিয়ালতরু বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া' চিত্রকল্পে দেখা যায় কি তারই ব্যঞ্জনা? 'দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখার পদ্ম-আসন সে তোমারে কিছু বলে?' এই চরণের বা 'গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের/কুঞ্জবীথির' ব্যাখ্যাই বা কি হতে পারে? 'মহুয়া'র নারী চিত্রাঙ্গদার শক্তি ও আত্মসম্ভ্রমের আধুনিক রূপ ভালবাসে বলে প্রেমিকের অঙ্গীকারের অপেক্ষা করে না। আসা যাওয়া দুদিকের দ্বারই তার খোলা। 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি'র সঙ্গে তুলনা করলেই প্রেম ভাবনার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

ত্রিশের দশকে নরনারীর সম্পর্ককে আর প্লেটোনিক সংযমের বাঁধে আটকে রাখা গেল না। লরেন্স, হামসুন ইত্যাদির সঙ্গে অত্যাধুনিকতা সবেগে ঢুকে পড়ল। সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক অনেক দিন আগেই উঠেছিল। নীতি ও নীতিহীনতা নিয়েও। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রকাব্য (বিশেষত 'সোনার তরী'র যুগের) ধোঁয়াটে এমন কি অর্থহীন, মনে করতেন। কিছু কাব্য তাঁর কাছে অশ্লীল ঠেকেছিল। তাঁর প্রতিক্রিয়া হল রুচিহীন নাটক—'আনন্দবিদায়' এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ। এডওয়ার্ড টমসনের নোটবইতে পড়ি, 'ঘরে বাইরে' নীতিহীনতার অপরাধে নিন্দিত হয়েছিল বলে কবি আহত হয়েছিলেন। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'-র আগে নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে একই অভিযোগ তোলা চলত 'নষ্টনীড়' সম্বন্ধে। আবার তথাকথিত বাস্তববাদীরা তাঁকে অত্যন্ত আদর্শবাদী রোমান্টিক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর দুই প্রতিপক্ষ—(১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (২) কল্লোলগোষ্ঠী।

বস্তুতঃ সব বিতর্কের কেন্দ্রে নরনারীর সম্পর্ক। বঙ্কিমচন্দ্র এ সমস্যা কেমন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন আগেই আমরা দেখিয়েছি। তাঁর বিশ্লেষণে মনস্তত্ত্ব একটা ভূমিকা নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সেই ভূমিকাকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করেন মাত্র। এ ব্যাপারে বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা পারম্পর্য বর্তমান। তারপর কল্লোলগোষ্ঠী তাতে ছেদ টানল।

ইতালীর র‍্যানেশাঁসে এ প্রশ্ন ওঠেনি। সেখানে ব্যক্তি (বিশেষতঃ পুরুষ)—amoral বা নীতি দুর্নীতির প্রশ্নের উর্ধে অবস্থিত। মিকেলাঞ্জেলো ব্যতীত র‍্যানেশাঁসের প্রায় প্রত্যেক প্রতিভূর ব্যক্তিগত জীবন অনুধাবন করলে এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের

ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা, সেখানে নীতি বাইরে, দুর্নীতি ভেতরে থাকতেও পারে, আর amorality-র প্রশ্নই ওঠে না। দুর্নীতিযে ভেতরে ভেতরে ছিল তার অনেক প্রমাণ উনিশ শতকের সাহিত্যে ও সংবাদে পাওয়া যায়—হুতোমের মত, আলালের মত সাক্ষ্য দুর্লভ। কিন্তু ভিক্টোরিয় পিউরিটান দৃষ্টিভঙ্গি বাইরের, সামাজিক, আচরণের ওপর একটা আব্রুর পর্দা টেনে দিয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। রামকৃষ্ণ ও তাঁর সম্প্রদায় ত' কাম কাঞ্চন ত্যাগকেই সাধনার প্রথম সোপান বলে নির্দেশ করেছিলেন।

বঙ্কিমকে তাই নরনারীর সম্পর্ক খুব সাবধানে বিচার করতে হয়েছে। কুন্দ ও রোহিণীর মত সুন্দরী বিধবা অভ্যস্ত পারিবারিক জীবনের মৃদু স্রোত উত্তাল করে তুলেছে। শৈবলিনী বিধবা না হয়েও আরো মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে—স্বাধীন প্রণয়ের। বঙ্কিম হয় তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছেন (কুন্দ ও রোহিণী), না হয় প্রায়শ্চিত্ত, এমন কি নরক দর্শন (শৈবলিনী)। যাঁরা বঙ্কিমকে দোষ দেন, তাঁরা দান্তের ফ্রাঞ্চেস্কাকে স্মরণ করুন। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি' 'ও 'ঘরে বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কি করলেন ? কোনো সন্দেহ নেই, কবি বলে তিনি নারীর মনস্তত্ত্বের আরো গভীরে গেছেন। অবহেলিত চারুলতা যে অমলের উত্তপ্ত যৌবনের সান্নিধ্যে এসে জাগ্রত হতে পারে, চারুলতার মনোভাব জেনে ভূপতি হতে পারে মর্মাহত এবং উভয়ের মধ্যে অমল চিরদিনই বিরাজ করবে—এমন ট্র্যাজিক ইঙ্গিত পাই। কুন্দ বা রোহিণীর মত কারুর মৃত্যু ঘটেনি—তবু ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ নিয়েছে প্রণয় ত্রিভুজ। বিমলা তেমন নারী যে পুরুষের কাছ থেকে জোর কামনা করে, নিখিলেশের প্রায় অতীন্দ্রিয় প্রেমে সে অবচেতনে অতৃপ্ত ছিল। সন্দীপের পেছনে ছিল দেশপ্রেমিকের জ্যোতির্বলয়, মুখে ছিল নীট্‌শের সুপারম্যান সুলভ বাণী। বিমলা তার প্রতি আকৃষ্ট হতেই পারে। কিন্তু স্বামীর নীরব ভালোবাসার ঔদার্য সে পূর্ণ বিস্মৃত হয়নি। তাই সন্দীপের মুখোশ খসে পড়তেই সে এত সহজে ফিরে আসতে পেরেছিল পুরোনো বন্দরে। এখানে সন্দীপ মধ্যবর্তী হয়ে থাকতে পারেনি, তাই ট্র্যাজেডিও ঘটেনি। বরং 'বাইরে'র নির্মম আঘাতে বিমলার চিত্ত প্রেমের পূর্ণতায় জাগ্রত হয়েছিল। 'চোখের বালি'র সমস্যা আলাদা। বিনোদিনী বিধবা কিন্তু কুন্দের মত অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পিত নয়। তার অতৃপ্ত যৌবন জ্বালা অতি প্রখর, বিশেষত আশা ও মহেন্দ্রের প্রণয় দৃশ্য তা আরো উদ্দীপ্ত করেছিল। মহেন্দ্রও এক অপরিণত বালিকাবধূর কাছে প্রেমের বৈচিত্র না পেয়ে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। দুপক্ষেই যৌনতা প্রবল ('নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে'তে তা নয়)। এমন সময় এল বিহারী। বিনোদিনী তাকে দেখে বুঝল সত্যকার প্রেম কি। কিন্তু সে প্রেম আশায় সমর্পিত বুঝে প্রতিহিংসায় মহেন্দ্রকে ঘর ছাড়া করল সে। শেষে ভুল বুঝে মহত্তর প্রেমের কাছে আত্মনিবেদন এবং বারাণসী অর্থাৎ sublimation-এর পথে সমাধান।

একই সমস্যা চ্যালেঞ্জ রূপে নিয়েছেন, শরৎচন্দ্র। তাঁর প্রতিক্রিয়া দ্বিবিধ। 'চরিত্রহীন'-এর কথা ধরা যাক। সাবিত্রী sublimation -এর পথে গেছে কিন্তু কিরণময়ী আহত ফণিনীর মত দংশন করেছে উপীনকে—দিবাকরকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। কিরণময়ীর কামনা ডাক্তারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে মেটেনি। সে ঘোলাজল ছেড়ে উপীনের প্রেমের বিশুদ্ধ জলে স্নান করতে চেয়েছিল। নিজের রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে সে অতি সচেতন, উপীনের স্ত্রীকে অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কিন্তু উপীন যে সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে (তার ধারণা হয়েছিল উপীন তার প্রতি আকৃষ্ট) তাকে প্রত্যাখ্যান

করবে, এমনকি viper বলে ঘৃণা করবে, এ দুঃখ তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করল। দিবাকরকে নিয়ে বর্মা যাওয়া উপীনের ওপর সব চেয়ে মর্মান্তিক প্রতিহিংসা। কিন্তু সেই রাত্রে বুঝল, এভাবে ভালবাসা পাওয়া যায় না। তারপর অহর্নিশি নিজের অনুশোচনা ও দিবাকরের যৌনক্ষুধার সঙ্গে লড়াইয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সে উন্মাদ হল। অন্যদিকে সাবিত্রী তার অশুচি দেহ কিছুতেই সতীশের হাতে তুলে দিতে পারল না—sublimation-এর পথ নিল। অশুচিতা বোধ পিয়ারী বাঈজীর ক্ষেত্রে আরও তীব্র। 'শ্রীকান্তে'র সবটাই প্রায় পিয়ারী ও রাজলক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব। রাজলক্ষ্মী সেবায় প্রেমে গ্রহণ করতে চায়, পিয়ারী তা পাপ, প্রতারণা বলে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথম পর্বের শেষে তাই শ্রীকান্তও বলছে, "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরে ঠেলিয়া ফেলে।" কিন্তু সেও মানুষ। আকর্ষণবিকর্ষণে ক্রমাগত ক্ষতবিক্ষত হয়ে কমললতার সঙ্গে সে চলে যেতেও চেয়েছিল। কিন্তু আসল ট্র্যাজেডি কোথায়? পিয়ারীর অশুচিতাবোধ ও শ্রীকান্তর সম্ভ্রমবোধের মধ্যে কোন সেতু গড়ে উঠতে পারল না।

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'-এর পটভূমিকা, আবহ—সবই আলাদা, কিন্তু একটা কোথাও মিল আছে। কুমুর মনে বিবাহ সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কার বলবৎ, তার সঙ্গে দাদার দুর্বিপাক মিলে মধুসূদনের সঙ্গে তার বিবাহ, যা নানা অর্থে অসবর্ণ। সংঘর্ষ বাধল পড়তি ঘরের আভিজাত্য ও উঠতি ঘরের স্থূলতার সঙ্গে। কুমুকে তার স্বামী সম্পত্তি ও ভোগের সামগ্রী মনে করে, ব্যবসাদারের তাই স্বভাব (যেমন গলস্‌ওয়ার্দির সোমস্ ফরসাইট)। কুমু তার মধ্যে কালিদাসের শিবকে ত' খুঁজেই পায় না, পায় এক রুচিহীন, রূঢ়, দর্পিত, কামুক পুরুষকে। কিন্তু ত্যাগ করতে চাইলেও ত্যাগ করা যায় না। সংস্কারের চেয়েও বড়ো বাধা তার আর্থিক নিরাপত্তার অভাব। তবু হয়তো সে বিদ্রোহ করত (শরৎচন্দ্র তাই চেয়েছিলেন), কিন্তু বাধ সাধল সন্তানের অযাচিত আবির্ভাবে। রাজলক্ষ্মী হেরেছে পাপবোধের কাছে, কুমু হারল সন্তানের মঙ্গলকামনায়। কিন্তু এটাও তার সুকুমার মনের পক্ষে, রুচির পক্ষে দুর্বিষহ।

শরৎচন্দ্রে দুটি অদ্ভুত চরিত্র দেখি—অচলা ও কমল। অচলা দুই পুরুষের মধ্যে দোদুল্যমান এবং উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। মহিমের চারিত্র ও সুরেশের ঐশ্বর্য দুটোই সে চায়। হয়তো সুরেশের প্রবল পৌরুষকেও। এখানে সন্দীপের প্রতি বিমলার সাময়িক আকর্ষণের কথা মনে পড়ে। ট্রেনে সুরেশ যে সব কটূক্তি করেছিল তার সবটা ত' মিথ্যে নয়। অচলা পরের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যেতে পারত, যায়নি। সুরেশের জোরেই কাছে আত্মসমর্পণে সে বিধ্বস্ত কিন্তু অবস্থার সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছিল। সুরেশ যেন পুরুষ কিরণময়ী—নাস্তিক, ইহবাদী, আত্মকেন্দ্রিক। সুরেশ তার সবটা পায়নি বলে নিজেকে সরিয়ে না নিলে তাদের যৌথ জীবন একরকম চলত। সুরেশের মৃত্যু কোন সমাধানই নয়। সে চিরকাল মহিম ও অচলার মধ্যে ব্যবধান হয়েই থাকবে। কমল শরৎচন্দ্রের আধুনিকতম চিন্তার নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে এক্‌সিটেনসিয়ালিজম্ সেই প্রথম ঢুকল। বিবাহ সংস্কারকে অভয়াও অবহেলা করেছিল, কারণ সে ভালোবাসার সব চেয়ে সদর্থক পরিণতি—মাতৃত্ব—চেয়েছিল। 'শেষ প্রশ্নে'র কমলের কাছে মাতৃত্ব গৌণ। সে আশুবাবুর পত্নীপ্রেম, হরেনের রিভাইভ্যালিজম, রাজেনের দেশপ্রেম—কোনকিছুকে বিশ্বাস করে না। সে ক্ষণবাদী। একমাত্র সত্য নিজের অস্তিত্ব এবং তার কাছে খাঁটি থাকা। অতখানি আর কেউ যায়নি। বিবাহ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে বেশি। ভালবাসার বাঁধন ছাড়া কোন বাঁধনই কমল স্বীকার করে না। "একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার

(নর/নারীর) অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। আয়ুর দীর্ঘতাকে সে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে না, আনন্দের স্থায়িত্বে তার বিশ্বাস নেই। "...কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত' মানব জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাধঁতে গেলেই সে মরে। তাইত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ।" আশুবাবুও তার কাছে শিখেছিলেন, অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। কিন্তু যা কমলকে মুক্তি দেবে, অজিতকে তা না দিতে পারে। আদর্শ ত' সবাইকার জন্য নয়, তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে তার শুভ যায় ঘুচে। তা দুঃখের নজির সৃষ্টি করে। উত্তরে কমল বলে, "যে দুঃখকে ভয় করবেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তার চেয়েও বড়ো আদর্শ জন্মলাভ করবে...এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে।" আশুবাবু অবশ্যই এই বৈপ্লবিক ক্ষণবাদ (না-feminism-এর শুরু ?) মেনে নিতে পারেননি। অকালমৃতা স্ত্রীর প্রতি মোহ বা দুর্বলতা তিনি ছাড়বেন না। কমলের চরিত্রে কিন্তু Sartre'র অস্তিত্ববাদের ছায়া কিন্তু পড়েনি। কোথায় তার মধ্যে প্রকৃত অস্তিত্ববাদীর আত্মজিজ্ঞাসা, দায়িত্ববোধ, উদ্বেগ (nausea)? আপন মতে সে অনড়। তার চরিত্র প্রথমে ও শেষে একই থেকে গেছে।

যতই নিজেকে avantgarde ভাবুন, শরৎচন্দ্র সাহিত্যে কোন বে-আব্রুতা আনেননি। তা আনল কল্লোলগোষ্ঠী। অশ্লীলতা নিয়ে জোড়াসাঁকোয় বিচারসভা বসল—রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক আদর্শবাদ উপহসিত হল বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ক্ষণবাদী), বিষ্ণু দে প্রভৃতি আধুনিক কবির দরবারে।[১৮] 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে জবাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক কবিরা বলতে চান, মোহ জিনিসটাতে আর দরকার নেই, অথচ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ। "আমরা সে কালের কবি, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। ইশারা ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল, লজ্জার যে আবরণ সত্যের বিরুদ্ধে নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারিনি।... আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে, ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়।" 'শেষের কবিতা'য় নিবারণ চক্রবর্তীর হার হয়েছে কবির কাছে।

তবু তিনি আধুনিক হবার চেষ্টা করেছিলেন পর পর চারটি কাব্যগ্রন্থে—'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'—১৯৩২ থেকে ১৯৩৬-এর মধ্যে। পাউণ্ডকে তিনি আগে থেকে জানতেন, অমিয় চক্রবর্তী তাঁকে এলিয়টের সঙ্গে পরিচয় করালেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল পশ্চিমের আদলে ছবির পর ছবি আঁকা। নেড়িকুকুরের ট্রাজেডি, কিনু গোয়ালার গলি, হরিপদ কেরানী সবাই স্থান পেল অলকা, অমরাবতীর পাশে, সজিনা-মালতী লতার। টেকনিকে 'বলাকা'র যুগের পরিবর্তনের কথা আগেই বলেছি। এখন এল মুক্তবন্ধ, গদ্যছন্দ।

কিন্তু বেশি দিন এই tour de force চলল না। ফরাসী প্রতীকী কাব্য—মালার্মে, ভালেরি, র‍্যাঁবো, প্রভৃতি—এমনকি এলিয়ট পরবর্তী স্পেন্ডার, অডেন, ডে লুইসকে তিনি সাদরে বরণ করতে পারলেন না। যুগের মেজাজ সম্পূর্ণ বদলে গেছল।

> Trying to learn to use words and every attempt
> Is a wholly new start, and a different kind of failure
> (Eliot, East Coker)

অনেক পশ্চিমী পাঠকও এই "appallingly explosive fusion of reason and

unreason, intellect and emotion, subjective and objective."-কে নিতে পারেননি। [৭৭] জার্মেনি, ইতালী ও রাশিয়ায় ক্রমবর্ধমান একনায়কতন্ত্র কাব্যে ও শিল্পে নানা বাদী-প্রতিবাদী রূপ নিল—পুরো ডায়োনিশীয় সেই আন্দোলন। 'প্রান্তিক' থেকে 'সভ্যতার সংকট' এরই প্রতিবাদ। সাহিত্যের পালাবদল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, যদি তা ভিক্টোরিয় সাহিত্যের অতি প্রসাধন কলার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে, "A reaction against a particular mannerism is liable to produce its own mannerism in a militant fashion...tired of the elaborately planned flowerbeds, the gardener proceeds with grim determination to set up everywhere artificial rocks, avoiding natural inspiration of rhythm in deference to a fashion of tyranny which itself is a tyranny of fashion."[৭৮] আজন্ম অ্যাপোলোনিয়ান তিনি, পশ্চিমের এই ডায়োনিশিয়ান কুশ্রীতা মেনে নিতে পারেননি।

আবার রোমান্টিকতা ফিরে এল, ফিরে এল মিস্টিসিজম। 'সেঁজুতি', 'আকাশপ্রদীপ', 'সানাই'তে প্রথমটা, 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষলেখা'য় দ্বিতীয়টা। 'প্রথমদিনের সূর্য' কিংবা 'রূপনারায়ণের কূলে'—অদ্বৈত ভাবনায় প্রত্যাবর্তন। 'জন্মদিনে'র ১৩ ও ২৩ সংখ্যক কবিতা ত' ঈশার অনুবাদ। তাঁর মত আর্য ঋষিরাও ত' চেয়েছিলেন অনায়াসে জীবনের সব ছলনা সহ্য করে—

হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

প্রাচীন গ্রিসের সংস্কৃতি ও পঞ্চদশ শতকের ইতালীর ভাবসমন্বয়ের ফলশ্রুতি—র‍্যনেশাঁস। আধুনিক ইওরোপ ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় প্রয়াসের ফলশ্রুতি—উনিশ বিশ শতকের লিবারেল বাঙালী কালচার।

১৩

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুদের বেঙ্গল স্কুল বা ওরিয়েন্টাল আর্টের চারিত্র ও ভারতীয়ত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। অতি সাম্প্রতিক সংযোজন—তপতী গুহঠাকুরতার অক্সফোর্ড গবেষণা। [৭৯] শিরোনামে Indian শব্দটির দুই পাশের শীর্ষচিহ্ন এবং উপশিরোনাম পড়লে গ্রন্থকর্ত্রীর সংশয় বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রাচ্য শিল্পকলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই প্রথম নয়। অ্যাকাডেমিক শৈলীতে অভ্যস্ত জে. পি. গ্যাংগোলি থেকে কলকাতা গ্রুপের পরিতোষ সেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে উইলিয়াম আর্চার, অতি সম্প্রতি অতুল বসু, অনেকেই এর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, রিভাইভ্যালিস্ট মানসিকতা, নিরক্ত, অবাস্তব, আদর্শবাদী, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করেছেন। তপতী গুহঠাকুরতার নূতনত্ব এবম্বিধ সমালোচনাকে এডওয়ার্ড সইদের Orientalism গ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ। [৮০]

হ্যাভেল, কুমারস্বামী, ওকাকুরা, ও নিবেদিতার ভূমিকা অবনীন্দ্রনাথপ্রবর্তিত শিল্প আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু তপতীর মতে, সরকারি ওরিয়েন্টালিজম (যার মুখপাত্র স্বয়ং লর্ড কার্জন) এর চেয়েও হ্যাভেলের ওরিয়েন্টালিজম আরও বেশি hegemonic (প্রতিষ্ঠাকামী ?), কারণ তা সদ্যজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। "Orientalism, while it openly emptied itself of its colonial

content, exercised its greatest power in the very authority it commanded over representation—in its ability to shape, define and fix the image of Indian art in both western imagination and nationalist perceptions." এর ফলে শিল্প সম্বন্ধে ধারণা, ঐতিহ্য, ভারতীয়ত্ব—এসব ভাবনার মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যকে প্রাচীন অতীত (মধ্যযুগ বা তার পরবর্তী নয়), ধর্ম (মুখ্যতঃ হিন্দু) এবং মরমীয়া অধ্যাত্মবাদ (ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ)-এর সঙ্গে জড়িয়ে দেখা হয়।

প্রথমদিকে হ্যাভেলের দৃষ্টি ভারতীয় কারুশিল্প ও অলঙ্করণে সীমাবদ্ধ থাকলেও মুঘল মিনিয়েচারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তা চারুশিল্পের দিকে ঝোঁকে। এর অনেকগুলি জাহাঙ্গীরের আমলের শ্রেষ্ঠ দরবারী শিল্পী ওস্তাদ মনসুরের স্বাক্ষর বহন করছে। সরকারী আর্ট গ্যালারীতে এসব ছবি, অজন্তার নমুনা, বাইজেন্টীয় ও প্রাক্-র‍্যনেশাঁস ইতালীয় শিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করে শিল্প বিষয়ক শিক্ষায় নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলেন তিনি। ১৯০৪ সালে সরকার যখন আর্ট গ্যালারির সংগ্রহকে ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত করতে চাইলেন, তখন লাগল কলহ। অবনীন্দ্রনাথকে 'আবিষ্কার' করে তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল। আগেই তিনি (১৯০২) 'স্টুডিয়ো' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পের আশা ও ভবিষ্যৎ বলে জাহির করেছিলেন। এখন (১৯০৫) তাঁকে ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। ব্রিটিশ শিল্পশিক্ষানীতির কঠিন সমালোচক রূপে তাঁর নতুন জন্ম হল। ভারতীয় শিল্প একটা অলঙ্করণ ও কারুশিল্পের জীবন্ত ঐতিহ্য নয়; তার কল্পনা, আধ্যাত্মিকতা, আলাদা নন্দনতত্ত্ব—পশ্চিমী ভুল ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করবে। পরবর্তীকালে লেখা Indian Sculpture and Painting (১৯০৮) এবং The Ideals of Indian Art (১৯১১)-তে জোর পড়ল ভারতীয় চারুশিল্প, তার আর্য বীজসন্ধি, হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ও অধ্যাত্ম চেতনার ওপর। এটা আগেকার প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নয়, এখানে পাশ্চাত্য ও ভারতীয়ত্বের ভেদরেখা সুস্পষ্ট এবং ভারতীয়ত্বের নিদর্শন হল 'divine ideal'.

এই সময় আনন্দ কুমারস্বামীও সিংহলের জাতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন নিয়ে ভাবছিলেন। তাঁর চোখে ধর্মপ্রভাবিত মধ্যযুগের কারুশিল্পই প্রকৃত শিল্প। তা দরবারী নয়, জনগণের। অনেকটা প্রি-র‍্যাফেলাইট (মরিস, রাসকিন ইত্যাদি) চিন্তাধারা। ক্রমে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হল সিংহলী শিল্পের জননীতুল্যা ভারতীয় শিল্পের দিকে। হ্যাভেলের মত তিনিও বলতে লাগলেন, গ্রিক ক্লাসিকাল ও র‍্যনেশাঁসের বাস্তব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিকৃতিমূলক নন্দনতত্ত্বের অনেক ওপরে ভারতের নিও-প্লেটোনিক নন্দনতত্ত্ব। এ সময় প্রাচীন ভারতীয় শিল্প (বিশেষতঃ ভাস্কর্য)-এর ওপর গ্রিক প্রভাব নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল। হ্যাভেলরা দেখালেন ভারতীয় শিল্পের স্বভাব কত পৃথক। বৌদ্ধশিল্প ত' শুধু গান্ধার শিল্পে সীমাবদ্ধ নয়, তাতে ভারহুত, সাঁচী, সারনাথ, অজন্তা, মথুরাও রয়েছে।[৮১]

আনন্দ কুমারস্বামী মনে করতেন এ শিল্পের আদর্শ স্বদেশী আন্দোলনকে প্রেরণা জোগাবে। তবে সে স্বদেশীর অর্থ দেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রসার নয়—অবনীন্দ্রনাথদের শিল্প আন্দোলন। ১৯১০ সালে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসে জর্জ বার্ডউড ইন্দোনেশিয়ায় প্রাপ্ত 'ধ্যানী বুদ্ধ'কে 'a boiled suet pudding' বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে রদেনস্টান, রজার ফ্রাই-রা রুখে দাঁড়ালেন। কি পূর্ব, কি পশ্চিম, সর্বত্র হ্যাভেল-কুমারস্বামীর থিসিসের (এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শৈলীর) জয়ধ্বনি উড়ল।

১৯১৬ সালে প্রকাশিত কুমারস্বামীর Rajput Painting সে ধ্বজাকে সুপ্রোথিত করল।

ইতিমধ্যে ১৯০২ সালে ওকাকুরা এসেছেন ভারতে এবং তাঁর The Ideals of the East (১৯০৩) গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ভগিনী নিবেদিতা। সেখানে উঠল এশীয় শিল্পের পটভূমিতে ভারতীয় শিল্পের ভূমিকার কথা। ওকাকুরা বললেন, 'Asia is one'. জাপান, ভারত, চীন, কোরিয়া, ইন্দোচীন, এশিয়ার সর্বত্র এক নান্দনিক আদর্শ বিরাজ করছে এবং তার আদি জননী—ভারত। তবে পশ্চিমের সঙ্গে দ্বন্দ্বে একমাত্র জাপানই তার স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। মেইজিদের প্রত্যাবর্তন থেকে জন্ম হয়েছে এক আধুনিক র‍্যানেশাঁসের এবং তার থেকে প্রেরণা নিয়ে জাপান হয়েছে 'the new Asiatic power'. ১৯০৫-এ রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করে জাপান পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিল। পশ্চিম থেকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান নিতে তার বাধেনি, কিন্তু আপন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিনিময়ে নয়। প্রমাণ—ওকাকুরার প্রেরণায় গঠিত নিপ্পন বিজিৎসুইন-এর জাতীয় শিল্প।

নিবেদিতা ওকাকুরার যুক্তিকে কাজে লাগালেন। জাপানের জাগরণ বলতে ওকাকুরা কি বুঝছেন? নিবেদিতার মতে, তা হল জাপানী সংস্কৃতির মুখ্য উপাদান—ভারতীয় আদর্শের পুনর্জাগরণ। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি চীন ও জাপানে যায়। আজও কিয়োতো, নারাতে তার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যাবে। কিন্তু সে বৌদ্ধধর্মের জননী হল হিন্দুধর্ম, আবার তাকে কুক্ষিগতও করেছে পরবর্তী হিন্দুধর্ম। বিবেকানন্দের শিকাগো ও অন্যান্য বক্তৃতা থেকে নিবেদিতা আপন মতের সমর্থন সংগ্রহ করলেন। তপতীর মতে, এ ভাবে হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের সঙ্গে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ মিশিয়ে নিবেদিতা তৈরি করলেন ভারতশিল্পের ব্যাখ্যা এবং 'প্রবাসী', 'মডার্ন রেভ্যু' মারফৎ তা বহুল প্রচার পেল।

The Extremist Challenge গ্রন্থে আমি দেখিয়েছি, বিবেকানন্দকে রিভাইভ্যালিস্ট মনে করা অন্যায় এবং নিবেদিতা সব বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণও করেননি। তাঁর আইরিশ রক্ত মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদকে মাঝে মাঝে তিনি মিশিয়ে ফেলেছেন। বিবেকানন্দের ধর্ম সংকীর্ণ ছিল না। ওকাকুরার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। বেলুড়ে তাঁকে বলেছিলেন, "এখানে আমার সঙ্গে আপনার করণীয় কিছু নেই। এখানে তো সর্বস্বত্যাগ।" এবং তাঁর সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে নিবেদিতাকে তিনি বারণও করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা তা শোনেননি। রেমঁ (লিজেল রেমঁ) এরবেরের নিবেদিতাজীবনে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব নান্দনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশি জানতেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান গভীর ছিল না। তবে নিবেদিতার উচ্ছ্বাস—'নিছক এক সাহিত্যিক বেলুন, ছবির নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণহীন, বায়বীয়'—পরিতোষ সেনের এমন মন্তব্য পুরো মানা যায় না। এ বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু যে আলোকপাত করেছেন, তপতী তার সঙ্গে অপরিচিত।

১৮৯০-১৯১০-এর পরিবেশ কি ছিল, কি আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশে চরমপন্থী রাজনীতির জন্ম হয়, কোথায় তা বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের ভাবধারা থেকে নিয়েছে, কোথায় নেয়নি, কেন তা দয়ানন্দের কাছ থেকে আর্য উচ্চমন্যতা (বিবেকানন্দ যার ঘোর বিরোধী) নিল, কেন হিন্দু (বিশেষতঃ শাক্ত) ধর্মকে ব্যবহার করল এবং দুর্গা ও দেশমাতার সমীকরণ করল—এসব ভাল করে না বুঝলে Oriental art, নিবেদিতার ভূমিকা, বোঝা যাবে না। অবশ্যই তার দ্বারা চারুশিল্পের ধারণা প্রভাবিত হয়েছিল, যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, এমনকি বিজ্ঞান। কিন্তু তাই কি অবনীন্দ্রনাথপ্রবর্তিত শৈলী বুঝতে যথেষ্ট? চতুর্দশ শতকের

ইতালীয় ক্লাসিসিজ্‌ম ও হিউম্যানিজ্‌ম দিয়ে পঞ্চদশ/ষোড়শ শতকের শিল্প সবটা বোঝা যায় না। এক্ষেত্রেও তাই। প্রবহমানতা ও পরিবর্তন পাশাপাশি চলে। কখন যে কোনটা প্রবল হয় তা বুঝতে গেলে স্থানীয় ঐতিহ্য (যেমন ফ্লোরেন্সের ক্ষেত্রে তাসকানির শিল্প ধারা), শিল্পীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের রুচির খোঁজ নেওয়াও প্রয়োজন। ফিউড্যালিজ্‌ম বা ক্যাপিটালিজমের মত ওরিয়েন্টালিজ্‌মও একটি blanket term. তার চাবি দিয়ে সব দরজা খোলা যায় না।

অবশ্যই হ্যাভেলের সব কথা বেদবাক্য নয়, যেমন ভারতীয় শিল্পের সবই idealistic, mystic, symbolic ও transcendental. গ্রিক শিল্পকে ছোট করার জন্য তিনি 'চক্রক্ষেপক' (discus thrower)-এর সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের তুলনা করেছেন। আরও ভুল করেছেন—মৌর্য ও গুপ্তযুগের পরে ভারতশিল্প ক্রমশ অবনতির পথে চলেছিল, এমন সিদ্ধান্ত করে। হ্যাভেলের মতে গুপ্তযুগের পরই মুঘলযুগ সৃষ্টিশীল, মাঝখানে সব অন্ধকার! পালযুগের ভাস্কর্য, পুরী, ভুবনেশ্বর, কোণারক, খাজুরাহোর অনবদ্য মূর্তি শিল্প তাঁর চোখে পড়েনি। হয়তো প্রায় নগ্ন, যৌনতাউদ্দীপক, নায়িকা ও অলস কন্যাদের সম্বন্ধে তাঁর ভিক্টোরিয় পিউরিটান আপত্তি ছিল। কিন্তু শিশু ক্রোড়ে জননীর মূর্তিও ত' দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' স্মরণ করুন, সেই বিখ্যাত পঙক্তি, 'এসব মূর্তি যাহারা গড়িয়াছিল তাহারা কি হিন্দু?' আর তারপরে একটার পর একটা evocative মন্তব্য। নিবেদিতা পড়ে ছিলেন অজন্তার যুগে। লেডি হেরিংহ্যামের অভিযান ছিল তাঁর নিজস্ব ভারত আবিষ্কারের অভিযান। তারপর যেন কিছু আশা করার ছিল না। তিনিও হ্যাভেলের মত দ্বাদশ শতকের অপূর্ব এবং পার্থিব ভাস্কর্য সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন।

নন্দনতত্ত্ব নিয়ে অত কচকচি না করে, Orintalist discourse-কে অত প্রাধান্য না দিয়ে, প্রাচ্যকলার আসল নিদর্শনগুলি ও তাদের স্রষ্টার কথা শোনা যাক। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'য় লিখছেন, "রবিবর্মাও তো দেশী মতে এঁকেছিলেন কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেননি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হোলো আমার পালা, বিলিতী পোর্ট্রেট আঁকতুম। ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পট পটুয়া জোগাড় করলুম।...তারপর স্বদেশীযুগ দেশের আবহাওয়া, এ সব হচ্ছে সুবাতাস, সেই সুবাতাস ধীরে ধীরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলল।"[৮৩] পোর্ট্রেট আঁকা শিখেছিলেন ইতালীয় চিত্রকর গিলার্ডি ও পামার সাহেবের কাছে। মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথ ও শিশু অলকেন্দ্রের পোর্ট্রেট এই স্টাইলে আঁকা। কোলরিজ ও মুরের দুটি ব্যালাডের অলংকৃত চিত্র এবং দিল্লী কলমে আঁকা কিছু ছবি তাঁকে নকশার দিকে আকৃষ্ট করল। গোবিন্দদাসের শুক্লাভিসার পদের ভাব নিয়ে আঁকা ছবিটি পাশ্চাত্য অলংকৃত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে বেশি তুলনীয়।

কৃষ্ণ-লীলা সিরিজই হয়তো ভারতীয় শৈলীতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। বুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে 'বুদ্ধ-সুজাতা' ও ঋতুসংহার থেকে ভাব নিয়ে 'পথিক ও পদ্ম' এবং 'অভিসারিকা', ঠাকুর পরিবারের ওপর বৈষ্ণব পদাবলী, বৌদ্ধাবদান ও কালিদাসের প্রভাব স্মরণ করায়। ১৮৯৭-এর 'শুক্লাভিসার'-এর তুলনায় ১৯০০-র 'অভিসারিকা' অনেক পরিণত। 'পথিক ও পদ্মে'র ওপর মুঘলশৈলীর ছাপ।

১৮৯৭ থেকে হ্যাভেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ। "এদেশের আর্ট বুঝতে এমন দুটি ছিল না। রোজ দুঘণ্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি, মূর্তির সৌন্দর্য, মূল্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন...ভাবি সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন করে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ তবে কয়লা ছিলেম, কয়লাই হয়তো

থেকে যেতাম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটতো না দেশের শিল্প সৌন্দর্যের দিকে।"...[৮৪]

'সাজাহানের মৃত্যু', 'সাজাহানের স্বপ্ন', 'তাজনির্মাণ', 'জেবউন্নিসা', ঔরঙ্গজেবের সর্বশুক্ল সুদীর্ঘ পূর্ণাবয়ব চিত্র ইত্যাদি দেখলে মনে হবে নন্দবাবু ঠিকই বলেছেন, "অবনীন্দ্রনাথ মোগল চিত্ররীতির ধারার শেষ বড়ো প্রতিভা।" হ্যাভেলই 'তাজনির্মাণ' এবং 'সাজাহানের মৃত্যু' দিল্লী দরবার প্রদর্শনীতে পাঠান। কিন্তু যতই তার নক্‌শা ও নির্মাণ ভালোবাসুন, মুঘল রীতির একটা অভাব টের পেতেন অবনীন্দ্রনাথ—তার ভাবের অভাব। বিল আর্চারি আরও কয়েকটা অসুবিধার কথা বলছেন : যেমন মুঘল শৈলীর প্রধান লক্ষণ হল চড়া রঙ, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম detail, চরিত্রচিত্রণে আগ্রহ ও নাটকীয়তা। অবনীন্দ্রনাথদের পরিবার বড় বেশি বাঙালী, আর মুঘল শিল্প উত্তর ভারতীয়। এখানে শুধু দৃষ্টিভঙ্গির নয়, আবেগ ও অনুভূতিরও পার্থক্য। আর্চারের মতে, হ্যাভেল একটা tour de force করতে চেয়েছিলেন। তাই ভাব দাঁড়াল ভাবালুতায়।

এতটা মানা যায় না—অন্তত 'সাজাহানের মৃত্যু' চিত্রের ক্ষেত্রে। এখানে সাজাহানের বিরহ জীবনের অনিত্যতা ও শিল্পের চিরন্তনতার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর মাত্রা পেয়েছে। তাছাড়াও ছিল শিল্পীর কন্যাবিয়োগজনিত বেদনা। অর্থাৎ একটা ব্যক্তিগত ও ইতিহাসগত ভাবকে একটা বিশেষ টেকনিকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'শিল্পচর্চা সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা'য় অবনীন্দ্রনাথ নিজেই এসব কথা বলে গেছেন। রেখার চেয়েও এখানে রঙয়ের মূল্য বেশি, কারণ রঙই পারে নিবর্ত্তক ভাবনা ও আবেগের ব্যাপক প্রকাশ করতে। এবং তা মুঘল শৈলীর চড়া রঙও নয়, ঘষা বাদামি, কালো, মলিন সাদা। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাসে সকল আকাশ করুণ। মুঘল সম্রাটের আসন্ন মৃত্যুর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর অমর কীর্তি। অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' কবিতা অনেকটা এই ভাব প্রকাশ করেছিল।

অবনীন্দ্রনাথের ছবি আর এক মোড় নিল তাইকান ও হিসিদার আবির্ভাবে। শুরু হল জাপানী ওয়াশ প্রথা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী আন্দোলন। 'ভারতমাতা'ই হয়তো উভয়ের মিশ্রণ। এই ভারতমাতা বঙ্কিমচন্দ্র-কল্পিত দুর্গা (শক্তি) দশপ্রহরণধারিণীরূপী দেশমাতৃকা নয়। এর যোগিনী মূর্তি। কুমারস্বামী ও নিবেদিতা মডার্ন রেভ্যুতে এর যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তা সকলের জানা।[৮৫] নারীত্বের মহিমা এখন থেকে শিল্পের অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়াল। নন্দলালের 'সতী', 'উমা' প্রভৃতি চিত্রে তার পূর্ণতা।

অবনীন্দ্রনাথ জাপানীদের কাছে তুলি চালনার নৈপুণ্য ও চিনে কালির ব্যাবহারের থেকে বেশি শিখলেন নরম রঙয়ের ব্যবহার। তাইকানকে ছবিগুলো জলে ডোবাতে দেখে শিউরে ওঠেন তিনি, কিন্তু তারপর যখন সূক্ষ্ম টোনগুলো ফুটে উঠল, কি তাঁর বিস্ময়![৮৬] অবনীন্দ্রের নির্দেশে তাইকানের 'কালী' ও 'রাস' এবং হিসিদার 'সরস্বতী'—সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এক অনবদ্য নিদর্শন। মোটের ওপর, ওয়াশ পদ্ধতিতে যেটার ওপর জোর পড়ল তা হল রহস্য, অন্তর্মুখিনতা, অতীন্দ্রিয়তা। 'ভারতমাতা' ছাড়া 'নির্বাসিত যক্ষ' ও 'দেওয়ালি' ছিল এই শৈলীর অন্যান্য চিত্র।

পরবর্তীকালে মিথ, অ্যালেগরি, ফ্যান্টাসি তাঁর ছবিকে গ্রাস করেছিল, এমন মন্তব্যও মানা যায় না। ১৯১১ সালে পুরী ভ্রমণের সময় উড়িষ্যার মন্দির ভাস্কর্য তাঁকে নতুন প্রেরণা দিল। তাঁর ছবি পূর্বের তুলনায় বেশি ভারী, বেশি ভঙ্গিমাময় হয়ে উঠল। বিশেষ করে মেয়েদের গড়নে, অবয়বসংস্থানে, এল বড়ো পরিবর্তন। ১৯২৫-২৬-এর সাজাদপুর ল্যান্ডস্কেপ সিরিজে তিনি আবার ফিরে গেলেন ওয়াশ পদ্ধতিতে। এ যেন রঙে রেখায়

রবীন্দ্রনাথের পদ্মাপর্বের কাব্য—বিশেষ করে বর্ষার দিনের। ১৯৩০-এর পর আঁকা 'আরব্য উপন্যাস' সিরিজে ফিরে এল অলংকরণ। ফিরে এল প্যাস্টেলে আঁকা নিজের ও পত্নী সুহাসিনীর প্রতিকৃতি। মুকুল দে'র চাপে অনেকদিন পর ধরলেন 'কবিকঙ্কণচণ্ডী', 'কৃষ্ণমঙ্গল' ইত্যাদি চিত্রাবলী।[৮৮]

'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', 'ভারতশিল্পে মূর্তি', 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (১৯২১-২৯) প্রভৃতির নন্দনতত্ত্ব ছাড়িয়ে ক্রমেই তিনি প্রবেশ করলেন শিল্পীর তিন মহলা বাড়ির অন্দরমহলে।

শিষ্যদের তিনি বলতেন, "কেন মিছে প্রকৃতিতে যা দেখছ—গাছ, লতা, ফুল, পাখি নকল করতে যাবে? কালিদাসের কাব্যে নিজেকে জারিত কর, তারপর তাকাও আকাশের দিকে। দেখবে চির নতুন মেঘদূতের চিরন্তন ছন্দ। বাল্মীকির সমুদ্র বর্ণনা পড়। তারপর সমুদ্রের ছবি আঁক।"[৮৯] যাকে কুমারস্বামী ঠাট্টা করে বলছেন—'literary crutches', ঠিক তা নয়। শিল্পী বলছেন, সবার আগে উদ্দীপিত কর কল্পনাকে, ভাবকে। ভাবই পরিণত হবে রসে, রূপে। এ'ত কোনো বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের আদর্শ বা আঙ্গিক নয়। এর পেছনে ব্যক্তিগত অনুভূতি, উপলব্ধি, রুচি। প্রাচীন নন্দনতত্ত্বের ব্যাকরণ তিনি পুরো মানেননি, প্রাগাধুনিক পাশ্চাত্য naturalism ত' নয়ই। শিষ্য বিনোদবিহারী মন্তব্য করছেন, "He has a thorough understanding of the canons of Indian art, his intellect comprehends them, but one feels that his heart has not accepted them."[৯০] অবশ্যই তিনি গ্রহণ করেছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-মুঘল-রাজপুত শৈলী থেকে, তেমনি করেছেন পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক আর্ট থেকে, কিন্তু কারও দাসত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর স্টাইল তাঁর নিজস্ব, অনন্য। এমনকি শিষ্যদের ওপরও তিনি তা চাপিয়ে দেননি। ভারতীয় শিল্পের ঝোঁক অলঙ্করণের প্রতি, ইওরোপীয় তৈলচিত্র শৈলীর সাহায্যে তিনি তা উত্তীর্ণ হলেন—'কৃষ্ণলীলা'য়। রাধাকৃষ্ণ সিরিজের ছবিগুলিকে না বলা যাবে ইওরোপীয় মিনিয়েচার, না ভারতীয় অলঙ্করণ। ভারতীয় শিল্পের জড়ত্ব ঘোচানই তার কৃতিত্ব। space-এর খুব একটা স্থান প্রাচীন চিত্রে (অজন্তা ছাড়া) ছিল না, 'ভারতমাতা'য় তা ঢুকল ছবিতে। ওকাকুরা, টাইকান, হিসিদা খুলে দিলেন জাপানী শৈলীর অজানা রহস্যপুরীর দ্বার। ঢুকলো জাপানী ওয়াশ প্রথা। বাঙালীয়ানার গণ্ডী অতিক্রম করেছিলেন মুঘল রাজপুত কলম দিয়ে, এবার ভারতীয়ত্বের গণ্ডী অতিক্রম করলেন জাপানী ওয়াশ দিয়ে। 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' ও অন্যান্য প্রবন্ধ পড়ে মনে হয় তিনি মিস্টিক হতে চাইছেন। কিন্তু 'দারার ছিন্নমুণ্ড দর্শন করছেন আওরঙ্গজেব'—সে চিত্রে কোথায় আধ্যাত্মিকতা? 'বন্দিনী সীতা'র সঙ্গে তুলনা করুন 'জেবুন্নিসা'। অর্থাৎ একে র‍্যানেশাঁস, রিভাইভ্যাল কিছুই বলা যাবে না, এ তাঁর নিজস্ব, মৌলিক। কতখানি দেশী, কতখানি বিদেশী এ প্রশ্ন অবান্তর। নন্দলাল বলছেন, "তাঁর শিল্পী জীবনে একবার দেশী রীতি, flat treatment, আর একবার বিদেশী রীতির three dimensional বাস্তবতা, অলোছায়া, শারীরস্থান, পরিপ্রেক্ষিত প্রধান হয়ে উঠতে চেয়েছে। শুধু তাঁর ওমর খৈয়াম চিত্রধারাও যদি খুঁটিয়ে দেখা যায় পারম্পর্য বিচার করে দেখতে পাব flat treatment দিয়ে আরম্ভ করলেও ক্রমশ realistic হয়ে উঠছে, আবার সেটাকে ভেঙে দিয়ে flat করে আঁকতে আরম্ভ করেছেন—আবার realistic হতে চলেছে।...traditional, conventional রূপ অবনীন্দ্রনাথের রুচিসম্মত ছিল না। তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব convention...অন্যের পক্ষে তাঁর wash-এর পদ্ধতি গ্রহণ করা বিপজ্জনক। তাঁর মতো বাস্তব রূপের জ্ঞান,

অত্যন্ত অভিজাত রুচি ও মাত্রাবোধ না থাকাতে সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়ে পারে না। তাঁর wash পদ্ধতির সৌকুমার্য আর সবলতা অন্যের আয়ত্তের বাইরে।"[১১]

একদিকে তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য র‍্যনেশাঁসধর্মী—ছবি, লেখা, গানবাজনা, অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ সজ্জা—কতগুলো আর্ট নিয়ে তাঁর খেলা। কুটুম কাটামও এক খেলা। হুইজিঙ্গা শিল্পের এই খেলার দিকটা সুন্দর তুলে ধরেছেন। অ্যানাটমি এখানে ছবির বাহন, ছবির কাঁধে চড়ে বসেনি। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র এখানে শিল্পীর দেখাকে নতুন maniera জুগিয়েছে—যেমন অ্যালবের্তি বা ভিট্রুভিয়াসের গ্রিক নন্দনতত্ত্ব করেছিল র‍্যনেশাঁসে। ভাবের জন্য ব্যাকরণকে বলি দিতে কি মিকেলাঞ্জেলো কি লেওনার্দো দ্বিধা করেননি। অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য ভাষায়, "মন দেয় জোগান, চোখ ধরে পাত্রটা, মন ঢেলে দেয় তাতে মধু, তখন সে আর-এক জিনিষ হয়ে যায়। তখনই হয় সোনার ময়ূর, সোনার হরিণ।"[১২] কেন তিনি দিদারগঞ্জ যক্ষী, কোনারকের অলসকন্যা বা খাজুরাহোর অপ্সরাকে মডেল নেননি এ প্রশ্ন বৃথা। র‍্যনেশাঁসের শিল্পে অ্যাপোলো ও খৃস্ট, মেরী ও ভিনাস একাকার হয়ে গেছে। অবশ্যই তিনি সমসাময়িক ইওরোপের impressionism, post-impressionism, cubism ইত্যাদি থেকে ভাবনা নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি হার্বার্ট রীডের সতর্কবাণী ভোলেননি, "strength comes from stability of roots that grow deep into a native style."

গুরুর মত নন্দলাল বসুও কোন বিশেষ শ্রেণী (School)-তে পড়েন না। রামকৃষ্ণ মিশন ও নিবেদিতার প্রভাবে তিনি হিন্দু-বৌদ্ধযুগের প্রতি গুরুর চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। "রামায়ণের ছবিগুলি, বেলুড় মঠে রামায়ণ গান হত, তারই প্রেরণায় আঁকা।" আর্ট স্কুলে আঁকলেন, 'কৈকেয়ী ও মন্থরা', 'অহল্যার পাষাণ মুক্তি', 'গান্ধারী'র মত ছবি। সেখান থেকে গুরুর বাড়িতে, দক্ষিণের বারান্দায়। তারপর এল ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর যুগ। শুরু হল শিবলীলা সিরিজ। মধ্যযুগের শৈব ভাস্কর্য তিনি দেখেছেন এলোরা, এলিফ্যান্টায়, দক্ষিণী ব্রোঞ্জে। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যের শিব বা কালীঘাট পটের শিব তাঁর মডেল হয়নি, জীবন্ত হয়ে উঠল কুমারসম্ভব কাব্য। 'শিবের বিষপান', 'শিব সতী', 'সতীর দেহত্যাগ', 'উমার তপস্যা', 'প্রত্যাখ্যাতা উমা'—প্রত্যেকটি অসাধারণ। মদনভস্মের পর শিব দ্রুত তপঃক্ষেত্র ত্যাগ করছেন, তাঁর হস্তধৃত রুদ্রাক্ষমালা খসে পড়ে জানাল উমার চরম ব্যর্থতা। 'সতীর দেহত্যাগ'-এ নিঃসীম শোকের সে কি সংযত মূর্তি! সতীর দেহ কোলে করে বসে আছেন শিব, এক হাত সতীর মস্তক স্পর্শ করে আছে, আর এক হাত মাটিতে ঠেকান।

নিবেদিতা না এলে নন্দলালদের অজন্তা যাওয়া হত না। ১৯১০-১১ সালে হেরিংহ্যামের সঙ্গে অজন্তা ভ্রমণ নতুন এক জগতের দ্বার খুলে দিল। অসিতকুমার হালদারের Ajanta (1913)-এর অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। না দেখলে নন্দলাল আঁকতেন না 'রাহুল', পরবর্তী যুগের 'নটীর পূজা'। ১৯১৩-তে মন দিলেন পটে। তারপর শান্তিনিকেতন। কানাই সামন্তকে লিখছেন নন্দলাল, "হ্যাঁ, আমার ছবিতে একটা লড়াই করার ও challenge-এর ভাব কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে যা গুরু অবনবাবুর ছবিতে নাই। তা অতি ধীর ও নম্র তাতে আমার ছবির উগ্রতা নাই। উষার আলোর মত, ফুল ফোটার মত বীজ হতে অঙ্কুর হওয়ার মত নিঃশব্দ। গুরু অবনবাবুও মাঝে মাঝে আমার আঙ্গিকের এ উগ্রতা দেখে চিন্তিত হয়েছেন। এর কারণ আমার nationalism-এর ভাব। ভারতশিল্পের গৌরব সাব্যস্ত করতে হবে, আর আমরাও করণ কৌশলে

দক্ষ—জাপান চিনের চেয়ে হীন নই তা প্রমাণ করতে হবে। অবশ্য পাশ্চাত্য শিল্পীদের কাজ দেখে পরে মুগ্ধ হয়েছি...”[১৩] কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। তবে তিনি অন্তরের দিক থেকে তা গ্রহণ করতেন না। “বিনাশের জন্য বিনাশ, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বিচার নেই, কালাকালের হিসাব নেই—তাতে নূতন সৃষ্টির আশা দুরাশামাত্র।” রস, দরদ (বেদনা) বুদ্ধির চেয়ে ঢের বড়ো, “বুদ্ধি বা বিদ্যা সৃষ্টি কার্যের প্রেরণাদাতা নয়, নিয়ামক নয়, মন্ত্রণাদাতা বা অনুমোদনকারী বড় জোর।”[১৪]

গুরু ছিলেন নগরের বিদগ্ধ সমাজের জন্য, নন্দলাল মাটির অতি কাছাকাছি। ‘শিবসতী’, ‘পার্থ সারথি (কুরুক্ষেত্র)’, ‘অর্দ্ধনারীশ্বর’-র সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে কামার, বাউল, স্নানরতা/রন্ধনরতা গ্রাম্য বধূ, সাঁওতালের দল, এমনকি শিবের বাহন ষাঁড়, ছাগল (‘ছাগ অবতার’-এর কথা ভুলবে কে?)। লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ ও হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য আঁকা ছবিতে ভারতের জনজীবনের সমারোহ। শান্তিনিকেতন তাঁর কাছে দ্বিতীয় অজন্তা। সেই অবারিত মাঠ, খোয়াই, কোপাই, বিচিত্র মানুষ ও পশু তাঁকে অদ্ভুতভাবে টেনেছিল। তাঁর ‘দিগ্বলয় শান্তিনিকেতন’ যেন অবনীন্দ্রনাথের পুরীর ধূ ধূ সমুদ্রতীরের ওপিঠ। প্রথম জীবনের শিবের মতই মধ্য জীবনে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন গান্ধীজি। ডাণ্ডি অভিযানে বাপুর সেই দৃপ্ত পদক্ষেপ স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হয়ে রইল।

নন্দলাল বলছেন, “শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে শেষ কথা: আনন্দ থেকেই এর শুরু; রচনাপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রচনা শেষ পর্যন্ত এই আনন্দানুভূতি রচয়িতার মনে জেগে থাকে; সৃষ্টি-সমাধানেই যে এই আনন্দের শেষ তা নয়, বস্তুত দর্শক ও রচয়িতার রসাবেশেই এই আনন্দের মুখ্যতা। সুখদুঃখাতীত এক আনন্দাবেশে শিল্পসৃষ্টিকে আবিষ্ট হতেই হবে, বিষয়বস্তু সুখের বা দুঃখের যাই হোক না কেন।” দ্বিতীয়তঃ প্রথমেই অ্যানাটমি রপ্ত করার দরকার নেই, কিন্তু জানতে হবে জীবনের ছন্দ। ফর্মের জ্ঞান বাড়বে পর্যবেক্ষণশক্তির সঙ্গে কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। তৃতীয়তঃ শিল্প নির্ভর করে তিনটে উপাদানের ওপর— ঐতিহ্য, প্রকৃতি, মৌলিকতা। ঐতিহ্য বাদ দিলে শিল্প থেকে যায় চিরন্তন শৈশবের রাজ্যে, প্রকৃতি বাদ দিলে শিল্প হারায় প্রাণের ছন্দ, আর মৌলিকতা বাদ দিলে হয় গতানুগতিক।

তাঁর শেষের দিকের ছবি— ‘বসন্তোৎসব’ (১৯৪৯) এর ফর্ম অতি সরল, রঙয়ের ব্যবহার বিরল, ড্রইং অসাধারণ। ‘নটীর পূজা’র নটীর মত সব আবরণ, সব আভরণ ফেলতে ফেলতে সে এক মহাজীবনের দিকে চলেছে। Learn the art and lay it aside. প্রকরণটা আর যান্ত্রিক বাধা হয়ে নেই। গুরু বলেছিলেন— “সকল বড় শিল্পীর মূলমন্ত্র হল অকৃত্রিমতা অথবা যান্ত্রিকতা লুকিয়ে চলা বলা সবই।” সেটা পেরেছিলেন তিনি। গুরুর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, “শাস্ত্র মতো গড়া প্রতিমা সবই সুন্দর হয়ে উঠল না। একদল শিল্পকার বলে উঠল তদরম্যং যত্র লগ্নংহ্যিস্যহৃৎ— মনে যেই ধরল মনোমতো সেই এই বলল। ...সেকালের শিল্পীদের পথ ধরে ক্রিয়া করে এখনো আমরা শিল্পবিস্তারের আশা করতে পারি, কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে সে ক্রিয়া হবার যো নেই।” বা “বিশ্বকর্মা যদি পূজার্থ দেবমূর্তি গড়েই চলতেন তবে এতদিনে বিশ্বে অনাসৃষ্টি বাধত। শিল্পের আধ্যাত্মিক তুলসীমঞ্চ সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেলত। গাছ দেখার আনন্দ এক তুলসী গাছের তলায় পিদিম ধরে শেষ হত।”[১৫] কারিগরি নয়, রসপরতন্ত্রতাই ছিল বেঙ্গল স্কুলের অম্বিষ্ট। আর্চার তা বুঝতে পারেননি। নূতন দিকটা না পেয়ে কেউ বলেছেন revival;

পুরোনো দিকটার পুনরাবৃত্তি না দেখে কেউ বলেছেন, 'শিল্পসাঙ্কর্য।'[১৬]

নতুনত্ব কোথায় খুলে বলি। অজন্তার ছবিতে বুদ্ধের আখ্যানই আঁকা হয়েছে। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, দু-চারটে গাছপালা ঐ আখ্যানকে ফোটাবার জন্যই। ভক্তিরসই তার প্রধান অবলম্বন। মুঘল চিত্র সেক্যুলার, সম্রাটকে কেন্দ্র করে আঁকা। তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর প্রতাপ, মাঝে মধ্যে তাঁর বিলাসী মনের সৌন্দর্য সন্ধান— কারিগরিকে বড় আসন দিল। রাজপুত, কাংড়া কলমে আবার কৃষ্ণ-রাধার আখ্যান— আবার শৃঙ্গার-ভক্তির সমাবেশ। প্রকৃতি রয়েছে, কিন্তু পটভূমিকার মত। আকাশের নীল, বনানীর স্নিগ্ধ সবুজ, পুষ্পাচ্ছাদিত কুঞ্জ প্রেমটাকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছে। পটে দেবদেবীদের নামানো হল ধরণীর ধুলোয়। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির শিল্পরূপ যেন। রসের কথা, ভাবের প্রকাশ উবে গেল। এই নবীন শিল্পীগোষ্ঠী সেই মজা নদীতে স্রোত আনলেন। তাঁদের দৃষ্টি ধর্মের বা সম্রাটের মহিমা প্রচারে আবদ্ধ রইল না। যে জগতে তাঁরা বাস করেন সে জগৎ, ধীরে ধীরে হলেও, নিজের স্থান করে নিল। অবনীন্দ্রনাথের বুদ্ধ অজন্তার বুদ্ধ নয়, যেমন নন্দলালের শিব নয় মধ্যযুগের সাহিত্য বা ভারতচন্দ্রের বা পোটোর শিব। এতদিনে অনাদৃত মেঠো ফুল ভাষা পেল, পায়রা লাল-কালোর ছোপ সেঁটে গলা ফুলোল, হবু মাকে দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই করতে দেখলাম, রাঙ্গামাটির রাস্তার পাশে অশ্বত্থগাছ, তার নীচে জলসত্র, খেজুররসে গুড় তৈরি করার ছবি : শীতের কুয়াশা ধোঁয়ায় ঘন, দূরে অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা খেজুর গাছ। বর্ষার আকাশে গুরু যদি ফোটালেন 'মেঘদূত' থেকে সিদ্ধ দম্পতির জলকণা ভয়ে পলায়নের ব্যস্ততা, তো শিষ্য ফোটালেন শান্তিনিকেতনের শ্রাবণের ঘনঘটা। আর্চারের মন্তব্যের পাশাপাশি স্টেলা ক্র্যামরিসের মন্তব্য রাখতে বলি।[১৭]

রবীন্দ্রনাথের ছবি এতই পাশ্চাত্যধর্মী (অধিকাংশই সুররিয়ালিস্ট বা একস্প্রেসনিস্ট) যে তা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা ঠিক হবে না। তাঁরই অনুরোধে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট ১৯২২ সালে Bauhaus-এর এক চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে।[১৮] সেই বোধহয় আজকালকার আধুনিক শিল্পীরা প্রথম দেখলেন আধুনিক পাশ্চাত্যশিল্পের নিদর্শন। তখন যে শৈলী খুব নতুন ছিল তাকে Fauvism ও Expressionism নাম দেওয়া হয়েছিল। আসলে ফ্রান্সে যার নাম Fauvism, জার্মেনিতে তাই expressionism. অধ্যাপক হ্যাফটম্যান বলছেন, "ফরাসীরা ফর্মের ওপর জোর দেয়, জার্মানরা বিষয়বস্তুর ওপর।" মাতিস বলতেন, "যে নিজের আবেগকে শৃঙ্খলায় আনতে পারে সেই সত্যিকার শিল্পী।" বাস্তব কি? মানুষ কি? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যুক্তি ত্যাগ করার দরকার নেই। অস্তিত্বের আনন্দ স্বীকার কর, আর মানব মনের মহৎ মুক্তি প্রকাশ কর। আকাশে, গাছে, ফুলে সেই অস্তিত্বের আনন্দ। Space তৈরি কর রঙ দিয়ে। অবিমিশ্র রঙ— হলুদ, নীল ও লাল। অন্যদিকে জার্মানরা প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও মানবিক আবেগের বিস্ফোরক প্রকাশের বৈপরীত্য দেখালেন। নিগ্রো ভাস্কর্য, প্রাক্-রোমক স্পেনের শিল্প, সেজান— পিকাসো ও ব্রাককে নিয়ে গেল কিউবিজমে। "The development led logically to abandonment of the analytical interpretation of natural object and to the synthetic construction of formal objects, which either had no equivalent in nature or else endowed natural representational forms with an unprecedented effectiveness and reality." ১৯২৩-২৪-এ আর একটা আন্দোলন দেখা দিল— Surrealism. প্রথম মহাযুদ্ধসঞ্জাত অনিশ্চয়তা ও বিপন্নবিস্ময় সাগাল ও চিরিকোকে যে প্রেরণা দিয়েছিল, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব তাকে নান্দনিক ভিত্তি দিল। ছবি জন্ম

নেয় না যুক্তি থেকে, তার জন্ম অবচেতনার গভীরে। সেটা অদ্ভুত, বিসদৃশ মনে হলেও বাস্তব। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে সুররিয়েলিজম্-এ এক্সপ্রেসনিজম্ দ্বারা প্রভাবিত হন।[৯৯] গগনেন্দ্রনাথ কিউবিজম দ্বারা।

অবশ্যই এগুলি আধুনিক কিন্তু আমার আলোচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক। বরং যামিনী রায়কে দিয়ে আলোচনা শেষ করি। ঐতিহ্য ও গ্রাম জীবনের দুই মেরুকে বেঁধেছিলেন নন্দলাল। তাকে আরও সহজ, সবল, উজ্জ্বল রূপ দিলেন যামিনী রায়— গ্রাম, কৃষক, সাঁওতাল জীবনে ফিরে গিয়ে। তবে জাতীয় স্তর থেকে আমরা আঞ্চলিক স্তরে নেমে এলাম, যেমন জাতীয়তার স্তর থেকে আন্তর্জাতিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হলেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য এ সব কথা কোনো গোঁড়ামির সুরে বলছি না। অনেক গভীরে, রবীন্দ্রনাথে রয়েছে, দেশীয় প্রেরণা ; যামিনী রায়ের আঞ্চলিক চেতনা আন্তর্জাতিক চেতনাকে স্পর্শ করেছে।

বাংলার গ্রাম শিল্প আবিষ্কার করেছিলেন অজিত ঘোষ ও গুরুসদয় দত্ত। হ্যাভেল এই ঐতিহ্যের কথা জানতেন কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল তা লুপ্ত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘোষ ও দত্ত দেখলেন প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পটুয়া উপনিবেশ —যাদের দিন গুজরান হয় মাটির থালা, বাটি, কলসী অলংকরণে বা দেবদেবীর পুতুল বানিয়ে। কেউ কেউ রেখেছিলেন বাপ-পিতামহের পট আঁকা ও দেখাবার ব্যবসায়। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় তাদের প্রতিষ্ঠা ছিল সর্বাধিক। হিন্দু অঞ্চলে দেখান হত রাম ও কৃষ্ণলীলা, সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলে সিংবোঙা, মারাংবুরু। পটে কোথাও নিখুঁত বর্ণনা বা পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্র-চিত্রণের চেষ্টা ছিল না। স্বাভাবিক চেহারা ইচ্ছামত বদল, এমনকি বিকৃত, করা হত। তবে রেখা বিন্যাস ছিল তীক্ষ্ণ, রঙ উজ্জ্বল। গ্রামীণ জীবনের দুর্জয়, সহনশীল প্রাণবন্ত রূপ তাতে ফুটত।

কালীঘাটকে কেন্দ্র করে কলকাতার উপকণ্ঠে আর এক ধরনের পটশিল্প গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতক থেকে (কেউ বা বলেন ১৮০৯ সালে কালীঘাটের নতুন মন্দির তৈরির সঙ্গে)! আর্চারের মতে তার পেছনে ছিল 'Anglo-Indian source'। একথা মানা যায় না। অল্প দামে পট বেচতে হত, তাই খরচ কমাতে পটুয়ারা ব্যবহার করল কাপড়ের চেয়ে ঢের সস্তা মিলের কাগজ, টেম্পেরার জায়গা জলরঙ। কিন্তু তার রেখার অসামান্য জোর দেখে অজিত ঘোষ বিস্মিত হয়ে লিখেছেন, "by one sweep of brush in which not the faintest suspicion of momentary indecision, not the slightest tremor can be detected."[১০০] অবশ্যই দেবদেবীর প্রতিমার ওপর ঝোঁক পড়েছিল, কিন্তু ইহলৌকিক জীবনপ্রবাহের ছবি তা প্রায় চলচ্চিত্রের মত ধরে রেখেছে। বাবু-বিবিদের কীর্তিকাহিনী—গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী-মোহন্ত সিরিজ বা naturalist চিংড়ি মাছ ভক্ষণরত বেড়াল, জোড়ামাছ, মেছুনি— আশ্চর্য বাস্তবতা বহন করে।[১০১]

কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এর অবনতি ঘটে।[১০২] অবনীন্দ্রনাথ যখন উত্তর ভারতের বিভিন্ন শৈলী নিলেন, আহত বাঙালীর অভিমান পট শিল্পকে আঁকড়ে ধরল। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে (চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর) বাঙালী রাজনীতিও উত্তর ভারত থেকে অভিমানে মুখ ফিরিয়েছিল।

যাই হোক, গুরুসদয় দত্ত ঘোষণা করলেন (এবং আর্চার মেনে নিলেন), এর সঙ্গে post-impressionist ইওরোপীয় শিল্পের মিল রয়েছে— অর্থাৎ এও সব অপ্রয়োজনীয় বাদ দিয়ে শুধু মূল (fundamentals)কে নিয়ে থাকতে চায়। যামিনী রায় ইওরোপীয়

শৈলী ও নব্যবঙ্গ শৈলী ছেড়ে কালীঘাট পট আশ্রয় করলেন ১৯২৫ সালে। ইলাহাবাদ ম্যুনিসিপ্যাল ম্যুজিয়ামে রক্ষিত 'সাঁওতাল যুবতী' তারই নিদর্শন। মেদবহুল অথচ শক্তপোক্ত সাঁওতাল রমণীর ফর্মে শুধু মোটা রেখার বলিষ্ঠ টানে কি জীবনোল্লাসই ফুটেছে। কিন্তু কালীঘাটের সারল্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল যামিনী রায়ের সূক্ষ্মতা। আর্চারের মতে, পিকাসো যেমন নিগ্রো শিল্পকে কাজে লাগিয়েছিলেন, এও তেমনি। সাঁওতালদের তিনি বিশেষভাবে বিষয়বস্তু করলেন কেন? আদিম জীবনের মধ্যে তিনি কি মুমূর্ষু নগর-জীবনের প্রতিষেধক পেয়েছিলেন?

যামিনী রায়ের মুখে শুনেছি— তিনি রুদ্ধ, ক্ষুদ্র, মানবমনের নৈতিক দিক সম্বন্ধে অচেতন, দয়া, মায়া, সততা বর্জিত কলকাতার জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়েই বাঁকুড়া ফিরে যান। সাঁওতালদের সহজাত মহত্ত্ব ও গর্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

কিন্তু কালীঘাট পটের সঙ্গে বাঁকুড়া অঞ্চলের পটের তফাৎ আছে। বাঁকুড়া শিল্প অনেক বেশী কৌণিক, জ্যামিতিক, তাতে নরম বাঁকের ওপর রুক্ষ, সোজা রেখার প্রাধান্য। যামিনী রায় ইওরোপীয় রঙ, চীনে কালি ছাড়লেন ; স্থানীয় খনিজ বা উদ্ভিজ রঙ বেছে নিলেন। আর্চার বলছেন, এর পেছনে ত্রিশের দশকের প্রতিবাদী রাজনীতি কাজ করেছে। নৃত্যবাদ্যগীত-রত সাঁওতাল দলের যে ছবি তিনি ১৯৩৪ সালে আঁকলেন তার জোর উর্ধ্বমুখী ও ঋজু রেখার ওপর। ঐ সালে আঁকা সাঁওতালদম্পতির কি দৃপ্ত দাঁড়ানোর ভঙ্গি। উরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যেন সংহত প্রতিবাদ : আর্চারের ভাষায় "brusque defiance." তাঁর খৃষ্টও যেন বিদেশী, বিজাতীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সাঁওতাল।[১০৩] এতটা যেতে আমি রাজী নই। উন্নত উদ্ধত শাল গাছ সাঁওতালদের প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার সঙ্গে মিল রেখে সাঁওতালদের আঁকা হয়েছে ভাবতে ক্ষতি কি? উপরন্তু এর সঙ্গে মিল রয়েছে পৌরাণিক বীরের বর্ণনার—শালপ্রাংশু মহাভুজঃ। যামিনী রায়েরই আঁকা 'রাম-লক্ষ্মণ-সীতা'র ছবিতে দণ্ডায়মান লক্ষ্মণের সঙ্গে অনার্য সাঁওতালের মিল স্পষ্ট।

তাঁর কিছু ছবির আদল পাওয়া যাবে বাঁকুড়ার মন্দিরের পোড়ামাটির ফলক ভাস্কর্যে। কৃষ্ণ মাঝখানে, দু পাশে দুই গোরু— প্যানেলটির কথা ভাবুন। কৃষ্ণের আকর্ণবিশ্রান্ত চোখে মণি নেই, গোরু দুটির মণি জ্বলজ্বল করছে। দেবতা ঐতিহ্যসম্মিত ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়ে। কিন্তু গোরুগুলির দাঁড়ানো কি দৃপ্ত, কি জীবন্ত। বাঁশী শুনে যে তাদেরও চিত্ত উতলা হয়েছে বুঝতে কষ্ট হয় না। অন্য জীবজন্তুর ছবির সঙ্গে পিকাসোর আঁকা ছবির মিল খুঁজবো কেন— যেখানে কালীঘাটের পটে তার নিদর্শন মিলছে? তাঁর খৃষ্ট সিরিজের কিছু ছবি— Head of Christ (1938), ও Christ with the Cross (1946) অবশ্যই লক্ষণীয়। খৃষ্টের চোখে বেদনার সঙ্গে বিদ্রোহের প্রতিফলন দেখেছেন আর্চার। দাঁড়াবার ভঙ্গি— সাঁওতালদের মত বটে, আবার বাইজানটাইন রীতিরও বটে। 'বধূ বরণ' ও 'শিশু ক্রোড়ে নিরাভরণ দরিদ্র জননী'— কি অসামান্য contrast. একটিতে নীল বেগুনী রঙের প্রাচুর্য— সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অন্যটির ময়লা সাদা রঙের শাড়ি, একটুখানি মেটেলাল পাড়, কিন্তু তারই আড়ালে কি অসীম স্নেহে ক্ষুদ্রশিশুটিকে তিনি আশ্রয় দিচ্ছেন বিশ্বের সব আপদ-বিপদ থেকে। ভার্জিন মেরীর দৈবী মহিমাকে ছাপিয়ে গেছে গরীব বাঙালী মা'র মানুষী মহিমা। যামিনী রায়ের বৈষ্ণব সুলভ ভক্তি আর্চারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। শুধু খৃষ্ট ও সন্তদের দিকে তাকালে চলবে না, দেখতে হবে 'চৈতন্য ও কীর্তনীয়ার দল'কেও।

এই দীর্ঘ আলোচনায় আমি বলতে চেয়েছি যে ইতালীর র্যানেশাঁস মডেলে বাংলার

সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টিকে বা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকে না দেখে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার প্রসঙ্গে দেখা উচিত। একে বলা যেতে পারে ঐতিহ্য-সম্মিত আধুনিকীকরণ— traditional modernization. এর মধ্যে প্রবহমানতাও পরিবর্তনের টানাপোড়েন ও তজ্জনিত tension প্রকট। বৈদেশিক শাসন ও ঔপনিবেশিক শোষণের উপস্থিতিতে আমরা ঐতিহ্য আশ্রয় করেছিলাম self-identity রক্ষা করবার তাগিদে। আবার কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে আধুনিকতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছি যুগের চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করতে না পেরে। সুপ্রাচীন (এবং মন্দীভূত) এক সভ্যতা ও নবীন (এবং প্রাণবন্ত) আর এক সভ্যতার মুখোমুখি সংঘর্ষে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। টয়নবি Study of History-তে তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। সভ্যতা দুটি আবার স্বাধীনভাবে ভাব বিনিময় করছে না —যেমন করেছিল ভারত ও মধ্য এশিয়া বা চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে জাপান। অষ্টাদশ শতকের ভারত এক বিজিত দেশ এবং ব্রিটিশ শাসন-শোষণ সেখানে এনেছিল বিজয়ীর অর্থনীতি, শাসনপ্রণালী, সংস্কৃতি। আমরা সমগ্র পশ্চিমী সংস্কৃতির মুখোমুখি হইনি, তার মধ্যে একটা বিশেষ অঞ্চলের ঐতিহ্যপরিশ্রুত পশ্চিমী সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। কয়েকটা উদাহরণ দিলে যথেষ্ট হবে। আমরা ভিক্টোরিয় সাহিত্য এবং তার মাধ্যমে ক্লাসিক্যাল গ্রিক-রোমক-র‍্যনেশাঁস সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, ফরাসী সিম্বলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নয়। তেমনি আমাদের শিল্পীরা ইম্প্রেশনিজম্ থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমী শিল্প আন্দোলনের পরিচয় পাননি। ইওরোপ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ছিল একটা cultural lag, আবার ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে আরেকটা। নানা কারণেই আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া বিভ্রান্ত, মাঝে মাঝে বিকৃত, কখনও বা স্বতন্ত্র সফল সৃষ্টির জন্মদাতা। আমরা পশ্চিম থেকে সব জিনিস নিতে পারিনি, আবার যে সব নির্বাচিত ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছিলাম সেখানেও সাহিত্যিক বা শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বভাব, রুচি, শিক্ষা, বিশ্ববীক্ষা কাজ করেছে। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাই কিছু না কিছু নিয়েছেন কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য রয়েছে। এঁরা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত। অনেক ভালো জিনিস নিতে চাইলেও আমরা নিতে পারতাম না— যেমন অবাধ বাণিজ্যের বদলে দেশজ শিল্প সংরক্ষণ, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল, শিল্প বিপ্লব, সত্যকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। পশ্চিমী শিক্ষাবিস্তার আমাদের ব্যর্থতাবোধকে প্রকট করছিল। সেই ব্যর্থতাবোধ ভুলতে বা ঢাকতে আমরা আর্য শ্রেয়োমন্যতায় আশ্রয় খুঁজেছিলাম। পশ্চিমী আগ্রাসী ক্রিয়ার পরিণাম প্রাচ্য আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথরা ব্যতিক্রম। তাঁরা উভয়ের সবলতা, দুর্বলতা বুঝে একটা সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক পরিবেশ তা সবটা হতে দেয়নি।

১৪

এখানেই উঠবে বিজ্ঞানের প্রশ্নটা। পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণভ্রমর রয়েছে বিজ্ঞানের কৌটোয়, একথা বুঝতে রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ— কারুর অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সপ্তদশ শতকে পশ্চিমে যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং শিল্প বিপ্লব যার ফলিত রূপ, সেটা একান্তই পশ্চিমের ব্যাপার। আমরা স্বাধীন দেশ হলে চিন্তা আদানপ্রদানের স্বাভাবিক পথে তা একদিন ভারতে আসত। কিন্তু পরাধীন ছিলাম বলে বিজ্ঞান শিক্ষার

জন্য আমরা একান্ত পরনির্ভর ছিলাম। হিন্দু কলেজে বিজ্ঞান পড়ানোর হাস্যকর চেষ্টাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না। বিজ্ঞানের শিক্ষক রস সোডা ছাড়া কিছু জানতেন না। তাই তাঁর নাম 'সোডা সাহেব'। ১৮২৪ সালে রামমোহন লর্ড অ্যামহার্স্টকে যে চিঠি লেখেন, তাতে বিজ্ঞান পঠনপাঠনের পক্ষে জোর ওকালতি করা হয়েছিল। 'সংবাদকৌমুদী'র জন্য সহজবোধ্য ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখে যা নিজে করা সম্ভব তিনি করেছিলেন। আর একটু এগিয়ে গেলেন অক্ষয়কুমার দত্ত— 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বেরুত তাঁর বেশ ভারী প্রবন্ধ। হিন্দু কলেজে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপক নিযুক্ত হল ১৮৪৩-৪৪-এ। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান চর্চায় রামমোহনের মতই আগ্রহী ছিলেন— প্রমাণ, 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁর ছোট ছোট প্রবন্ধ। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার তাগিদে ব্রিটিশ আধিপত্য সাময়িকভাবে মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন —'আনন্দমঠ'-এ এই কথাই সত্যানন্দের গুরু বলেছিলেন। কিন্তু শাসকদের কোন আগ্রহ দেখি না। চিকিৎসা বিজ্ঞান-এর মাধ্যমে অ্যানাটমি এল, শবব্যবচ্ছেদ হল, মধুসূদন গুপ্ত, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীরা তা শিখে নিলেন। আর একজন বিখ্যাত ডাক্তার— মহেন্দ্রলাল সরকার—এরকম ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন— Indian Association for Cultivation of Science. তাঁর আদর্শ ছিল রয়্যাল ইনস্টিট্যুশান ও ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হল আরেক গবেষণা কেন্দ্র। সেখানে ফাদার লাফোঁর কাছে জগদীশচন্দ্র বসু আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ নিলেন। এমনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পেডলারের কাছে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতেখড়ি। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র পাড়ি দিলেন বিজ্ঞানের সূতিকাগৃহে— কেমব্রিজ, লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ, এডিনবারায়। ১৮৭৫ সালে প্রেসিডেন্সীতে রসায়নের পরীক্ষাগার খুলে পেডলার এক নতুন জগতের দ্বারই খুলে দিলেন।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, (স্যার) আশুতোষরা মাঝে মাঝে নিজ বিষয়ে বক্তৃতা দিলেও (স্যার) সি· ভি· রামন কলকাতা আসা (১৯০৭)-র আগে তা প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্ন সফল করতে পারেনি। ১৯০২-তে, পঁচিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী দিবসে, মহেন্দ্রলাল দুঃখ করে বলেছিলেন, "একটা জীবন নষ্ট করলাম।" ততদিনে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার লেগেছে। এসেছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এর উদ্দেশ্য ছিল কারিগরী শিক্ষাবিস্তার, যার ফলে ভারত স্বনির্ভর হতে পারে। রাজনৈতিক কারণে এর কর্ম প্রচেষ্টা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, কিন্তু থেকে যায় এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৮৮০-র মাঝামাঝি বিজ্ঞান পঠন-পাঠন ও গবেষণাকেন্দ্র সরে গেল প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র এলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে, ১৮৮৯-তে প্রফুল্লচন্দ্র— রসায়নের। শতকের শেষে সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ প্রাণীবিদ্যার ভার নিলেন।

জগদীশচন্দ্রের সমকালীন পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা ও গবেষণার সাধারণ ঝোঁক সম্বন্ধে কিছু বললে তাঁর অবদান স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ সম্বন্ধে আইনস্টাইনের কয়েকটি সহজবোধ্য রচনা ও আইনস্টাইনের শেষতম জীবনী অনেক আলোকপাত করবে।[১০৪] আইনস্টাইন জানাচ্ছেন, তিনি যখন ছাত্র, তখন ম্যাক্সওয়েল, মিকেলসন-মর্লে ও হার্জের গবেষণা নিয়ে কোন পাঠ দেওয়া হত না। হেলমহোৎসের পর যেন কোন গবেষণাই হয়নি। অথচ নিউটন ও লাপ্লাসের বিজ্ঞানের ভিত্তি (দেশ, কাল, বস্তুবিন্দু ও শক্তি) তখনই নড়ে গিয়েছে। নিউটনের ধারণা ছিল একান্ত যান্ত্রিক, আলোও কিছু বস্তুবিন্দুর সমাহার (material points). আইনস্টাইনের ভাষায়, "All happenings were to be

interpreted purely mechanically—that is to say, simply as motions of material points according to Newton's law of motion." নিউটনের ধারণায় দুটি পদার্থ (আপেল ও পৃথিবী) পরস্পরের ওপর কাজ করে দূর থেকে শূন্য (space)-এর ভেতর দিয়ে। ফ্যারাডে আমাদের দৃষ্টি ফেরালেন দুই বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক শক্তির মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের দিকে। ১৮৬০-এর দশকে ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ নিয়ে যে সব গবেষণা করেছিলেন, তারই মধ্যে একটা বিপদের ইঙ্গিত ছিল। যে সব তরঙ্গ (এবং আলো) পরিবাহিত হচ্ছে এক জেলি সদৃশ (অদৃশ্য) ইথারের ভেতর দিয়ে—সে ইথারের স্বরূপ কি ? মহাকাশে বিদ্যুৎ-শক্তি ক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্তন, তারই ফলে চুম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি, ও এই দুই মিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন। মিকেলসন-মর্লে (১৮৮৭) ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে এক নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা মানলে (১) হয় ইথারের ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে, (২) না হয় বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলোকের তত্ত্ব বর্জন করতে হবে, (৩) না হয় বুঝতে হবে— বিশ্ব অচল। তা ছাড়া বুধের পরিক্রমা পথে সূর্যের নিকটতম বিন্দুর গতি অল্প হলেও একটু করে বাড়ছিল। নিউটনের গতিতত্ত্বে তার কি উত্তর মিলবে ? লোরেঞ্জ আবার পদার্থের নূতন এক তত্ত্বে দেখালেন, যেহেতু ইথারের কোন গতি নেই, দেশ-এর পাশাপাশি এক বিশেষ পদার্থ বলে তাকে ভাবার দরকারও নেই। তা ছাড়া অণুরা ডল্টনের (Dalton)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ঘন বিলিয়ার্ড বল নয়, তার মধ্যে বিদ্যুৎ-তাড়িত কণাও রয়েছে। লোরেঞ্জের পর জে জে· টমসন দেখালেন, এ সব কণা বা electron-এর শুধু অস্তিত্বই নেই, ভরও আছে, বৈদ্যুতিক চার্জও আছে এবং তা মাপা যায়। বেকেরেল দেখালেন, ইউরেনিয়াম বিকিরণও পদার্থের প্রবাহ ছাড়ছে। যাই হোক, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রতত্ত্ব নিউটনের শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতে নানা ভাঙচুর ঘটাল। জার্মান বৈজ্ঞানিক মাখ (Mach) স্পষ্টই বললেন, নিউটনের বিশুদ্ধ পরম দেশ ও কালের ধারণা ভ্রান্ত। এর পর আইনস্টাইনের নিজের পালা। "Then came the special theory of relativity with its recognition of the physical equivalence of all inertial systems. The inseparability of time and space emerged in connection with electrodynamics or the law of the propagation of light, With the discovery of the relativity of simultaneity, space and time were merged in a single continuum..."-এর থেকে বোঝা গেল ভর কোন পরিবর্তনহীন রাশি নয়, তা তেজের পরিমাণের ওপর নির্ভর, এমনকি তুল্য। গতি সম্বন্ধে নিউটনের বিধান কেবল অল্প পরিমাণ বেগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শূন্যে আলোর গতির চেয়ে বড় গতি আর নেই।

ক্ষেত্রতত্ত্বের শেষ সোপান— আইনস্টাইনের general theory of relativity. "Inertia, gravitation, and metrical behaviour of bodies and clocks were reduced to a single field quality; this field itself was again postulated as dependent on bodies...space and time were thereby divested not of their reality but of their causal absoluteness. The generalized law of inertia takes over the function of Newton's law of motion."

এ ত' গেল এক দিকের প্রবণতা। হার্জ দেখালেন, তাঁর উৎক্ষেপণ ও গ্রহণ যন্ত্রের মধ্যে এক খণ্ড কাচ রাখলে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের অতিবেগুনী রশ্মি গ্রহণযন্ত্রের বৈদ্যুতিক বিকিরণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর নাম দেওয়া হল photo-electric effect. কিন্তু এর কারণ

নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। যদি আলোকরশ্মি পড়ার জন্যই গ্রহণযন্ত্রের ধাতু ইলেকট্রন ছাড়ে, তাহলে আলোর পরিমাণ বাড়ালে ইকেট্রন বিকিরণের গতিও বাড়বে। কিন্তু তা হচ্ছে না। বেশি ইলেকট্রন তৈরি হবে কিন্তু বিকিরণের গতি থাকবে সমান। যদি আলোর রঙ (অর্থাৎ freqnency) বদলে দেওয়া যায়, তখনই বিকিরণের গতি বাড়বে বা কমবে। ১৮৮৬-৮৮ সালে হার্জ বৈদ্যুতিক মোক্ষণ (discharge) থেকে এমন তরঙ্গ তৈরি করলেন যা আলোর গতিতে যায় এবং আলোক তরঙ্গের সব গুণাবলী তার আছে। কিন্তু তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য মেপে দেখা গেল আলোক তরঙ্গের চেয়ে তারা দীর্ঘতর। এই দীর্ঘ তরঙ্গই পরে তার ও দূরভাষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, আর অধুনা অতি দূর space থেকে বিকিরণ ধরছে।

১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাংক (Planck) যোগ করলেন— তেজ (energy) অবিচ্ছিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয় না, কোষবদ্ধ হয়ে পৃথক পৃথক বিস্ফোরণ (quanta)-র মত বের হয়। এ সব কোয়ান্টার মাপের সঙ্গে তৎসংযুক্ত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের frequency-র প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বেগুনি রশ্মির ফ্রিকোয়েন্সি লাল রশ্মির দ্বিগুণ, অতএব তার সঙ্গে যুক্ত কোয়ান্টা লাল রশ্মির সঙ্গে যুক্ত কোয়ান্টার দ্বিগুণ মাপের। তখনও প্ল্যাংক আলোর তরঙ্গথিয়োরীর প্রতিবাদ করেননি। আইনস্টাইন প্ল্যাংকের তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখালেন, আলোক একই সঙ্গে তরঙ্গ ও পদার্থকণার লক্ষণ বহন করে। অনেক পরে নিলস্ বোর (Bohr) কোয়ান্টামতত্ত্ব দ্বারা অণুর গঠন বিশ্লেষণ করেন।

যাই হোক, জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সীতে হার্জের তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে স্ফটিক কর্তৃক বৈদ্যুতিক রশ্মির polarization আবিষ্কার করছেন, তখন পশ্চিমে প্ল্যাংক ও আইনস্টাইনের আবিষ্কার ভবিষ্যতের গর্ভে। বসুর কাজ ছিল ৫ মিমিঃ থেকে ১ সেমিঃ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নিয়ে— অর্থাৎ মাইক্রো-ওয়েভ নিয়ে। আধা-পরিবাহী (semi-conductor) পদার্থের গ্রহণ শক্তি এবং ফোটো-কনডাকটিভিটি নিয়েও পরীক্ষা চলছিল তাঁর। ১৮৯৫ সালে টাউনহলের পুরা দেওয়াল ভেদ করে মাইক্রো-ওয়েভের বেতার সম্প্রচার দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করেছিল। ১৮৯৬ সালের শেষে রয়্যাল ইনস্টিট্যুশনে লর্ড কেলভিনের সামনে ঐ ব্যাপার আবার দেখিয়ে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন তিনি। দীর্ঘতর তরঙ্গে বেতার সংকেত পাঠিয়ে ইতালীর মার্কনি যে কৃতিত্ব দেখান তা ঠিক এক বছর পরে। কিন্তু মার্কনির টেকনলজিই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গৃহীত হয়। বসু তাঁর যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছিলেন, কাজে লাগাননি। তাঁকে দেখা যায় অজৈব ও উদ্ভিদ জগতের ওপর বিকিরণের পরীক্ষা করতে। ততদিনে প্ল্যাংক ও আইনস্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানে বিপ্লব করে ফেলেছেন।

কেন তিনি সে পথে গেলেন না ? জড়ের মধ্যেও প্রাণের লীলা ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় নতুন কোন কথা নয়। কিন্তু জগদীশচন্দ্র সেই অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করলেন কেন ? বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবে ? রবীন্দ্রনাথের কবি সুলভ উৎসাহে ? মার্কনির কাছে হেরে গিয়ে ? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। হয়তো ঔপনিবেশিক ভারতীয় বিজ্ঞানীর অসহায়তা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার অভাব ও দায়ী। চাকুরির প্রথম তিন বছর মাইনে নেননি তিনি— সাহেব অধ্যাপকদের চেয়ে বেতনক্রম কম ধার্য করা হয়েছিল বলে। ভারতীয় বলে অধ্যক্ষ হবার দাবীও নাকচ হয়। কিন্তু শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষীর অভিমানই কি আচার্যকে পশ্চিমের দ্রুত ধাবমান পদার্থবিদ্যার স্রোত থেকে সরিয়ে রেখেছিল ? রম্যাঁ রঁলার ভাষায়, "তিনি হচ্ছেন, মনোজীবন, উদ্ভিদ ও অজৈব পদার্থের সংবেদনশীলতার : মনের নতুন

মহাদেশের ক্রিস্টোফার কলম্বাস" (দিনপঞ্জী : ৯ জুলাই ১৯২৭)। কথাটার মধ্যে একটা বড়ো সত্য রয়েছে। শুধু পদার্থবিৎ হয়েই থাকতে চাননি তিনি। পদার্থবিদ্যা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন অভিনব ক্ষেত্রে এবং তার জন্য যে অসংখ্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, কলকাতায় বসে, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। লজ্জাবতীও লজ্জা ভেঙে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে উঠেছিল। এখানে ভারতীয়, আধাধর্মীয়, intuition-ও কাজ করেছিল। তাঁর শেষ আবিষ্কারগুলো উদ্ভিদের ওপর ও মানুষরে ওপর ভেষজ পদার্থের সমান্তরাল ফলাফল সম্পর্কিত। তাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অজ্ঞাত এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। যাকে আজ আমরা bio-physics, bio-chemistry বলি, জগদীশচন্দ্র তারই পথিকৃৎ। বিবেকানন্দকে যাঁরা রিভাইভ্যালিস্ট বলেন, তাদের জেনে রাখা ভাল, জগদীশচন্দ্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন যে বিজ্ঞানেই যেন তিনি জাতীয়তাবাদ দেখান। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কোনো আবিষ্কারের পেটেন্ট রাখা হত না। যা ভালো তা যে সকলের।

আচার্য রায়ের কথা একটু আলাদা। এডিনবারা থেকে তিনি আহরণ করেছিলেন আধুনিক রসায়নের রহস্য, পেয়েছিলেন পেডলারের গড়া পরীক্ষাগার। মার্ক্যুরাস নাইট্রেটের কেলাস অধঃক্ষেপণ করে তিনি কৃতিত্ব দেখালেন এবং মার্কারিসংট ও নানা ধরনের নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণা চালালেন। ১৯১২ সকালে Empire Universities Congress-এ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের বাষ্পীয় ঘনত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্র উচ্চ প্রশংসিত হয়। যাকে আমরা ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বলি— তিনি তার গোড়াপত্তন করেন।

১৯১৬ সালে পালিত অধ্যাপক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন তিনি। ইতিমধ্যে গবেষক/শিক্ষক ছাড়া তাঁর আর এক রূপ দেখলাম—শিল্প সংগঠক। বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল এনামেল, বেঙ্গল পটারী— সব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবক ও প্রেরণাদাতা ছিলেন আচার্য। লিখলেন History of Hindu Chemistry, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের The Positive Sciences of the Hindus-এর সঙ্গে আজও যা হিন্দু যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাস ধরে রেখেছে। তৈরি করলেন অসামান্য প্রতিভাবান শিষ্যবৃন্দ—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, যাঁরা জৈব, অজৈব, কৃষি রসায়নে উৎকর্ষ দেখালেন। হয়ত আরও অনেক কাজ করতেন তিনি, কিন্তু আচার্যের মানবতাবাদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য কি শুধু গবেষণা ? এটা একটা মৌল প্রশ্ন। সমাজের কাছে, মানুষের কাছে সে কতখানি দায়বদ্ধ ? বন্যা ও দুর্ভিক্ষত্রাণে আর্তের পাশে দাঁড়ালেন আচার্য, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন বিবেকানন্দের গুরুভাইয়েরা, শিষ্যেরা : নিবেদিতা ও সদানন্দ। দুঃখের বিষয়, এই করতে গিয়ে তদানীন্তন কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। অনেকের মতে ফলিত রসায়নচর্চার পক্ষে এটা বিরাট অপচয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের গজদন্তগম্বুজে আশ্রয় নিলে কি বেশি ভালো হত ? এ প্রশ্নের উত্তর জানি না।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ঘুম ভাঙল সি· ভি· রামনের কলকাতা আগমনে (১৯০৭)। ১৯১৭-তে পালিত অধ্যাপকপদ নেবার আগে এটাই ছিল তাঁর কর্মস্থল। ভূমধ্যসাগরের নীল রঙ দেখে তিনি আবিষ্কার করলেন জলের পরমাণু কিভাবে সূর্যের আলোকে বিক্ষিপ্ত করছে। এর পর অন্যান্য তরল পদার্থের ওপর গবেষণা চলল এবং পূর্ণতা পেল 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কারে। পরমাণুর গঠনের ওপর এই নতুন আলোকপাত পশ্চিমে সাড়া জাগাল এবং তাঁকে এনে দিল নোবেল বিজয়ীর মুকুট।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়ক

প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করে ভারতীয় বিজ্ঞানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। ১৯২৪ সালে ঢাকা থেকে তরুণ সত্যেন এক গবেষণাপত্র লিখলেন Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta, যাতে বিকিরণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল— ফোটন দিয়ে গঠিত এক ধরনের গ্যাস। আইনস্টাইন তা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে Zeitschrift fur Physik-এ প্রকাশ করলেন। প্রমাণস্বরূপ বসু যে সংখ্যাতত্ত্ব দাখিল করেছিলেন, আইনস্টাইন দেখালেন—তা সাধারণ অণু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দ্য ব্রগলি (Broglie) প্রস্তাব করেছিলেন— পদার্থের কণা একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণার লক্ষণ বিশিষ্ট। আইনস্টাইন বিকিরণ সম্বন্ধে আগেই অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। বসু-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব তা প্রমাণ করল।

কিন্তু দ্য ব্রগলি, তাঁর ওপর আইনস্টাইনের মন্তব্য, শ্রোডিঞ্জারের গবেষণা— কতটা অনুসরণ করলেন বসু? এ নিয়ে আইনস্টাইন আক্ষেপ করেছেন। শ্রোডিঞ্জার wave mechanics প্রতিষ্ঠা করলেন। নিলস্ বোর দেখালেন— তরঙ্গ ও কণার সহাবস্থান শুধু সম্ভব নয়, সত্য। একে তিনি বললেন— "poetry of complementarity". কেন বসু এই কর্মযজ্ঞের সরিক হলেন না?[১০৫]

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সহপাঠী মেঘনাদ সাহার প্রাথমিক গবেষণা নক্ষত্রের বর্ণালী নিয়ে, তাপ আয়ননতত্ত্ব নিয়ে। তিনি ও বসু মূল জার্মান থেকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণা অনুবাদ করে তদানীন্তন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মহলকে পশ্চিমের প্রাগ্রসর গবেষণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে সাহা 'নব্য ভারত' পত্রিকায় ১৯২২ সালে 'আইনস্টাইন ও বর' শীর্ষক এক সাধারণবোধ্য প্রবন্ধও লিখেছিলেন। বোর প্ল্যাংক ও আইনস্টাইনের মতের সঙ্গে নিজস্ব আবিষ্কার মিশিয়ে দেখালেন— প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলির আপেক্ষিক অবস্থার বিপর্যয় থেকে আলোক উৎপন্ন হয়। পরমাণুর বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে তাঁর নিয়মাবলী পদার্থবিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ইলাহাবাদের প্রধান অধ্যাপক থাকাকালে বার বার সাহা বিদেশের বৈজ্ঞানিক ও ল্যাবরেটরির সম্পর্কে এসেছেন। বোধহয় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য— কোপেনহেগেনে বোরের ও সানফ্রানসিস্কোতে অধ্যাপক লরেন্সের সাইক্লোট্রোন ল্যাবরেটরি। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অসাধারণ সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করে, জার্মান অটো হানের পরমাণু বিস্ফোরণ উদ্ভাবনা (nuclear fission) ইত্যাদি দেখে, Science and Culture-এ তিনি এক প্রবন্ধ লেখেন, যাতে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে এ দেশকে সচেতন করা হয়েছিল। তাঁর অক্ষয় কীর্তি কলকাতার ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (১৯৪৮)।[১০৬] কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও দেশপ্রেমের দাবী বড় হতে থাকে। ভারতের নদী সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন, যার পরিণাম দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের বন্যা প্রতিরোধ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের মত বহুমুখী কাজ। আচার্য রায়ের যোগ্য উত্তরসাধকের কাছে বিজ্ঞানচর্চা ও দেশসেবা একাত্ম হয়ে উঠেছিল।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সাহা ও বোসের চেয়ে অল্প বড়। কেমব্রিজ থেকে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগ দেন কিন্তু তাঁর আসল চারণক্ষেত্র হল সংখ্যাতত্ত্ব। রাজচন্দ্র বসু, সমরেন্দ্রনাথ রায় এবং সি· আর· রাও প্রভৃতির সাহায্যে তিনি কত ছোট বীক্ষণাগার থেকে বিরাট ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিটিক্যাল ইনস্টিট্যুট গড়ে তুললেন, তা স্বচক্ষে দেখেছি। অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর ইনস্টিট্যুটে বহু মৌলিক ও ফলিত গবেষণা হয়েছে।[১০৭]

কিছু বয়সে বড় শিশির কুমার মিত্র বেতার বিজ্ঞান ও আয়নো-স্ফিয়ার বিজ্ঞানে

পথিকৃৎ। আজ ইলেকট্রনিক শিল্পরূপে যা পরিচিত তার ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। অ্যাপলটন সাহেব আয়নোস্ফিয়ারে নানা স্তর লক্ষ্য করেছিলেন। তার অন্যতম D-স্তর মিত্রের আবিষ্কার।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, নীলরতন ধর-রা যেমন আচার্য রায়ের ঐতিহ্য ব্যাপকতর করেছেন তেমনি দেবেন্দ্রমোহন বসু জগদীশচন্দ্রের। কলকাতায় উইলসন ক্লাউড চেম্বার স্থাপন ও নিউক্লিয়ার এমালসন টেকনিক নিয়ে পরীক্ষা তাঁর অন্যতম কীর্তি। তেমনি স্মরণীয় গিরীন্দ্রশেখর বসুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ গবেষণা— ফ্রয়েড, ইয়ুং, অ্যাডলার প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদের ওপর সহজ ভাষায় লিখে তিনি গণবিজ্ঞান প্রচারের যে ব্যবস্থা নেন তা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাতে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তা এই বিজ্ঞানাচার্যের দেশপ্রেমেরই প্রতিফলন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ স্থাপন কোন ইনস্টিট্যুট গঠনের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যে সব বিজ্ঞানীদের নাম করলাম তাঁরা সব সময় সমকালীন পশ্চিমী বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেননি। এক পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ছিল নগণ্য— প্রান্তিক বা Marginal। সব বাধা অতিক্রম করে নিজস্ব গবেষণা, শিষ্য পরম্পরা তৈরি, ইনস্টিট্যুট গঠন, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের কথা স্মরণ করলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। ইতালীর র‍্যানেশাঁসে বিজ্ঞানের স্থান ছিল না বললেই চলে। দা ভিঞ্চির মত দু-একজন মাথা ঘামাতেন। কিন্তু বুর্জোয়া-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, সর্বশক্তিমান জাতীয় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়, অসামান্য সাধন করল ইওরোপ। আমরা অবশ্যই পিছিয়ে পড়লাম। তবু যে খানিকটা এগিয়েছি তার জন্য ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বৈজ্ঞানিকদের নমস্কার।

টীকা

ইতালীর র‍্যনেশাঁস

১· বুর্খহার্টের Civilization of the Renaissance in Italy (Phaidon, 1945) মূল পাঠ্য। এ ছাড়া Wallace Fergusson, The Renaissance in Historical Thought (Boston, 1948), Six Essays: The Renaissance (Camb., 1961) ও Facets of Renaissance (Harper, 1962, 1963) Denys Hay, The Italian Renaissance ও Christopher Hibbert, The Rise and Fall of the House of Medici (Penguin, 1974) বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১ Giorgio Vasari, Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects (Everyman, 1963), 4 vols. পেঙ্গুইনের অনুবাদ—The Lives of the Artist বেরিয়েছে ১৯৬৫-তে। Rinascimento শব্দটিও ব্যবহৃত হয় Gotico বা Gothic (বর্বর)-এর বিপরীত অর্থে।

২ Lorenzo de Medici, Canzona di Bacco (Song for Bacchus), The Penguin Book of Italian Verse, p. 142. আরও ভালো অনুবাদ দিচ্ছি— "How passing fair is youth/ Forever fleeting away/ who happy would be, let him be:/ Of to-morrow who can say?"

৩ Myron Gilmore, The World of Humanism 1453-1517 (N Y, 1952)

৪ E. Garin, Italian Humanism Philosophy and Civic Life in the Renaissance (transl from Italian, 1952)

৫ Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance (revised edn, Princeton, 1966)

৬ P.O. Kristeller, Renaissance Thought The Classic, Scholastic and Humanistic Strains (N Y, 1961)

৭ Federico Chabod, Machiavelli and the Renaissance (tran., 1958)

৮ Johan Huizinga, Men and Ideas, pp. 286-87

৯ M. Postan, Cambridge Economic History of Europe, Vol II, Chapter IV, R S Lopez, ibid, Chaper V; K. F. Hellenier, ibid., vol. IV, Chapter I.

৯ক Maurice Doble, Studies in the Development of Capitalism (Lond, 1946), p 18

১০ Raymond de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494 (N Y, 1963), Iris Origo, The Merchants of Prato, Francesco de Marco Datini, 1335-1410 (N Y, 1957), A Sapori, Studi di Storia Economica Medievale (Florence, 1947) বার্দিও পেরুজ্জিদের ওপর সাপরির আলাদা বই আছে।

১১ The Cambridge Economic History of Europe, Vol III, Chapters II, IV, R S Lopez, 'Hard Times and Investment in Culture' in Six Essays The Renaissance, op cit; R. Lopez—Miskimin Vs Cipolla debate, Economic History Reniew, 2[d] series, XIV, XVI, A Sapóri, op. cit., R de Roover, op cit রুভাব কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্টরির দ্বিতীয় অধ্যায়ে মেদেচি ব্যাংক সংগঠনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, পৃ ৭৯ ও পরবর্তী।

১২ Emmanuel Le Roy Ladurie, Territoire de l' historien, II, বিশেষতঃ 'Un concept L' unification microbienne du monde (XIV[e]—XVII[e] siecles) (Gallimard, 1978)

১৩ Fernand Braudel, Civilization and Capitalism 15th—18th Century, Vol I, (Lond, 1986), pp. 82 et seq and Cambridge Economic History of Europe, Vol IV, chapter VIII.

১৪ Lauro Martines, The Social World of the Florentine Humanists 1390-1460 (Princeton, 1963); Peter Burke, Culture and Society in Renaissance Italy (1972); Nicolai Rubinstein, The Government of Florence under the Medici (Clarendon, 1968).

১৫ J.R. Hale, Florence and the Medici (Lond , 1977); G. A Brucker, Renaissance Florence (Lond., 1969)

১৬ J. R. Hale, "Humanists were concerned to change hearts and minds but not to urge a foot to cross class barrier." Renaissance Europe 1480-1520 (Fontana, 1971)

১৭ Maurice Bowra, 'Songs of Dance and Carnival' in E F Jacobs (ed), Italian Renaissance Studies (Lond , 1960).

১৮ P O. Kristeller, Renaissance Thought: The Classic, Scholastic and Humanist Strains, op cit পৃঃ ৩৪

১৯ Ernst Cassirer, The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy (N Y , 1963), Same (ed.), The Renaissance Philosophy of Man (Chicago, 1948)

২০ J. Boronowski, 'Leonardo da Vinci', J H Plumb (ed), The Penguin Book of Renaissance (1964).

২১ Maccurdy (ed), The Notebooks of Leonardo da Vinci, 2 Vols (N Y , 1958), Catalogue, Leonardo da Vinci Quincentenary Exhibition 1452-1952, Royal Academy of Art (Lond , 1952), I A Richter (ed), Selections from the Notebooks of Leonardo da Vinci (O U P 1952)

২২ Nikolaus Pevsner, An Outline of Architecture (Penguin, 1953)

২৩ John Pope—Hennessy, Italian Renaissance Sculpture (Phaidon, 1958)

২৪ Michelangelo's Sonnets, The Penguin Book of Italian Verse (London , 1958), R Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism (3rd edn. Lond 1962), Erwin Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art (1960); 'Artist, Scientist, Genius· Notes on the 'Renaissance-Dammarung', The Renaissance (Harper), ও Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance (Lond 1958) উইন্ড জোর দিয়ে বলেছেন, ধর্মের অভাব বা নাস্তিক্য র‍্যনেশাঁস শিল্পের মূল কথা ছিল না। ক্লাসিক ও খৃষ্টানের সমন্বয়কে 'Pagan' বা 'secular' আখ্যা দেওয়া চলে না। F Antal, Florentine Painting and its Social Background (Lond , 1948) সামাজিক পশ্চাৎপটের অন্যতম ব্যাখ্যা। তেমনি হিউম্যানিজমের প্রভাবের ওপর— Andre Chastel-এর Art et Humanism a Florence au temps de Laurent le magnifigue (Paris, 1961)

২৫ Antonio Manetti, The Birth and Rebirth of Pictorial Space (অনুবাদ— John White, 1957)

২৬ Bernard Berenson, Italian Painters of the Renaissance (Phaidon, 1956)

২৭ Erwin Panofsky, Idea (2nd edn., 1960)

২৮ লম্বার্ডির ভারী থামও গোলখিলান এবং টাসকানির হাল্কা থাম নিয়েছেন স্থপতিরা।

১ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৯-৭৫, ৬৮৬-৯১। নীহাররঞ্জনের মতে চর্যাগীতি ও দোহাকোষের সময়কাল একাদশ-দ্বাদশ শতক, সুনীতিকুমারের মতে দশম থেকে দ্বাদশ, প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে অনুরূপ, সুকুমার সেনের মতে একাদশ থেকে চতুর্দশ। কেবল মহম্মদ শাহীদুল্লাহ্ একে সপ্তম থেকে একাদশ শতকের বলে দাবী করেন। আনিসুজ্জমান, স্বরূপের সন্ধানে (ঢাকা, ১৯৯১), পৃঃ ১১-২৩

১ক এডওয়ার্ড সি· ডিমক জুনিয়র, The Sound of Silent Guns and other Essays (O U P, 1989), পৃঃ ১৫৫-১৯০

২ Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion (N Y 1958), pp. 418-19

৩ অর্থনৈতিক ইতিহাসের জন্য নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, The Economic History of Bengal, Vol I-III বাণিজ্যের জন্য, পি. জে. মার্শাল, East Indian Fortunes, H. Furber, John Company at Work ও আমার Trade and Finance in the Bengal Presidency (O.U.P., 1979). ভূমি রাজস্ব, বন্দোবস্ত ইত্যাদি ব্যাপারে বিনয় চৌধুরী, সেরাজুল ইসলাম, রত্না রায়রা অনেক স্থানে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সম্প্রতি পি· জে· মার্শাল Bengal The British Bridgehead Eastern India 1740-1828, The New Cambridge History of India, II, 2 (1987) ও সুগত বোস, Peasant Labour and Colonial Capital Rural Bengal Since 1770, ঐ III 2 (1993) নানা মতের সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। সুগত বোস জনসংখ্যাতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন (পৃঃ ১৭-২২)-এ। তিনি ফরাসী আনাল স্কুলের ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সঙ্গে মার্ক্সীয় তত্ত্ব মিশিয়ে নয়া ভঙ্গিতে ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন।

৪ Asiatic Society of Bengal, Mss Progs, 1784-1839, Vols I-V; রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Centenary Review (Cal., 1885); Asiatic Researches, Vols I (1788) to 7 (1802)

৫ ডেভিড কফ, British Orientalism and Bengal Renaissance (Cal., 1969).

৬ হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন রাজনারায়ণ বসু। রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের ভূমিকা নিয়ে নানা বাদানুবাদ আছে। সর্বশেষ মতের জন্য অমলেশ ত্রিপাঠী, Vidyasagar: Traditional Moderniser (Cal., 1974), Triumph and Tragedy of Presidency College, A Tribute, Statesman, 19 Jan., 1992 এবং সালাউদ্দিন আহমেদ, Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835 (2d edn Cal, 1976) দ্রষ্টব্য।

৬ক সুশীল চৌধুরী, 'Continuity or Change in the Eighteenth Century?' The Calcutta Historical Journal, July, 1990— June 1991, Figure 1, Share of different categories of textiles in Dutch & English export, p 25. ১৭৫০-এ ইংরেজদের বৈদেশিক বাণিজ্য ভাগ কমে, ডাচদের বাড়ে। এটা পলাশীর অন্যতম কারণ।

৭ তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হবিব (সং), Cambridge Economic History of India, Vol I (Camb., 1982), chpts VII, X, XI.

৮ সি· এ· বেইলি, Rulers, Townsmen and Bazaars, (Camb, 1983), p. 426

৯ ১৮৯১-৯২-এর এক আয়কর সমীক্ষায় কলকাতার আয়করদাতার সংখ্যা ছিল ২১,৯০২। তাদের গড় বাৎসরিক আয়কর মাত্র ৮২ টাকা ১১ আনা ৩ পাই।

১০ অমলেশ ত্রিপাঠী, 'Bengali Literature in the Nineteenth Century' in N.K. Sinha (ed), The History of Bengal 1757-1905 (Cal., 1967), p. 473

১১ শ্রীপান্থ, কেয়াবাৎ মেয়ে (কলি, ১৯৮৮)

১২ সজনীকান্ত দাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গদ্যের প্রথম যুগ (কলিকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত এই পুস্তক এবং তারও আগে ফোর্ট উইলিয়াম সম্পর্কে কোলব্রুক, সেটন কার ও র‍্যাংকিং-এর প্রবন্ধ, বুকানন ও

রোবাকের সংকলন, সুশীলকুমার দে-র History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (Cal., 1919) ইত্যাদি গ্রন্থ ডেভিড কফের গবেষণার মাহাত্ম্য অনেকখানি খর্ব করেছে।

১৩ অমলেশ ত্রিপাঠী, ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব হিউম্যান সায়েন্সেস ইন এশিয়া অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকা (টোকিয়ো-কিয়োতো, ১৯৮৩)-তে প্রদত্ত বক্তৃতা, The Role of Traditional Modernizers Bengal's Experience in the 19th Century.

১৪ হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী প্রভৃতির মতামতের জন্য তপতী গুহঠাকুরতা, The Making of a New 'Indian' Art, Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, C.1850-1920 (Camb. Univ. Press, 1992) দ্রষ্টব্য। আমার মন্তব্য পরে আলোচিত।

১৫ এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডিড, সোফিয়া ডবসন কলেট, The Life & Letters of Raja Ramhon Roy (ed. D.K Biswas & P.C. Ganguli, Cal. 1962); ল্যান্ট কার্পেন্টার, A Review of the Opinion and Supp. Notes.

১৬ Minutes, Proceedings and Correspondence of the General Commitee of Public Instruction, 1823-1841, W.B. Archives.

১৭ এই গ্রন্থের পৃঃ ৭৫, পাদটীকা ৬ দ্রষ্টব্য। আসল তথ্য পাওয়া যাবে Parliamentry Committee, House of Lords, 1852-53, App II; Vol. XXXII, pp 235, 445, p 146, p 191, Hyde East letters, esp. to Earl of Backinghamshire, 17 May 1816 in Archives of S P G হ্যারিংটনকে লেখা হাইড ইস্টের পত্রাবলীর গুরুত্ব প্রথম অনুধাবন করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, J.B O R S, Vol XVI, pt II, pp 154-75 পত্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন সুবর্ণা ও অশোকলাল ঘোষ, দেশ, ২৭/১/৭৩ ও ২১/৭/৭৩ সংখ্যায়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার হেয়ার ও রামমোহনের ভূমিকা উড়িয়ে দেন On Rammohan Roy (Asiatic Society, 1972) গ্রন্থে। কিন্তু সালাউদ্দিন আহমেদ Fulham Papers-এ ইস্টের চিঠি পাওয়ার পর ঘোষদের আপত্তি মানা যায় না।

১৮ The Calcutta Christian Observer, August, 1832

১৯ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা, অমলেশ ত্রিপাঠী, Vidyasagar: Traditional Modernizer পূঃ উঃ, pp. 84, et seq তিনি হিউমের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন তার প্রমাণ— কান্টের ওপর তাঁর Critique। এর মূল পাওয়া যায়নি, তবে তার অস্তিত্বের বহু সাক্ষ্য আছে। তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের কাছে কান্টের imperatives গ্রহণযোগ্য ছিল না।

২০ The East Indian, October 1831, quoted in India Gazette, 5 Oct. 1831.

২১ The Englishman, 1 June 1836.

২২ এ বিষয়ে ট্যালমনের প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য। কার্ল পপার-ও The Open Society and its Enemies গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

২৩ ঈশ্বর গুপ্ত পরিহাস করেছিলেন, "ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব।" ডাফের প্রচারে যারা ধর্মত্যাগ করেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে লালবেহারী দে, Recollectrons of Alexander Duff পঠিতব্য।

২৪ Edward Ryan to Bentinck, 13 June 1831, Encl, David Hare to Edward Ryan, 6 June 1831, Bentinck Papers. বেঙ্গল হারকারু ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৪৫ লিখছে, "a few Deputy majistracies, judiciously bestowed, will doubtless prevent their revival."

২৫ মূল আলোচনার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। ১৯৪৬ সালে এই পুস্তক অবলম্বন করে অমিত সেন ছদ্ম নামে সুশোভন সরকার লেখেন Notes on the Bengal Renaissance. এতে এ যুগকে উচ্চ প্রশংসা করলেও পরে তিনি সমালোচক হয়ে উঠেছেন। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত On the Bengal Renaissance গ্রন্থে প্রবন্ধগুলি পাওয়া যাবে। কিছু অনূদিত হয়ে 'বাংলার রেনেশাঁস' নামে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। ডিরোজিও সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইতালীয় মডেল ব্যবহার করেছেন, ১৯৮১তে রুশ মডেল। এবার জোর দিয়েছেন দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধের ওপর। বিনয় ঘোষ ডিরোজিওর জীবনী ছাড়া অনেক কিছু লিখেছেন যা আজ গ্রহণযোগ্য নয়। ডিরোজিও-র গুরু ছিলেন ড্রামন্ড এবং তাঁরও পেছনে রয়েছে স্কটিশ এনলাইটেনমেন্ট। এ নিয়ে গবেষণা করছেন, আমার ছাত্রী— অনীতা কুমার। উনিশ শতকের এই 'রাগী ছোকরা'দের নিয়ে আমার 'Bengali Literature in the Nineteenth Century, N. K. Sinha (ed), History of Bengal 1757-1905, (Cal. Univ., 1967) পঠিতব্য। অতিসম্প্রতি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সুবীর রায় চৌধুরীর রচনা প্রকাশ করেছেন।

২৬ মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন (হাওড়া, ১৩৫৪), পৃ ১৮। তবে এ মানবতাবাদ রানেশাঁস Humanism নয়, তাতে খৃষ্ট ধর্মের ভাবনাও প্রতিফলিত হয়েছিল।

২৭ অমলেশ ত্রিপাঠী, Vidyasagar: The Traditional Modernizer (Cal. 1974), পূঃ উঃ পৃঃ, ৫০-৫৫

২৮ তদেব, পৃঃ ৬২-৬৪

২৯ অবশ্য একেবারেই বর্জন করেননি। প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পদের জন্য তদ্বির করলেও সাহেব অধ্যাপকদের সমান মাইনে চান তিনি এবং না পেয়ে তদ্বির বন্ধ করে দেন।

৩০ Progs. G.I. (Home), Leg March, 1867, p. 107. বিরোধিতার কারণ— দলাদলি, তা রামগোপাল সান্যাল স্বীকার করে গেছেন। Reminiscences and Anecdotes of Great Man of India, Vol. 2 (Cal, 1895), p. 60.

৩১ অমলেশ ত্রিপাঠী, Vidyasagar: Traditional Moderniser, পূঃ উঃ, পৃঃ ৬৯

৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'হিন্দুবিবাহ' (১২৯৪), সমাজ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড (১৩৪৯)

৩৩ বঙ্কিম রচনাবলী (সংসদ), ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩৯, 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর একটি গীত সে গৌরবের অবসানে মুহ্যমান।

৩৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়', নারায়ণ, বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৩৫ Amiya P Sen, Hindu Revivalism in Bengal 1872-1905 Some Essays in Interpretation (O U.P., 1993), pp. 81-202.

৩৬ লরেন্স স্টোন, The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800 (London, 1977)

৩৬ক ডেভিড কফ, The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind (Princeton, 1979)

৩৭ অক্সফোর্ডের প্রাক্তন স্পলডিং অধ্যাপক জেনার সম্পাদিত ও অনুদিত গীতায় এবং অধ্যাপক এ· এল· ব্যাশামের The Orgins & Development of Classical Hinduisim (O U P., 1990) গ্রন্থে গীতায় তিনটি স্তর দেখান হয়েছে। বঙ্কিম ভক্তি বেছেছেন।

৩৮ অমিয়া পি· সেন সুদীপ্ত কবিরাজের The Myth and Praxis· The Construction of the figure in Krishnachantra (Delhi, 1987) নির্বিচারে মেনেছেন, কারণ উভয়ের ধর্মে অনীহা, সংস্কৃতে অজ্ঞতা।

৩৯ বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের দপ্তর, একা-কে গায় ঐ ? বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০।

৪০ বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, বঙ্কিম রচনাবলী, (সংসদ), ২য় খণ্ড, পাদটীকা, পৃঃ ৭৭৬

৪১ যেমন টেলরের Primitive Culture, Vol I. ঐ, পাদটীকা, পৃঃ ৭৯০

৪২ অমলেশ ত্রিপাঠী, The Extremist Challenge, (Cal. 1967)), p. 17

৪৩ বঙ্কিমচন্দ্র যে ইসলামদ্বেষী নন তা রেজাউল করিম সাহেব আগেও দেখিয়েছেন, এখন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও স্বীকার করেন।

৪৪ বঙ্কিমচন্দ্র, 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি', 'জমিদার', 'আইন' পরিচ্ছেদ, বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্কিম রচনাবলী (সংসদ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৮, ২৯১-৯৮, ৩০৪-১৪। পরবর্তীকালের রমেশচন্দ্র দত্তের মত তিনিও permanent settlement of rent চেয়েছিলেন।

৪৫ বঙ্কিমচন্দ্র, 'লোকশিক্ষা', বঙ্কিম রচনাবলী, পূঃ উঃ পৃঃ ৩৭৬-৭৭

৪৬ তদেব, 'বহুবিবাহ', ঐ, পৃঃ ৩১৪-১৯

৪৭ তদেব, 'রামধন পোদ', ঐ, পৃঃ ৩৭৮-৮০

৪৮ অরবিন্দ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী, ইন্দুপ্রকাশ, ২৭ আগস্ট ১৮৯৪ থেকে। অরবিন্দ কমলাকান্তের পত্র দ্বিতীয় সংখ্যা ও 'লোকরহস্য'-এর বাবু, ইংরেজস্তোত্র ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব (কলকাতা, ১৯৮৭) দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থে The Extremist Challenge-এর অনুবাদ।

৪৯ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ (কলকাতা, ১৩৭২), পৃঃ ১৬১

৫০ Amales Tripathi, 'Bengali Literature in the Nienteenth Century', History of Bengal 1757-1905. op. cit., p. 492. তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় থেকে রজতকান্ত রায় পর্যন্ত সিরাজচরিত্র নিয়ে পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে। তৎসত্ত্বেও তাকে আদর্শ চরিত্র বলা যাচ্ছে না।

৫১ গিরিশচন্দ্র নিয়ে আজও নানা বিতর্ক চলেছে—অতি সম্প্রতি উৎপল দত্ত ও ধরণী ঘোষের বিতর্ক হয়ে গেল। চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বাংলা থিয়েটারের ত্রয়ী, দেশ, ২০ নভেম্বর, ১৯৯৩ দ্রষ্টব্য।

৫২ রাজা যতীন্দ্রমোহন/সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাণী রাসমনি প্রভৃতি ধনী ও সমাজের শিরোমণিদের তিনি বিষয়াসক্তির জন্য ভর্ৎসনা ত' করেইছিলেন, চড়ও মেরেছিলেন, সরকাররা কি সে কথা জানেন না ? শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩-৪

৫৩ Friedrich Heer, Medieval World Europe 1100-1300 (Mentor, 1963), pp. 222 et seq, David Knowles, Saints and Scholars (Camb. 1962) pp. 86, অমলেশ ত্রিপাঠী, সচ্চিদানন্দ সম্বোধি শ্রীরামকৃষ্ণ, দেশ, ১ জানুয়ারী, ১৯৯৪ দ্রষ্টব্য।

৫৪ অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'য় লিখবেন, "যিনি নিরাকার তাঁর আকারের অন্ত নেই—যিনি অখণ্ড বিশেষ তিনিই নির্বিশেষ, যিনি অনন্ত রূপ তিনিই অরূপ।"

৫৫ স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২

৫৬ ঐ, পৃঃ ১৫৯-৬১, ম্যাকলডের কাছে ক্ষীর ভবানীর অভিজ্ঞতা শুনে বলা মন্তব্য করেছেন, Fiat voluntas tua! পূর্ণ আত্ম নিবেদন।

৫৭ ঐ, পৃঃ ১৮৩

৫৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড (১৩৬৯), পৃঃ ৪১২-১৩

৫৯ প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা, The Life of Josephine McLeod, Friend of Vivekananda (Sri Sarada Math, Cal., 1991)

৬০ J. L. Brockington, A Short History of Hinduism (O U.P., 1992), p 183, কিছু গুরুভ্রাতার মনে এ ধরনের সন্দেহ এসেছিল। Romain Rolland to Swami Shivananda, 12 Sept, 1927, Selected Letters of Romain Rolland (ed. Dove and Prevost), Delhi, 1990, pp. 85-86.

৬১ বিবেকানন্দ, From Colombo to Almora

৬২ ঐ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬

৬৩ ঐ, ঐ, পৃঃ ১০৭-৯

৬৪ ঐ, ঐ, পৃঃ ২০৭

৬৫ ঐ, ঐ, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৩৩

৬৬ ঐ, The Mission of the Vedanta

৬৭ Romain Rolland, The Life of Vivekananda and the Universal Gospel (Cal., 5th edn, 1960), pp. 113-14

৬৮ Amales Tripathi, The Extremist Challenge, op cit, Chapters 1, 2 and 4

৬৮ক বিবেকানন্দ, স্বামীজির বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১-২

৬৮খ ঐ, ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃ ১০৮-১০

৬৮গ মেরী হেলকে বিবেকানন্দ, ৩ জানু, ১৮৯৭, ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৫-১৬ ; রণদাপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তদেব, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-৯২ , নিবেদিতা, Notes on Some Wonderings with the Swami Vivekananda in the Himalayas

৬৯ ডিমক জুনিয়ার রবীন্দ্রনাথকে the greatest Baul of Bengal" আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার তাঁর ওপর লালন ফকিরের প্রভাবের ওপর অত্যধিক জোর দিচ্ছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লালনের নাম করলেও, প্রশংসা করলেও, এবং স্বয়ং বাউলাঙ্গের বহু গান লিখলেও উভয়ের মরমীয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ঔপনিষদিক ও বৈষ্ণবীয় মরমীয়া প্রভাবের কথা ভুললে অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন দেহতত্ত্বের ওপর জোর দেননি।

৭০ T. S Eliot, 'Tradition and the Individual Talent', Selected Prose (Penguin, 1953), pp 23-25

৭১ R. C Zaehner, Mysticism Sacred and Profane, Hindu and Muslim Mysticism (Lond, 1960)

৭২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মশক্তি (১৩১২), বিশেষ করে 'স্বদেশী সমাজ', 'সফলতার সদুপায়'।

৭৩ নববর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে সংকলিত ভারতবর্ষ, রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী), ৪র্থ খণ্ড।

৭৪ E P Thompson, Alien Homage (O U P 1993), pp 30-35 এ গ্রন্থ বেরুবার দু বছর আগে দেশ সাহিত্য সংখ্যা (১৩৯১), 'পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে' প্রবন্ধে আমি অনেকগুলি কারণই দিয়েছিলাম। টমসন অবশ্য স্বীকার করেছেন, তাঁর পিতা সবসময় ঠিক অনুবাদ করেননি। পূঃ উঃ, পৃঃ ৫২

৭৫ এডওয়ার্ড টমসনকে প্রশান্ত মহলানবিশ, ১৫ অক্টোবর, ৮ ও ১৩ ডিসেম্বর ১৯২১, টমসনের পুত্র পূঃ উঃ, পৃঃ ৮৩-৮৪। মহলানবিশের মতে কবি নরম ও চরমপন্থী কাউকেই পছন্দ করতেন না, কারণ "Both aim at bringing pressure to bear upon govt. Both want political concessions"

৭৬ দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় (কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৮) এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

৭৭ Macolm Bradbury and James Mcfarlane, Modernism

৭৮ Contemporary Indian Philosophy, 1936

৭৯ তপতী গুহঠাকুরতা, পূঃ উঃ

৮০ সইদের আগে আবদেল মালেক এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর 'Orientalism in crisis', সইদের Orientalism, কলচেস্টারে প্রকাশিত Europe and its others, Papers from the Essex Conference on the Sociology of Literature (1985), রবার্ট ইনডেনের Reconstruction of India, Modern Asian Studies Vol 20, 3, 1986 দ্রষ্টব্য। অতুল বসু, বাংলায় চিত্রকলা ও রাজনীতির একশ বছর (কলকাতা, ১৯৯৩) গ্রন্থে লিখেছেন, "ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ ওরফে Indian Heritage মার্কা ব্রিটিশ injectionটি অত্যাশ্চর্য রকম ফলপ্রসূ হয়ে ভারতীয় হিন্দু জাগরণের সমর্থক হয়ে ওঠে।" এমন কথা কোন সত্যকার ঐতিহাসিক মানবেন না।

৮১ আনন্দ কুমারস্বামী, Essays on National Idialism (Colombo, 1909), Art and Swadeshi (1912), The Dance of Shiva

৮২ এই প্রসঙ্গে ওকাকুরার The Ideals of the East, p. XVIII, এবং নিবেদিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য। তপতী গুহঠাকুরতার যুক্তির জন্য, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৭১। এখানে বলা দরকার, বিবেকানন্দের ভারত শিল্প সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত। মেরী হেলকে লেখা ৩ জানুয়ারী, ১৮৯৭-এর চিঠি ও ১৯০১ সালে রণদা দাশগুপ্তের সঙ্গে কথোপকথন উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামীজির বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড পৃঃ ৩১৫-১৬, ঐ ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-১৯২।

৮৩ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া (বিশ্বভারতী, ১৩৪৮), পৃঃ ২১-২২। রবীন্দ্রনাথ রবিবর্মার পাত্রপাত্রীদের 'যাত্রার নটনটী' আখ্যা দেন। Havell and Abanindranath, Golden Jubilee No., The Indian Society of Oriental Art

(Cal. 1961)

৮৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর ধারে (বিশ্বভারতী, ১৩৫১), পৃঃ ৮০

৮৫ কানাই সামন্ত, শিল্পীগুরু নন্দলাল, বিশ্বভারতী পত্রিকা : নন্দলাল বসু সংখ্যা (১৩৭৩), পৃঃ ৩০

৮৬ "the first masterpiece in which an Indian artist has actually succeeded in disengaging as it were, the spirit of the Motherland"—নিবেদিতা, দ্য মডার্ন রেভ্যু, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭, পৃ ২২১

৮৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ উঃ, পৃঃ ২৮২-৮৪ ।

৮৮ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণের বারান্দা (কলিকাতা, ১৩৯৭), পৃঃ ১৫২-৫৩ ।

৮৯ প্রবাসী, পৌষ-মাঘ, ১৩২০

৯০ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, The Art of Abanindranath Tagore, Golden Jubilee No., Indian Society of Oriental Art (ed Pulinbihari Sen, Cal. 1961)

৯১ নন্দলালের সঙ্গে কথোপকথনের ভিত্তিতে কানাই সামান্ত, শিল্পীগুরু শ্রীনন্দলাল, বিশ্বভারতী পত্রিকা : নন্দলাল বসু সংখ্যা, (১৩৭৩), পৃঃ ৩১

৯২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পায়ন (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃঃ ৩০-৪২

৯৩ কানাই সামন্তকে নন্দলাল বসু, ৩০/৩/১৯৫৪ । ঐ, পৃঃ ৩৭ । মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত বলেন, তাঁর পছন্দ ছিল ভ্যান গঘ, গোগ্যাঁ ও মাতিস । 'শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু,' নিরীক্ষা নন্দলাল সংখ্যা (সম্পাদক—দ্বিজেন্দ্র মৈত্র ও ইন্দ্র দুগার, বহরমপুর), পৃঃ ৮২

৯৪ কানাই সামন্তকে নন্দলাল বসু, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৩১

৯৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পায়ন, পৃঃ উঃ পৃঃ ৫৬

৯৬ এই প্রসঙ্গে Album of Nandalal Bose with a biographical note (Santiniketan Asramik Sangha, Cal. 1956) দ্রষ্টব্য ।

৯৭ Abanindranath Tagore His Early Work, Indian Museum, Calcutta (Cal, 2' edn , 1964) pp. 15-16

৯৮ রূপম, জানুয়ারী-জুন, ১৯২৩

৯৯ সমস্ত পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্প আন্দোলনের জন্য অবশ্য পাঠ্য, Werner Haftman, Painting in the Twentieth Century, Vols 1 & 2. (London, 1965. transl. Ralph Manheim) রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির সঙ্গে এডওয়ার্ড মুনখ্ (Munch) ও চেইম সুতিনের (Soutine)-এর আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। আর্চার অবচেতনের প্রভাব আলোচনা করেছেন Indian and Modern Art-এর চতুর্থ অধ্যায়ে । তাঁর মতে ভারতের লিঙ্গ, যোনি, মকরাদি জন্তুর প্রভাব বেশি । যেমন Veiled Woman ও Black and White Threads.

১০০ অজিত ঘোষ, রূপম্ (১৯২৬)

১০১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য Mildred Archer, Bazaar Paintings of Calcutta (1953); Hana Knizkova, The Drawings of Kalighat Style (1975); Balraj Khanna, Kalighat· Indian Popular Paintings 1800-1930 (London, 1992) দ্রষ্টব্য । রাধাপ্রসাদ গুপ্তর ও শ্রীপান্থ'র নানা টুকরো বিশ্লেষণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয় ।

১০২ সরসীকুমার সরস্বতী, Art, Sec 3, N K. Sinha (ed.) the History of Bengal, 1757-1905, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪

১০৩ এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, Jamini Roy পুস্তিকায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

১০৪ Albert Einstein, 'Maxwell's influence on the Evolution of the idea of Physical Reality' (1931), 'The Problem of Space, Ether and the Field in Physics' (1934), 'What is the Theory of Relativity?' (1919) এবং Ronald W. Clark, Einstein, The Life and Times (N. Y. 1971). প্রথমে উল্লেখিত তিনটি প্রবন্ধ তাঁর Ideas and Opinions গ্রন্থে মুদ্রিত হয় । তাছাড়া এল. ইনফেল্ডের সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, The Evolution of Physics গ্রন্থ (কেমব্রিজ, ১৯৩৮) । বাংলাভাষায় সহজ আলোচনার জন্য—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রচনা সংকলন (১৩৯৯), আইনস্টাইন (১, ২, ৩) ও জগদীশচন্দ্র দ্রষ্টব্য ।

১০৫ এ সম্বন্ধে Ronald W. Clark, Einstien The Life and Times, পৃঃ উঃ, pp. 408-10 এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেশ, ১ মাঘ ১৪০০ দ্রষ্টব্য ।

১০৬ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় (সং), মেঘনাদ রচনা সংকলন (কলকাতা, ১৯৮৬)

১০৭ পূর্ণেন্দুকুমার বসু, রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র, দেশ, ১৭ জুলাই, ১৯৯৩

নির্দেশিকা